মাধ্যমিক বাংলা সংকলন
গদ্য
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ
থেকে নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত।

মাধ্যমিক বাংলা সংকলন

গদ্য

[নবম-দশম শ্রেণীর জন্য]

সংকলন ও রচনা

মাহবুবুল আলম

ড. মঞ্জুশ্রী চৌধুরী

শামসুল কবীর

সম্পাদনা

ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন-মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য "শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স" গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষাবিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচ্ছদ প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশা করা যায় এতে করে পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিকট আরও গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরও ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায়-শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যে-কোনো বিষয়কে বিচার-বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

মাধ্যমিক স্তরে বাংলা একটি আবশ্যিক বিষয়। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম। এ ছাড়া ৫২-র ভাষা-আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এ ভাষাকে কেন্দ্র করে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা-দিবস হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। ফলে বাংলা ভাষার মর্যাদা এখন বিশ্বপরিসরে ব্যাপ্ত। সুতরাং এখন এ ভাষার ব্যবহারিক দিকে ব্যুৎপত্তি অর্জন যেমন প্রয়োজন তেমনি সৃষ্টিশীলতায় দক্ষতা ও কুশলতা অর্জনও গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে শিক্ষার্থীর ধর্মীয়, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ যেমন প্রয়োজন, তেমনি তাকে হতে হবে দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ। আমরা আশা করি, নবম-দশম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তক 'মাধ্যমিক বাংলা সংকলন'- এ বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির উদ্দেশ্যগুলো যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা সম্পর্কে যথাযথ ধারণা লাভ করে, তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে কিছু বিষয়বস্তু সংযোজন করা হয়েছে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টার সঙ্গী হিসেবে শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু বিকাশে বর্তমান সংস্করণে কিছু পরিমার্জন আনা হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এ পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

সৃজনশীল প্রশ্ন : কিছু কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৫-৯৬ সালে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়। কিন্তু এ শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন তথা পরীক্ষাপদ্ধতির সংস্কার করা হয়নি।

বিষয়টি বিবেচনা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষাপদ্ধতি সংস্কার করে সৃজনশীল প্রশ্ন প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগকে সফল ও অর্থবহ করার জন্য এসএসসি পরীক্ষাপদ্ধতি সংস্কারের আলোকে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসহ প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড পাঠ্যপুস্তকের প্রতিটি অধ্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বিগত বছরগুলোর এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় মোট নম্বরের শতকরা ৮০ ভাগ প্রশ্ন স্মৃতিনির্ভর, যা শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করে উত্তর দেয়। অবশিষ্ট অধিকাংশ প্রশ্ন অনুধাবন স্তরের। প্রয়োগ ও উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা মূল্যায়নের প্রশ্ন খুবই কম। প্রচলিত এ পরীক্ষা পদ্ধতি মূলত শিক্ষার্থীর মুখস্থ করার ক্ষমতাকে মূল্যায়ন করে আসছে।

বস্তুত মুখস্থ, সাজেশন এবং নোট নির্ভর এ পরীক্ষাপদ্ধতি শ্রেণীকক্ষের শিখন শেখানো কার্যক্রমকে প্রভাবিত করছে। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তক বুঝে লেখাপড়ার পরিবর্তে মুখস্থ করার ওপর বেশি জোর দিচ্ছে। আর এ মুখস্থ করাও একটি কঠিন কাজ এবং এতে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভাবিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়। এসব কারণে শিক্ষার্থীদের মেধার যথাযথ বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশ ও মেধার যথার্থ মূল্যায়ন নিশ্চিত করার জন্য পরীক্ষাপদ্ধতির সংস্কার অপরিহার্য। শিক্ষার্থীদের পাঠলব্ধ জ্ঞান ও অনুধাবনকে নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ এবং উপাত্ত ও ঘটনা বিচার-বিশ্লেষণ করার সামর্থ্য যাচাই করার মতো ব্যবস্থা প্রশ্নপত্রে থাকা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সৃজনশীল প্রশ্নের অবতারণা।

প্রশ্নপত্রে পরিবর্তন

প্রচলিত এসএসসি পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন তিন ধরনের প্রশ্নের সাহায্যে হয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ও রচনামূলক প্রশ্ন। পরীক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে প্রচলিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের পরিবর্তে দক্ষতাভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং সংক্ষিপ্ত-উত্তর ও রচনামূলক প্রশ্নের পরিবর্তে দক্ষতাভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন প্রবর্তন করা হচ্ছে।

দক্ষতাভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- বহুনির্বাচনি প্রশ্নের (MCQ) জন্য বর্তমানে নির্ধারিত ৫০% নম্বরের পরিবর্তে ৪০% বরাদ্দ থাকবে। তবে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ও উচ্চতর গণিতে ৩৫%, কম্পিউটার শিক্ষায় ৩০% এবং কৃষিশিক্ষা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে ২৫% নম্বর বরাদ্দ থাকবে।
- বর্তমানে প্রচলিত শুধু সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সঙ্গে বহুপদি সমাপ্তিসূচক (Multiple Completion) বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং অভিন্ন তথ্যভিত্তিক (Situation Set) বহুনির্বাচনি প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- বহুনির্বাচনি প্রশ্নে চিন্তন দক্ষতার চারটি স্তরের জ্ঞান বা মনে রাখার জন্য ৪০%, অনুধাবন বা বুঝে লেখার জন্য ৩০%, অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবনকে প্রয়োগ করার জন্য ২০% এবং উচ্চতর দক্ষতার তথ্য বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ বা মূল্যায়নের জন্য ১০% প্রশ্ন থাকবে।
- শিক্ষাক্রমের সকল বিষয়বস্তু মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক ছক (Specification Grid) অনুসরণ করা হবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের প্রবর্তন

প্রচলিত ৫০% নম্বরের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ও রচনামূলক প্রশ্নের পরিবর্তে ৬০% নম্বরের সৃজনশীল প্রশ্নের প্রবর্তন। তবে ব্যবহারিক পরীক্ষা আছে এমন বিষয়ে ৪০% সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্ন হবে মৌলিক অর্থাৎ যা পূর্বে কখনো ব্যবহৃত হয়নি।

সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন প্রক্রিয়া

- সৃজনশীল প্রশ্ন একটি দৃশ্যকল্প/উদ্দীপক, সূচনা বক্তব্য (ঝপবহধৎরড়) দিয়ে শুরু হবে।
- দৃশ্যকল্প/উদ্দীপকটি কোনো ঘটনা, গল্প, চিত্র, মানচিত্র, গ্রাফ, সারণি, পেপার কাটিং, ছবি, উদ্ধৃতি, অনুচ্ছেদ ইত্যাদি হতে পারে।
- দৃশ্যকল্প হবে মৌলিক (টহরয়ঁব)। পাঠ্যপুস্তকে সরাসরি এ দৃশ্যকল্পটি থাকবে না। তবে বাংলা ও ধর্ম বিষয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দৃশ্যকল্প রচনায় পাঠ্যপুস্তক থেকে উদ্ধৃতাংশ ব্যবহার করা যাবে।
- দৃশ্যকল্পটি শিক্ষাক্রমের/পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে হতে হবে।
- দৃশ্যকল্পটি আকর্ষণীয় ও সহজে বোধগম্য হতে হবে।
- দৃশ্যকল্পের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে প্রশ্নের অংশগুলো তৈরি হবে এবং প্রতিটি অংশ সহজ থেকে কাঠিন্যের ক্রমানুসারে হবে।
- প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্ন চিন্তন দক্ষতার চারটি স্তরের (ক-অংশঃ জ্ঞান, খ-অংশঃ অনুধাবন, গ-অংশঃ প্রয়োগ ও ঘ-অংশঃ উচ্চতর দক্ষতা) সমন্বয়ে গঠিত হবে।
- গণিত, উচ্চতর গণিত এবং হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের তিন স্তরের (সহজ, মধ্যম এবং কঠিন) সমন্বয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন গঠিত হবে।
- দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপকে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থাকবে না, তবে উত্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণা থাকবে।
- প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের মোট নম্বর হবে ১০।

প্রশ্নের অংশ	চিন্তন দক্ষতার স্তর	নম্বর
ক	জ্ঞান দক্ষতা কোনো ঘটনা, তথ্য, তত্ত্ব, নীতিমালা, পদ্ধতি, প্রকারভেদ ইত্যাদি স্মরণ করে বা মুখস্থ করে লিখতে পারার দক্ষতাকে জ্ঞান স্তরের দক্ষতা বোঝায়।	১
খ	অনুধাবন দক্ষতা কোনো অনুচ্ছেদ, কবিতা, প্রবন্ধ, লেখচিত্র ইত্যাদি পড়ে বুঝতে পারা, এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা, কোনো কিছু একটা নিয়মে সাজানো, নিয়ম ও বিধি, তথ্য, তত্ত্ব, নীতিমালা, পদ্ধতি ইত্যাদি পাঠ্যবই হতে হুবহু মুখস্থ না করে বুঝে নিজের ভাষায় উত্তর করার দক্ষতাকে অনুধাবন স্তরের দক্ষতা বলে।	২
গ	প্রয়োগ দক্ষতা এটি হল কোনো অর্জিত জ্ঞান এবং অনুধাবন নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার দক্ষতা। সূত্র, নিয়ম-বিধি ইত্যাদি প্রয়োগ করে নতুন পরিস্থিতিতে কোনো প্রকৃত সমস্যার সমাধান করতে পারার দক্ষতাকে প্রয়োগ স্তরের দক্ষতা বলে।	৩
ঘ	উচ্চতর দক্ষতা কোনো বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ (বিশেষ থেকে সাধারণ), সংশ্লেষণ (সাধারণ থেকে বিশেষ) এবং মূল্যায়ন করার দক্ষতা হল উচ্চতর দক্ষতা। আন্তঃসম্পর্ক, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নির্ণয়, তুলনা করা, পার্থক্য করা, কোনো গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তৈরি করা, সিদ্ধান্ত নেওয়া, কোনো সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করা , মতামত প্রদান, প্রতিবেদন তৈরি করা ইত্যাদি উচ্চতর স্তরের দক্ষতার অন্তর্ভুক্ত।	৪

সূচিপত্র

প্রত্যুপকার

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

[লেখক পরিচিতি : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ২৬ শে সেপ্টেম্বর ১৮২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। প্রথমে সংস্কৃত ও পরে ইংরেজি ভাষায় পান্ডিত্য অর্জন করে তিনি বহু সম্মান ও খ্যাতি লাভ করেন। উনিশ বছর বয়সে বিশেষ পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করে তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। বদান্যতার জন্য জনসাধারণ তাঁকে 'দয়ার সাগর' আখ্যা দেয়। একাধারে মহাপন্ডিত, শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও খ্যাতনামা লেখকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ সাধারণত কম ব্যক্তির ক্ষেত্রেই ঘটে। ১৮৪১ সালে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পন্ডিত নিযুক্ত হন। তিনি ১৮৫১ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন। তিনিই প্রথম বাংলা গদ্যের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আবিষ্কার করেন এবং গদ্যভাষায় যতি চিহ্নাদি যথাযথভাবে প্রয়োগ করেন। ফলে তাঁর গদ্য হয়ে ওঠে শৈলী সম্পন্ন। এ জন্য তাঁকে বলা হয় 'বাংলা গদ্যের জনক।' বাংলা বর্ণসমূহ সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে শিশুদের বাংলা বর্ণমালার প্রথম সার্থক গ্রন্থ ১৮৫৫ সালে লেখা তাঁর 'বর্ণ পরিচয়'। এ গ্রন্থ আজও বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে দিকনির্দেশক। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'বিদ্যাসাগর চরিত', 'ভ্রান্তিবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর প্রধান রচনা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৯১ সালে মৃত্যুবরণ করেন।]

আলী ইবনে আব্বাস নামে এক ব্যক্তি মামুন নামক খলিফার প্রিয়পাত্র ছিলেন । তিনি বলিয়া গিয়াছেন, আমি একদিন অপরাহ্ণে খলিফার নিকটে বসিয়া আছি এমন সময়ে, হস্তপদবন্ধ এক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে নীত হইলেন। খলিফা আমার প্রতি এই আজ্ঞা করিলেন, তুমি এ ব্যক্তিকে আপন আলয়ে লইয়া গিয়া রুদ্ধ করিয়া রাখিবে এবং কল্য আমার নিকট উপস্থিত করিবে। তদীয় ভাব দর্শনে স্পষ্ট প্রতীত হইল, তিনি ঐ ব্যক্তির উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে আপন আলয়ে আনিয়া অতি সাবধানে রুদ্ধ করিয়া রাখিলাম, কারণ যদি তিনি পালাইয়া যান, আমাকে খলিফার কোপে পতিত হইতে হইবে।

কিয়ৎক্ষণ পরে, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম, আপনার নিবাস কোথায়? তিনি বলিলেন, ডেমাস্কাস আমার জন্মস্থান; ঐ নগরের যে অংশে বৃহৎ মসজিদ আছে, তথায় আমার বাস। আমি বলিলাম, ডেমাস্কাস নগরের, বিশেষত যে অংশে আপনকার বাস, তাহার ওপর, জগদীশ্বরের শুভদৃষ্টি থাকুক। ঐ অংশের অধিবাসী এক ব্যক্তি এক সময় আমার প্রাণদান দিয়াছিলেন ।

আমার এই কথা শুনিয়া, তিনি সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত, ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম: বহু বৎসর পূর্বে ডেমাস্কাসের শাসনকর্তা পদচ্যুত হইলে, যিনি তদীয় পদে অধিষ্ঠিত হন, আমি তাঁহার সমভিব্যাহারে তথায় গিয়াছিলাম। পদচ্যুত শাসনকর্তা বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিলেন। আমি প্রাণভয়ে পালাইয়া, এক সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়িতে প্রবিষ্ট হইলাম এবং গৃহস্বামীর নিকট গিয়া, অতি কাতর বচনে প্রার্থনা করিলাম, আপনি কৃপা করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুন। আমার প্রার্থনা বাক্য শুনিয়া গৃহস্বামী আমায় অভয় প্রদান করিলেন। আমি তদীয় আবাসে, একমাস কাল নির্ভয়ে ও নিরাপদে অবস্থান করিলাম।

একদিন আশ্রয়দাতা আমায় বললেন, এ সময়ে অনেক লোক বাগদাদ যাইতেছেন। স্বদেশে প্রতিগমনের পক্ষে আপনি ইহা অপেক্ষা অধিক সুবিধার সময় পাইবেন না। আমি সম্মত হইলাম। আমার সঙ্গে কিছুমাত্র অর্থ ছিল না, লজ্জাবশত আমি তাঁহার নিকট সে কথা ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। তিনি, আমার আকার প্রকার দর্শনে, তাহা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তৎকালে কিছু না বলিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

তিনি আমার জন্য যে সমস্ত উদ্যোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রস্থান দিবসে তাহা দেখিয়া, আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। একটি উৎকৃষ্ট অশ্ব সুসজ্জিত হইয়া আছে, আর একটি অশ্বের পৃষ্ঠে খাদ্যসামগ্রী স্থপিত হইয়াছে, আর পথে আমার পরিচর্যা করিবার নিমিত্ত, একটি ভৃত্য প্রস্থানার্থে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। প্রস্থান সময় উপস্থিত হইলে, সেই দয়াময়, সদাশয়, আশ্রয়দাতা আমার হস্তে একটি স্বর্ণমুদ্রার থলি দিলেন এবং আমাকে যাত্রীদের নিকটে লইয়া গেলেন। তন্মধ্যে

যাহাদের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ছিল, তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন । আমি আপনকার বসতি স্থানে এই সমস্ত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এ জন্য পৃথিবীতে যত স্থান আছে ঐ স্থান আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়।

এই নির্দেশ করিয়া, দুঃখ প্রকাশপূর্বক আমি বলিলাম, আক্ষেপের বিষয় এই, আমি এ পর্যন্ত সেই দয়াময় আশ্রয়দাতার কখনও কোনো উদ্দেশ্য পাইলাম না। যদি তাঁহার নিকট কোনো অংশে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের অবসর পাই, তাহা হইলে মৃত্যুকালে আমার কোনো ক্ষোভ থাকে না। এই কথা শুনিবামাত্র, তিনি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, আপনার মনস্কাম পূর্ণ হইয়াছে। আপনি যে ব্যক্তির উল্লেখ করিলেন, সে এই। এই হতভাগ্যই আপনাকে, এক মাসকাল, আপন আলয়ে রাখিয়াছিল।

তাঁহার এই কথা শুনিয়া, আমি চমকিয়া উঠিলাম, সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে, কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, তাহাকে চিনিতে পারিলাম; আহ্লাদে পুলকিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে আলিঙ্গান করিলাম; তাঁহার হস্ত ও পদ হইতে লৌহশৃঙ্খল খুলিয়া দিলাম এবং কী দুর্ঘটনাক্রমে তিনি খলিফার কোপে পতিত হইয়াছেন, তাহা জানিবার নিমিত্তে নিতান্ত ব্যগ্র হইলাম। তখন তিনি বলিলেন, কতিপয় নীচপ্রকৃতির লোক ঈর্ষাবশত শত্রুতা করিয়া খলিফার নিকট আমার ওপর উৎকট দোষারোপ করিয়াছে: তজ্জন্য তদীয় আদেশক্রমে হঠাৎ অবরুদ্ধ ও এখানে আনীত হইয়াছি; আসিবার সময় স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদিগের সহিত দেখা করিতে দেয় নাই; বোধ করি আমার প্রাণদণ্ড হইবে। অতএব, আপনার নিকট বিনীত বাক্যে প্রার্থনা এই, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার পরিবারবর্গের নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়া দিবেন। তাহা হইলেই আমি যথেষ্ট উপকৃত হইব।

তাঁহার এই প্রার্থনা শুনিয়া আমি বলিলাম, না, না, আপনি এক মুহূর্তের জন্যও প্রাণনাশের আশঙ্কা করিবেন না; আপনি এই মুহূর্ত হইতে স্বাধীন; এই বলিয়া পাথেয়স্বরূপ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার একটি থলি তাহার হস্তে দিয়া বলিলাম, আপনি অবিলম্বে প্রস্থান করুন এবং স্নেহাস্পদ পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইয়া সংসারযাত্রা সম্পন্ন করুন। আপনাকে ছাড়িয়া দিলাম, এ জন্য আমার ওপর খলিফার মর্মান্তিক ক্রোধ ও দ্বেষ জন্মিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি আপনকার প্রাণ রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে সে জন্য আমি অণুমাত্র দুঃখিত হইব না।

আমার প্রস্তাব শুনিয়া তিনি বলিলেন, আপনি যাহা বলিতেছেন, আমি কখনই তাহাতে সম্মত হইতে পারিব না। আমি এত নীচাশয় ও স্বার্থপর নহি যে, কিছুকাল পূর্বে, যে প্রাণের রক্ষা করিয়াছি, আপন প্রাণরক্ষার্থে এক্ষণে সেই প্রাণের বিনাশের কারণ হইব। তাহা কখনও হইবে না। যাহাতে খলিফা আমার ওপর অক্রোধ হন, আপনি দয়া করিয়া তাহার যথোপযুক্ত চেষ্টা দেখুন; তাহা হইলেই আপনার প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হইবে। যদি আপনার চেষ্টা সফল না হয়, তাহা হইলেও আমার কোনো ক্ষোভ থাকিবে না।

পরদিন প্রাতঃকালে আমি খলিফার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সে লোকটি কোথায়, তাহাকে আনিয়াছ? এই বলিয়া, তিনি ঘাতককে ডাকাইয়া, প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন। তখন আমি তাঁহার চরণে পতিত হইয়া, বিনীত ও কাতর বচনে বলিলাম, ধর্মাবতার, ঐ ব্যক্তির বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। অনুমতি হইলে সবিশেষে সমস্ত আপনাকে গোচর করি। এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহার কোপানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি রোষরক্ত নয়নে বলিলেন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া থাক, এই দণ্ডে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে। তখন আমি বলিলাম, আপনি ইচ্ছা করিলে,এই মুহূর্তে আমার ও তাহার প্রাণদণ্ড করিতে পারেন তাহার সন্দেহ কি। কিন্তু আমি যে নিবেদন করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কৃপা করিয়া তাহা শুনিলে আমি চরিতার্থ হই।

এই কথা শুনিয়া খলিফা উদ্ধত বচনে বলিলেন, কী বলিতে চাও, বল। তখন সে ব্যক্তি ডেমাস্কাস নগরে কীরূপে আশ্রয়দান ও প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে চাহিলে, আমি অবধারিত বিপদে পড়িব, এ জন্য তাহাতে কোনোমতে সম্মত হইলেন না, এই দুই বিষয়ে সবিশেষ নির্দেশ করিয়া বলিলাম, ধর্মাবতার, যে ব্যক্তির এরূপ প্রকৃতি ও এরূপ মতি, অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন দয়াশীল, পরোপকারী, ন্যায়পরায়ণ ও সদ্বিবেচক তিনি কখনই দুরাচার নহেন। নীচপ্রকৃতি পরহিংসুক দুরাত্মারা, ঈর্ষাবশত অমূলক দোষারোপ করিয়া তাহার সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, নতুবা যাহাতে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, তিনি এরূপ কোনো দোষে দূষিত হইতে পারেন, আমার এরূপ বোধ ও বিশ্বাস হয় না। এ ক্ষেত্রে আপনকার যেরূপ অভিরুচি হয় করুন।

খলিফা মহামতি ও অতি উন্নতচিত্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি এই সকল কথা কর্ণগোচর করিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর প্রসন্ন বদনে বলিলেন, সে ব্যক্তি যে এরূপ দয়াশীল ও ন্যায়পরায়ণ ইহা অবগত হইয়া আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। তিনি প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইলেন। বলিতে গেলে তোমা হইতেই তাহার প্রাণরক্ষা হইল। এক্ষণে তাহাকে অবিলম্বে এই সংবাদ দাও ও আমার নিকটে লইয়া আইস।

এই কথা শুনিয়া আহ্লাদের সাগরে মগ্ন হইয়া আমি সত্বর গৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক তাঁহাকে খলিফার সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। খলিফা অবলোকনমাত্র, প্রীতি-প্রফুল্ললোচনে, সাদর বচনে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, তুমি যে এরূপ প্রকৃতির লোক তাহা আমি পূর্বে অবগত ছিলাম না। দুষ্টমতি দুরাচারদিগের বাক্য বিশ্বাস করিয়া অকারণে তোমার প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। এক্ষণে ইহার নিকটে তোমার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া, সাতিশয় প্রীতিপ্রাপ্ত হইয়াছি। আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি আপন আলয়ে প্রস্থান কর। এই বলিয়া খলিফা তাঁহাকে মহামূল্য পরিচ্ছদ, সুসজ্জিত দশ অশ্ব, দশ খচ্চর, দশ উষ্ট্র উপহার দিলেন এবং ডেমাস্কাসের রাজপ্রতিনিধির নামে এক অনুরোধপত্র ও পাথেয়স্বরূপ বহুসংখ্যক অর্থ দিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'প্রত্যুপকার' রচনাটি আখ্যানমঞ্জরী দ্বিতীয় ভাগ থেকে সংকলন করা হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'আখ্যানমঞ্জরী' রচিত হয় ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে। বিশ্বের নানা দেশের ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনের গৌরবদীপ্ত ঘটনাই এ গ্রন্থের বিভিন্ন রচনার উপজীব্য।

মূলবক্তব্য

'প্রত্যুপকার' আলী আব্বাস নামক এক ব্যক্তির প্রতি-উপকারের কাহিনী। খলিফা মামুনের সময়কালে দামেস্কের জনৈক শাসনকর্তা পদচ্যুত হন। নতুন শাসনকর্তা মামুনের একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন আলী ইবনে আব্বাস। তিনি স্থানীয় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আশ্রয়লাভ করে জীবন রক্ষা করেন। পরবর্তীকালে আলী ইবনে আব্বাসের আশ্রয়দাতা ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটি খলিফা মামুনের সৈন্যদল কর্তৃক বন্দি হন এবং খলিফার নির্দেশে আলী ইবনে আব্বাসের গৃহে তাকে অন্তরীণ রাখার ব্যবস্থা করা হয়। আলী ইবনে আব্বাস বন্দি ব্যক্তির সঠিক পরিচয় জানতে পেরে উপকারীর উপকারের জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করেন এবং খলিফার কাছে তার মুক্তির জন্য সুপারিশ করেন। বস্তুত এ রচনায় দুজন মহৎ ব্যক্তির কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, এদের একজন নিঃস্বার্থ উপকারী, অন্যজন সকৃতজ্ঞ প্রত্যুপকারী । খলিফার মহত্ত্বও এ রচনায় প্রকাশিত হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা

প্রত্যুপকার- উপকারীর প্রতি উপকার। **অভিরুচি-** ইচ্ছা। **সমভিব্যাহারে-** সঙ্গে নিয়ে। **নিষ্কৃতি-** মুক্তি। **কোপানল-** ক্রোধের আগুন। **প্রতীতি-** বিশ্বাস। **পরিচ্ছদ-** পোশাক। **প্রীতি-প্রফুল্ললোচনে-**বন্ধুত্বের অনুভূতিতে আনন্দিত চোখে। **মৌনাবলম্বন-** নীরবতা পালন। **অব্যাহতি-** মুক্তি, ছাড়া পাওয়া। **অবধারিত-** নিশ্চিত। **প্রত্যাগমন-** ফিরে আসা। **রোষরক্ত নয়নে-** ক্রোধে লাল চোখে। **অবলোকনমাত্র-** দেখামাত্র। **সম্ভাষণ-**সম্বোধন। **উৎকট-** অত্যন্ত প্রবল, তীব্র। **অবরুদ্ধ-** বন্দি। **নিরীক্ষণ-** মনোযোগ। **খলিফা-** প্রতিনিধি। হযরত মুহম্মদ (স)- এর পরে মুসলিম রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান শাসনকর্তাকে খলিফা বলা হত। তিনি একাধারে রাজ্যের প্রধান শাসক ও ধর্মনেতা ছিলেন।

ডেমাস্কাস-দামেস্ক। এশিয়ার একটি প্রাচীন শহর। হযরত ইব্রাহিমের (আ) যুগের পূর্বে এখানে শহর গড়ে উঠেছিল বলে জানা যায়। পর পর এই শহরটি আবিসিনীয় ও পারসিকদের অধিকারে ছিল। শহরটি খ্রিষ্টপূর্ব ৬৪ অব্দে রোমানদের হস্তগত হয় এবং ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে স্থায়ীভাবে আরব শাসনাধীন হয়। বর্তমানে দামেস্ক সিরিয়ার রাজধানী।

মামুন- আল মামুন নামেই সমধিক পরিচিত। তাঁর পূর্ণ নাম আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ আল মামুন (৭৮৬-৮৩৩)। তিনি ছিলেন সপ্তম আব্বাসীয় খলিফা এবং হারুনর রশীদের দ্বিতীয় পুত্র। ৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেন। তিনি সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও দর্শনের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চায় উৎসাহ দিতেন। তাঁর আমলে বাগদাদ শিল্পকলা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। তিনি বায়তুল হিকমাহ নামে সাহিত্য ও শিল্প একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর আমলে প্রজাগণ অত্যন্ত সুখী ও সমৃদ্ধিশালী ছিল।

বাগদাদ- ইরাকের রাজধানী, তাইগ্রিস নদীর উভয় তীরে এবং ফুরাত বা ইউফ্রেতিস নদীর পঁচিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। আব্বাসীয় খলিফা মনসুর ৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে নগরটি প্রতিষ্ঠা করেন। খলিফা হারুনর রশীদের সময় বাগদাদ মুসলিম সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত হয়। বর্তমানে ইরাকের রাজধানী।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'প্রত্যুপকার' গল্পে কোন খলিফার সময়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে ?

ক. হারুন-অর-রশিদ খ. উমর (রা:)

গ. আল মামুন ঘ. আল মনসুর

২. নিচে কিছু মানবিক গুণ তুলে ধরা হল-

i. নিঃস্বার্থ, গরিবের বন্ধু, আখেরাতে বিশ্বাসী, গণতন্ত্রমনা

ii. পরোপকারী, আল্লাহভীরু, সদ্বিবেচক, আমানতদার

iii. দয়াশীল, পরোপকারী, ন্যায়পরায়ণ, সদ্বিবেচক

উপকারীর চারিত্রিক গুণ প্রতিফলিত হয়েছে কোনটিতে?

ক. i খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. iii

নিচের উদ্ধৃত অংশটি পড়ে ৩, ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

"তোমার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া, সাতিশয় প্রীতিপ্রাপ্ত হইয়াছি। আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি আপন আলয়ে প্রস্থান কর।"-এই বলিয়া খলিফা তাঁহাকে মহামূল্য পরিচ্ছদ, সুসজ্জিত দশ অশ্ব, দশ খচ্চর, দশ উষ্ট্র উপহার দিলেন এবং ডেমাস্কাসের রাজপ্রতিনিধির এক অনুরোধপত্র ও পাথেয় স্বরূপ বহু সংখ্যক অর্থ দিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন।

৩. লোকটিকে কোন অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল?

ক. দেশদ্রোহিতার অভিযোগে খ. ডাকাতির অভিযোগে

গ. গুপ্তহত্যার অভিযোগে ঘ. ঈর্ষাপরায়ণদের মিথ্যা অভিযোগে

৪. লোকটির কোন পরিচয় পেয়ে খলিফা অতিশয় আনন্দিত হয়েছিলেন?

i. সদ্বিবেচক
ii. পরোপকারী
iii. নিঃস্বার্থ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i   খ. ii
গ. iii   ঘ. i ও ii

৫. 'অনেক উপঢৌকন দিয়ে খলিফা লোকটিকে বিদায় করলেন।'-এতে খলিফার কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে ?

ক. ঔচিত্যবোধ   খ. মহানুভবতা
গ. দানশীলতা   ঘ. বদান্যতা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ছকের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
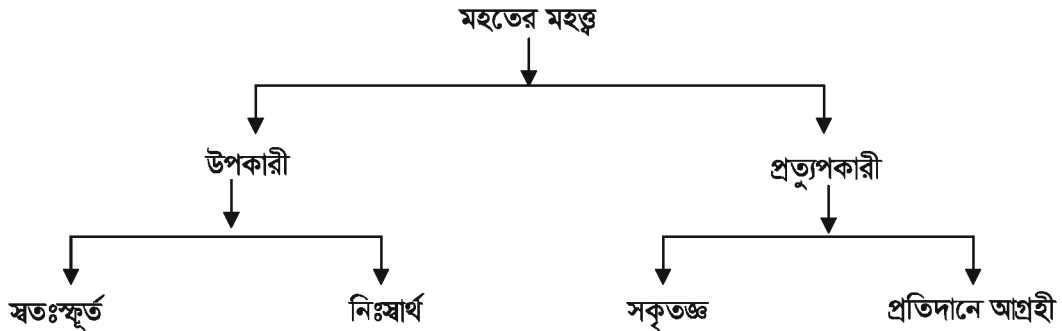
ক. অপরের জন্য স্বার্থশূন্যভাবে কাজ করলে তাকে কী বলে ?
খ. 'প্রত্যুপকারী সকৃতজ্ঞ'-কথাটি বুঝিয়ে বল।
গ. উপকারী ও প্রত্যুপকারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অঙ্কনে উপরের ছকটি কতটুকু যুক্তিযুক্ত হয়েছে তা আলোচনা কর।
ঘ. তোমার পঠিত 'প্রত্যুপকার' গল্পটি উপর্যুক্ত ছকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

নীলদর্পণ

দীনবন্ধু মিত্র

[নাট্যকার পরিচিতি : বাংলা নাটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনাকার দীনবন্ধু মিত্র। ১৮৩০ সালে নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। দরিদ্র ঘরের সন্তান। মেধাবী ছাত্র। বৃত্তি লাভ করে উচ্চস্তরে পড়ালেখা করেছেন। পোস্টাল বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছিলেন। প্রথমে নাম ছিল গন্ধর্বনারায়ণ মিত্র। কিন্তু সহপাঠীরা গন্ধ গন্ধ বলে বিদ্রুপ করত, তাই নাম বদল করে দীনবন্ধু মিত্র নাম নিলেন। সত্যই তিনি দীনবন্ধু। বাংলা নাট্যকর্মে প্রথম গণমুখী নাটক 'নীলদর্পণ' রচনা করলেন। এ নাটকের গুরুত্ব এমনই যে তখনকার নীলকর সাহেবরা বাংলার কৃষকদের ওপর অত্যাচার–নিপীড়ন বন্ধ করতে বাধ্য হয়। দীনবন্ধু জীবনবাদী এবং রসমন্ডিত নাট্যকার। তাঁর নাটক দিয়েই বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সূত্রপাত। 'নীলদর্পণ' ছাড়া 'নবীন তপস্বিনী', 'সধবার একাদশী', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'জামাই বারিক', 'লীলাবতী' এবং 'কমলে কামিনী' প্রভৃতি নাটক রচনা করেছেন। ১৮৭৩ সালের ১লা নভেম্বর অকালে মারা গেছেন দীনবন্ধু মিত্র। তাঁর নাটক এখনও সমানভাবে আদৃত এবং অভিনীত হয়। বাংলার প্রকৃত গণনাটক রচনা করে দীনবন্ধু বাংলা নাট্যসাহিত্য ও নাট্যকর্মকে সমৃদ্ধ করেছেন।]

[বেগুনবেড়ের কুঠি বড় বাঙলোর বারান্দা]

(**চরিত্র :** আই. আই. উড সাহেব, গোপীনাথ দাস, সাধুচরণ, রাইচরণ, নবীনমাধব, আমিন, পেয়াদা প্রমুখ।)

গোপী : হুজুর আমি কী করতেছি, আপনি স্বচক্ষেই তো দেখছেন। অতি প্রত্যুষে ভ্রমণ করতে আরম্ভ করে তিন প্রহরের সময় বাসায় প্রত্যাগমন করি। আবার আহারের পরেই দাদনের কাগজপত্র নিয়ে বসি। তাতে কোনোদিন রাত দুই প্রহরও হয়, কোনোদিন বা একটাও বাজে।

উড : তুমি বড় না-লায়েক আছে। স্বরপুর, শ্যামনগর, শান্তিঘাটা এ তিন গাঁয় কিছু দাদন হল না। শ্যামচাঁদ বেগোর তোম দোরস্তা হোগা নাই।

গোপী : ধর্মাবতার, অধীন হুজুরের চাকর। আপনিই অনুগ্রহ করে পেস্কারি হতে দেওয়ানি দিয়েছেন। হুজুর মালিক, মারলেও মারতে পারেন, কাটলেও কাটতে পারেন। এ কুঠির কতকগুলিন প্রবল শত্রু হয়েছে, তাদের শাসন ব্যতীত নীলের মঙ্গল হওয়া দুষ্কর।

উড : আমি না জানিলে কেমন করে শাসন করিতে পারে? টাকা, ঘোড়া, লাঠিয়াল, সড়কিওয়ালা আমার অনেক আছে, ইহাতে শাসন হইতে পারে না। সাবেক দেওয়ান শত্রুর কথা আমাকে জানাইত। তুমি দেখনি, আমি বজ্জাতদের চাবুক দিয়াছি। গরু কাড়িয়া আনিয়াছি, জরু কয়েদ করিয়াছি। জরু কয়েদ করিলে শালালোক বড় শাসিত হয়। বজ্জাতি কা বাত হাম কুচ শুনা নাই। তুমি বেটা লক্ষ্মীছাড়া আমারে কিছু বলনি। তুমি বড় না-লায়েক আছে।

গোপী : মোল্লাদের ধান ভেঙে নীল করার জন্য এবং গোলক বসুর সাত পুরুষের লাখেরাজ বাগান ও রাজার আমলের গাঁতি বাহির করতে আমি যে সকল কাজ করেছি, তা চামারও পারে না। আজ আমার কপাল মন্দ, তাই এত করেও যশ নাই।

উড : নবীনমাধব সব টাকা চুকয়ে চায়। ওসকো হাম এক কড়ি নাহি দেগা। ওসকো হিসাব দোরস্ত করগে রাখ। শালা বড় মামলাবাজ, হাম দেখেগা কেস্তারা রূপায়ে লেয়।

গোপী : ধর্মাবতার, সে একজন কুঠির প্রধান শত্রু। পলাশপুর জ্বালান কখনই প্রমাণ হত না, যদি নবীন বসু ওর ভিতর না থাকত। বেটা দরখাস্তের মুসাবিদা করে দেয়। উকিল মোক্তারদিগের এমন শলা-পরামর্শ দিয়েছিল যে,তার জোরেই হাকিমের রায় ফিরে যায়। বেটা এবার আবার কী যোটাযোট করছে তার কিছুই বুঝতে পারছি না।

উড : তুমি ভয় পাইয়াছ। হাম বোলা কি নাই, তুমি বড় না-লায়েক আছে, তোম্‌সে কাম হোগা নাই।

গোপী : হুজুর, ভয় পাওয়ার কী দেখলেন, যখন এ পদবীতে পদার্পণ করিছি, তখন ভয়, লজ্জা, শরম, মান-মর্যাদার মাথা খেয়েছি।

উড : আমি কথা চাই না, আমি কাজ চাই।

[সাধুচরণ, রাইচরণ, আমিন ও পেয়াদার প্রবেশ]

এ বজ্জাতের হাতে দড়ি পড়িয়াছে কেন?

গোপ : ধর্মাবতার, এই সাধুচরণ একজন মাতব্বর রায়ত। কিন্তু নবীন বসুর পরামর্শে নীলের ধ্বংসে প্রবৃত্ত হয়েছে।

সাধু : ধর্মাবতার, নীলের বিরুদ্ধাচরণ করি না, করতেছি না। করিবার ক্ষমতাও নাই। ইচ্ছায় করি আর অনিচ্ছায় করি, নীল করেছি, এবারও করতে প্রস্তুত আছি। তবে সকল বিষয়ে সম্ভব অসম্ভব আছে। আধ আঙুল চুঙিতে আট আঙুল বারুদ পুরলে কাজেই ফাটে। আমি অতি ক্ষুদ্র প্রজা, দেড়খানি লাঙল রাখি, আবাদ হদ্দ কুড়ি বিঘা। তার মধ্যে যদি নয় বিঘা নীলে গ্রাস করে, তবে কাজেই চটতে হয়। তা আমার চটায় আমিই মরব, হুজুরের কী!

আমিন : বেটা মোকদ্দমা করতে চায়।

উড : তুমি শালা বড় বজ্জাত আছে। তোমার যদি কুড়ি বিঘার নয় বিঘা নীল করতে বলেছে, তবে তুমি কেন আর নয় বিঘা নতুন করিয়া ধান কর না?

সাধু : হুজুর, যে নয় বিঘা নীলের জন্য চিহ্নিত হয়েছে তা যদি কুঠির লাঙল, গরু ও মাইন্দার দিয়ে আবাদ হয়, তবে আমি আর নয় বিঘা নতুন করে ধানের জন্য নিতে পারি। ধানের জমিতে যে কারকিত করতে হয়, তার চারগুণ কারকিত নীলের জমিতে দরকার করে। যদি নয় বিঘা আমার চাষ দিতে হয়, তবে বাকি এগার বিঘাই পড়ে থাকবে।

উড : শালা বড় হারামজাদা। দাদনের টাকা নিবি তুই, চাষ দিতে হবে আমি? (জুতার গুঁতো দিয়ে আঘাত) শ্যামচাঁদকা সাথ মুলাকাত হোনেসে হারামজাদকি সব ছোড় যাগা। (দেওয়াল থেকে শ্যামচাঁদ চাবুক নিল)

সাধু : হুজুর, মাছি মেরে হাত কালো করা মাত্র, আমরা-

রাই : (রেগে) ও দাদা, তুই চুপ দে, ঝা ন্যাকে নিতি চাচ্চে ন্যাকে দে, খিদের চোটে নাড়ী ছিঁড়ে পড়ল, সারা দিনডা গেল, নাতিও পালাম না, খাতিও পালাম না।

আমিন : কই শালা, ফৌজদারি করলি না ? (রাইচরণের কান মলন)

রাই : মলাম মাগো, মাগো।

উড : (শ্যামচাঁদ দিয়ে আঘাত) ব্লাডি নিগার, মার-

[নবীনমাধবের প্রবেশ]

রাই : বড়বাবু, মলাম গো। জল খাব গো, মেরে ফ্যাল্লে গো।

নবীন : ধর্মাবতার, ওদের এখনও স্নান হয়নি। আহারও হয়নি। ওদের পরিবাররা এখনও বাসি মুখে জল দেয়নি। যদি শ্যামচাঁদ আঘাতে রায়ত সমুদয় বিনাশ করে ফেলেন, তবে আপনার নীল বুনবে কে? ওদের অদ্য ছেড়ে দেন। আমি কাল প্রাতে সমভিব্যাহারে এনে, আপনি যেমন অনুমতি করবেন, তেমন করে যাব।

উড : তোমার নিজের চরকায় তেল দাও। পরের বিষয়ে কথা কহিবার কী আবশ্যক আছে? সাধু ঘোষ, তোর মত কী, তা বল? আমার খানার সময় হইয়াছে।

সাধু : হুজুর, আমার মতের অপেক্ষা আছে কি? আপনি নিজে গিয়ে ভালো ভালো চার বিঘাতে মার্ক দিয়ে এসেছেন, আজ আমিন মশায়, আর যে কয়খান ভালো জমি ছিল, তাতেও চিহ্ন দিয়ে এসেছেন। আমি স্বীকার করছি, বিনা দাদনে নীল করে দেব।

উড : সব মিছা । হারামজাদা, বজ্জাত, বেঈমান। (শ্যামচাঁদ দিয়ে প্রহার)

নবীন : (হাত দিয়ে সাধুচরণের পিঠ ঢাকলেন) গরিব ছাপোষা মানুষটাকে একেবারে মেরে ফেললেন ! ওর পরিবারের মনে কী ক্লেশ হতেছে? সাহেব, আপনারও পরিবার আছে, যদি আপনাকে খাবার সময় কেউ ধৃত করে নিয়ে যায়, তবে মেমসাহেবের মনে কেমন পরিতাপ জন্মে?

উড : চোপ রও, শালা গোরুখোর। এ অমরনগরের ম্যাজিস্ট্রেট নয় যে কথায় কথায় নালিশ করবি, আর কুঠির লোক ধরে কয়েদ করবি। রাস্কেল, এই দিনের মধ্যে তুই ষাট বিঘা দাদন লিখিয়া দিবি, তবে তোর ছাড়ান। নচেৎ, এই শ্যামচাঁদ তোর মাথায় ভাঙব। তোর দাদনের জন্য দশখানা গ্রামের দাদন বন্ধ রহিয়াছে।

নবীন : (দীর্ঘনিশ্বাস) হা মাতঃ পৃথিবী, তুমি দ্বিধা হও, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি।

গোপী : বাড়াবাড়ির কাজ কী? আপনি বাড়ি যান।

নবীন : সাধু, পরমেশ্বরকে ডাক, তিনিই দীনের রক্ষক।

[নবীনমাধবের প্রস্থান]

উড : গোলাম কা গোলাম । দেওয়ান, দপ্তরখানায় লইয়া যাও, দস্তুর মোতাবেক দাদন দাও।

[উডের প্রস্থান]

গোপী : চল সাধু, দপ্তরখানায় চল। সাহেব কি কথায় ভোলে?

বাড়া ভাতে ছাই তব বাড়া ভাতে ছাই,
ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষা নাই।

অনুশীলনমূলক কাজ

নাট্যাংশ পরিচিতি

আলোচ্য নাট্যাংশ দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ'-এর একটি দৃশ্য মাত্র। পাঁচ অঙ্ক এবং আঠারটি দৃশ্যের নাটক 'নীলদর্পণ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে ঢাকা থেকে। ১৮৬১ সালে 'নীলদর্পণ' সর্বপ্রথম ঢাকাতেই অভিনীত হয় বলে অনুমিত হয়। এমন জনপ্রিয়, রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন এবং সৎ বক্তব্যসমৃদ্ধ জীবনধর্মী নাটক বাংলাতে খুব বেশি নেই। এ নাট্যাংশটি 'নীলদর্পণ' - এর প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য। মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমের প্রয়োজন ও উপযোগিতার জন্য দৃশ্যটি সংক্ষেপিত এবং সম্পাদিত হয়েছে।

নীলচাষের পরিচয়

সাদা কাপড়, আর ঘরের দেওয়ালের রং নীল রঙে শোভন অথবা সাদা রঙকে আরও উজ্জ্বল করার জন্য নীল রঙের চাহিদা বেড়ে গেছে, যখন থেকে কার্পাস সুতোর ব্যবহার শুরু। সাদা কাপড় রঙের জন্য নীল রং দরকার। ইউরোপীয়রা এ নীল সস্তায় লাভের জন্য ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে বিরাট ব্যবসা ফেঁদেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে। বাংলাদেশের কয়েকটি অঞ্চলে- রাজশাহী, যশোহর, খুলনা, পাবনা ও মুর্শিদাবাদে নীলগাছের চাষ সহজ ছিল। নীল গাছে ফুল ফোটার সময় (আগস্ট মাস) নীলগাছ কাটা হয়। ডগা সমেত পাতা চৌবাচ্চার পানিতে ডুবিয়ে রাখা হত। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাতে পচন ধরত। পানি হলুদ বর্ণ হলে অন্য পাত্রে আনা হত। তখন রং সবুজ থেকে গাঢ় নীলে পরিণত হয় এবং এ রঙের দানা টুকরো টুকরো হয়ে নিচে পড়ে। তাকে শুকিয়ে নিলে নীলের উৎপাদন হয়।

ইংরেজ নীল ব্যবসায়ীরা বড় বড় কুঠিবাড়ি তৈরি করে নীলের চাষ শুরু করে। বাংলার কৃষককে দাদন দিয়ে নীলচাষ করতে বাধ্য করত। কৃষকের ভালো ধানের জমিতে এভাবে নীলের চাষ করা হত। কৃষকরা ত্রিশ টাকার নীলে ভাগ পেত মাত্র পাঁচ টাকা। আর ইংরেজ পেত পঁচিশ টাকা। অথচ তাতে কৃষকের খরচের টাকাও উঠে আসত না। বাংলার কৃষক যদি নীলচাষ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করত, তাহলে তাকে লাঠিয়াল দিয়ে ধরে এনে কুঠিবাড়ির কয়েদখানায় বন্দি করে

নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করা হত। দীনবন্ধু মিত্র অধিকাংশ বাস্তব ঘটনা ও চরিত্র অবলম্বনে নীলচাষ, বাংলার কৃষকের সীমাহীন কষ্ট এবং ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচার নিয়ে রচনা করেছেন 'নীলদর্পণ' নাটক। এ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ পড়ে ইংরেজ শাসকরা নীলকরদের অত্যাচার ও নিপীড়নের কথা জানতে পারে। আর বাংলার নিপীড়িত কৃষকদের দলবন্ধ সংগ্রামের পরিচয় পায়। অবশেষে নীলচাষ বন্ধ হয়ে গেল। কেননা ততদিনে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নীলের উৎপাদন শুরু হয়েছে। নীল চাষিদের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার ও নিপীড়নের কাহিনীর নাটক 'নীলদর্পণ' বাংলার প্রথম গণনাটক হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা

প্রহর- তিন ঘণ্টা কাল - দিন রাত্রিতে অষ্টপ্রহর। **বেগোর**- ব্যতীত। **দাদন**-অগ্রিম মূল্য বা বায়না। **না-লায়েক**- অযোগ্য। **শ্যামচাঁদ**- চামড়ার তৈরি চাবুক। **পেস্কারি**- (পেশকার) যে কর্মচারী কাগজপত্র পেশ করে। **দেওয়ানি**- খাজনা আদায়ের প্রধান কর্মচারী। **কুঠি**- নীলকুঠি। নীলকরদের থাকা ও প্রশাসনের জন্য বিরাট অঞ্চল জুড়ে আস্তানা। **নীল**- নীলচাষ। **জরু** - বিবি, বউ। **লাখেরাজ**- নিষ্কর। **চুকয়ে**- চুকিয়ে বা হিসাবমতো অর্থ নিতে চায়। **দোরস্ত** - জব্দ। **কেস্তারা**- কিস্ তেরে- কেমন করে। **মুসাবিদা**- দলিলপত্রের খসড়া। **রায়ত**- জমি চাষের জন্য চাষা, প্রজা। **যোটাযোট**- সংযোগ, দলবদ্ধতা। **চুঙি**- ছিদ্রযুক্ত নল। **মাইন্দার**- মাহিনদার, মাইনে করা চাকর। **কারকিত**- কৃষিকর্ম। **চুক**- লিখে দেওয়া বা চুকিয়ে দেওয়া। **ঝা**- যা। **ন্যাকে**- লিখে নিতে চায়। **নাতি**- নাইতে (স্নান)। **নিগার**- (Nigger), কৃষ্ণকায় মানুষ (গালি অর্থে)। **খানা**- খাবার। **মার্ক** - Mark, চিহ্নিত করা। **গোরুখোর**- নবীনমাধব হিন্দু, গোমাংস তার জন্য নিষিদ্ধ, গরুখোর বলে নবীনমাধবকে তিরস্কার করা হয়েছে। **দস্তুর মোতাবেক**- নিয়ম অনুসারে। **যম**- মৃত্যুদূত। **চিহ্নিত**- জমির সীমানা দাগ দেওয়া। **মোক্তার**- ছোট উকিল। এখন আর মোক্তার হয় না।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নীলদর্পণ নাট্যাংশে ব্যবহৃত কিছু চরিত্র নিচে তুলে ধরা হল-

i. উড সাহেব, গোপীনাথ দাস, সাধুচরণ
ii. গোপীনাথ, নবীনমাধব, সাধুচরণ
iii. গোপীনাথ, সাধুচরণ, রাইচরণ

কোন চরিত্রগুচ্ছ মার্জিত বাংলায় কথা বলে?

ক. i খ. ii ও i
গ. ii ঘ. iii

২. ইংরেজ সাহেবের এ দেশীয় দোসর কয়জন?

ক. সাতজন খ. পাঁচজন
গ. তিনজন ঘ. দুজন

উদ্ধৃত অংশটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

'ধর্মাবতার, নীলের বিরুদ্ধাচরণ করি না, করতেছি না। করিবার ক্ষমতাও নাই। ইচ্ছায় করি আর অনিচ্ছায় করি, নীল করেছি, এবারও করতে প্রস্তুত আছি। তবে সকল বিষয়ে সম্ভব অসম্ভব আছে। আধ আঙুল চুঙিতে আট আঙুল বারুদ পুরলে-কাজেই ফাটে।

৩. উদ্ধৃতাংশটি হচ্ছে একটি-

ক. প্রবন্ধের অংশবিশেষ খ. গল্পের অংশবিশেষ
গ. নাটকের অংশবিশেষ ঘ. রম্য রচনার অংশবিশেষ

৪. উদ্ধৃতাংশে প্রকাশ পেয়েছে

i. নীলকরদের পরিচয়
ii. স্থানীয় চাষিদের অসহায়ত্ব
iii. নীলকর ও চাষিদের সম্পর্ক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. ii ও iii

৫. 'আধ আঙুল চুঙিতে আট আঙুল বারুদ পুরলে–কাজেই ফাটে।' এটি একটি-

i. খেদোক্তি
ii. স্বগতোক্তি
iii. বক্রোক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ছকের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
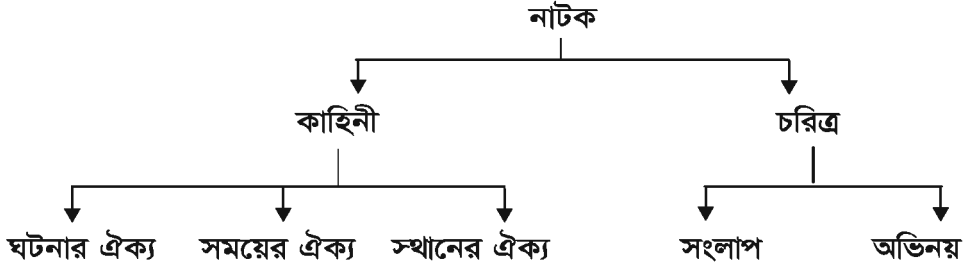
ক. নাটকের প্রধান উপাদান কোনটি?
খ. 'ঘটনার ঐক্য' বলতে কী বোঝ ব্যাখ্যা কর ।
গ. কাহিনী ও চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় কর।
ঘ. উপরি-উক্ত ছকের আলোকে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের পরিচিতি তুলে ধর।

২. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

নীলকর সাহেবেরা ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের সহযোগী শোষক ও নির্যাতক হিসেবে কাজ করেছে। নিজেদের ইচ্ছেমতো জমিতে নীলের চাষ করেছে, করতে বাধ্য করেছে। কেউ অনীহা প্রকাশ করলে তাকে কুঠিতে ধরে নিয়ে শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে। সে অত্যাচারে অনেকে তাদের প্রাণও হারিয়েছে। মর্মান্তিক সেই অত্যাচারের নিখুঁত দলিল হিসেবে আমরা 'নীলদর্পণ' নাটকখানিকে পাই।

ক. নীলকরেরা কখন এদেশে নীলের চাষ করত?
খ. নীলকরেরা স্থানীয় চাষিদের কুঠিতে ধরে নিয়ে অত্যাচার করত কেন?
গ. অনুচ্ছেদটির আলোকে নীলকরদের অত্যাচারের বর্ণনার পাশাপাশি তাদের স্বরূপ উন্মোচন কর।
ঘ. 'মর্মান্তিক সেই অত্যাচারের নিখুঁত দলিল হিসেবে আমরা 'নীলদর্পণ' নাটকখানিকে পাই।' -এ উক্তির আলোকে 'নীল দর্পণ' নাটকের পরিচয় দাও।

রচনার শিল্পগুণ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[লেখক পরিচিতি : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৬শে জুন ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সে বছরই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে চাকরিতে নিযুক্ত হন। বঙ্কিমচন্দ্র তেত্রিশ বছর একই পদে চাকরি করে ১৮৯১ সালে অবসর গ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাঠ্যাবস্থায়ই সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে বাংলা উপন্যাস রচনার পথিকৃৎ হিসেবে। ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম বাংলা উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী বাংলা কথাসাহিত্যে এক নবদিগন্ত সৃষ্টি করে। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস হল : কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারানী, চন্দ্রশেখর, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী ও সীতারাম। প্রবন্ধ সাহিত্যেও বঙ্কিমচন্দ্র কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কমলাকান্তের দপ্তর, লোকরহস্য, কৃষ্ণ চরিত্র ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৯৪ সালের ৮ই এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন।]

তোমরা যাহা বলিবার প্রয়োজন, রচনায় তাহা যদি প্রকাশ করিতে না পারিলে, তবে রচনা বৃথা হইল। অর্থব্যক্তির বিশেষ কোনো নিয়ম নাই, তবে দুই একটা সঙ্কেত আছে।

যে কথাটিতে তোমার কাজ হইবে, সেই কথাটি ব্যবহার করিবে। তাহা শুনিতে ভালো নয়, কি বিদেশি কথা, এরূপ আপত্তি গ্রাহ্য করিও না। এক সময়ে লেখকদিগের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করিব না। কিন্তু এখনকার উৎকৃষ্ট লেখকেরা প্রায়ই এ নিয়ম ত্যাগ করিয়াছেন। যে কথাটিতে মনের ভাব ঠিক ব্যক্ত হয়, তাহারা সেই কথাই ব্যবহার করেন।

একটি উদাহরণ দিতেছি। তুমি কোনো আদালতের ইসতিহারের কথা লিখিতেছ। আদালত হইতে যে সকল আজ্ঞা, সকলের জানিবার জন্য প্রচারিত হয়, তাহাকে ইসতিহার বলে। ইহার আর একটি নাম 'বিজ্ঞাপন'। বিজ্ঞাপন সংস্কৃত শব্দ, ইসতিহার বৈদেশিক শব্দ, এজন্য অনেকে বিজ্ঞাপন শব্দ ব্যবহার করিতে চাহিবেন। কিন্তু বিজ্ঞাপনের একটু দোষ আছে, তাহার অনেক অর্থ হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকর্তা গ্রন্থ লিখিয়া গ্রন্থের পরিচয়ের জন্য প্রথম যে ভূমিকা লেখেন তাহার নাম বিজ্ঞাপন। দোকানদার আপনার জিনিস বিক্রয়ের জন্য খবরের কাগজে বা অন্যত্র যে খবর লেখে, তাহার নাম বিজ্ঞাপন। সভা কি রাজকর্মচারীর রিপোর্টের নাম বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন শব্দের এইরূপ গোলযোগ আছে। এ স্থলে আমি ইসতিহার শব্দই ব্যবহার করিব। কেননা, ইহার অর্থ সকলেই বুঝে, লৌকিক ব্যবহার আছে। অর্থেরও কোনো গোল নাই।

দ্বিতীয় সংকেত এই যে, যদি এমন কোনো শব্দই না পাইলাম যে তাহাতে আমার মনের ভাব ঠিক ব্যক্ত হয়, তবে যেটি উহারই মধ্যে ভালো, সেইটি ব্যবহার করিব। ব্যবহার করিয়া তাহার পরিভাষা করিয়া অর্থ বুঝাইয়া দিব। দেখ 'জাতি' শব্দ নানার্থ। প্রথম, জাতি অর্থে হিন্দু সমাজের জাতি; যেমন-ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত ইত্যাদি। দ্বিতীয়, জাতি অর্থে দেশ বিশেষের মনুষ্য, যেমন- ইংরেজ জাতি, ফরাসি জাতি, চীন জাতি। তৃতীয়, জাতি অর্থে মনুষ্যবংশ; যেমন- আর্য জাতি, সেমীয় জাতি, তুরানী জাতি ইত্যাদি। চতুর্থ, জাতি অর্থে কোনো দেশের মনুষ্যদিগের শ্রেণীবিশেষ মাত্র; যেমন, য়িহুদায় দশ জাতি ছিল। পঞ্চম, নানা জাতি পক্ষী, কুক্কুরের জাতি বলিলে যে অর্থ বুঝায়, তাই। ইহার মধ্যেও কোনো অর্থ প্রকাশ করিতে গেলে, জাতি ভিন্ন বাংলায় অন্য শব্দ নাই। এ স্থলে জাতি শব্দই ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু ব্যবহার করিয়া তাহার পরিভাষা করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, কোনো অর্থে জাতি শব্দ ব্যবহার করা যাইতেছে। বুঝাইয়া দিয়া উপরে যেমন দেওয়া গেল, সেইরূপ উদাহরণ দিলে আরও ভালো হয়।

প্রাঞ্জলতা রচনার বড় গুণ। তুমি যাহা লিখিবে লোকে পড়িবামাত্র যেন তাহা বুঝিতে পারে। যাহা লিখিলে, লোকে যদি তাহা না বুঝিতে পারিল, তবে লেখা বৃথা, কিন্তু অনেক লেখক এ কথা মনে রাখেন না। কতকগুলি নিয়ম আর কতকগুলি কৌশল মনে রাখিলে রচনা খুব প্রাঞ্জল করা যায়। দুই রকমই বলিয়া দিতেছি।

একটি বস্তুর অনেকগুলি নাম থাকিতে পারে, যেমন আগুনের নাম অগ্নি, হুতাশন অথবা হুতভুক, অনল, বৈশ্বানর, বায়ুসখা ইত্যাদি। এখন, আগুনের কথা লিখিতে গেলে ইহার মধ্যে কোন নামটি ব্যবহার করিব? যেটি সবাই জানে, অর্থাৎ আগুন বা অগ্নি। যদি বলি, হুতভুক সাহায্যে বাষ্পীয় যন্ত্র সঞ্চালিত হয়, তবে অধিকাংশ বাঙালি আমার কথা বুঝিবে না । যদি বলি যে, অগ্নির সাহায্যে বাষ্পীয় যন্ত্র চলে, সকলেই বুঝিবে। অনর্থক কতকগুলো সংস্কৃত শব্দ লইয়া সন্ধি সমাসের আড়ম্বর করিও না- অনেকে বুঝিতে পারে না। যদি বলি 'মীনক্ষোভাকুল কুবলয়' তোমরা কেহ কি সহজে বুঝিবে? আর যদি বলি 'মাছের তাড়নে যে পদ্ম কাঁপিতেছে' তবে কে না বুঝিবে?

অনর্থক কথা বাড়াইও না। অল্প কথায় কাজ হইলে বেশি কথার প্রয়োজন কী? 'এবম্বিধ বিবিধ প্রকার ভয়াবহ ব্যাপারের বশীভূত হইয়া, যখন সূর্যদেব পূর্বগগনে অধিষ্ঠান করিয়া পৃথিবীতে স্বীয় কিরণমালা প্রেরণ করিলেন, তখন আমি, সেই স্থান পরিত্যাগপূর্বক, অন্যত্র গমন করিলাম'। 'এরূপ না বলিয়া যদি বলি, এইরূপ অনেক বিষয়ে ভয় পাইয়া, যখন সূর্য উঠিল তখন আমি সে স্থান হইতে চলিয়া গেলাম' তবে অর্থের কোনো ক্ষতি হয় না, অথচ সকলে সহজে বুঝিতে পারে।

জটিল বাক্য রচনা করিও না। অনেকগুলি বাক্য একত্র জড়িত করা হইলে বাক্য জটিল হয়। যেখানে বাক্য জটিল হইয়া আসিবে, সেখানে জটিল বাক্যটি ভাঙিয়া ছোট ছোট সরল বাক্যে সাজাইবে। উদাহরণ দেখ : 'দিন দিন পল্লীগ্রামে সকলের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে অল্পকাল মধ্যে অনেক পল্লীগ্রাম যে জলহীন হইবে এবং তন্দ্ধেতুক যে কৃষিকার্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবে, এরূপ অনুমান করিয়াও অনেক দেশহিতৈষী ব্যক্তি তাহার প্রতিবিধানে যত্ন করেন না, দেখিয়া আমরা বড় দুঃখিত হইয়াছি।'

এই বাক্য অতি জটিল। সহজে বুঝা যায় না । কিন্তু ছোট ছোট বাক্যে ইহাকে বিভক্ত করিয়া লইলে কত সহজ হয় দেখ- 'দিন দিন পল্লীগ্রামে সকলের শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে অল্পকাল মধ্যে অনেক পল্লীগ্রাম জলহীন হইবে। পল্লীগ্রাম সকল জলহীন হইলে কৃষিকার্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবে। অনেক দেশহিতৈষী ব্যক্তি ইহা অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু অনুমান করিয়াও তাহারা ইহার প্রতিবিধানের যত্ন করেন না। ইহা দেখিয়া আমরা বড় দুঃখিত হইয়াছি।'

একটি বাক্যের স্থানে ছয়টি হইয়াছে। কিন্তু বুঝিবার আর কোনো কষ্ট নাই। যেখানে স্থূল কথাটা বুঝিতে কঠিন, সেখানে উদাহরণ প্রয়োগে বড় পরিষ্কার হয়। সুতরাং উদাহরণের আর পৃথক উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। স্থূল বাক্যটি বড় সংক্ষিপ্ত হইলে অনেক সময়ে বুঝিবার কষ্ট হয়। এমন স্থলে সম্প্রসারণ করিব। 'অশ্ব' শব্দটির উদাহরণ দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।

অশ্ব, শৃঙ্গহীন উদ্ভিদভোজী চতুষ্পদ বিশেষ।

ইহাতে অনেক কথা বুঝিবার কষ্ট আছে। যাহা যাহা বুঝিবার কষ্ট তাহা সম্প্রসারিত বাক্যগুলিতে পরিষ্কার হইয়াছে। আর এক প্রকারের উদাহরণ দেখ :

মনে কর, এ বৎসর বৃষ্টি কম হইয়াছে। লোকে বলে 'ঊন বর্ষায় দুনো শীত'। অর্থাৎ যেবার বৃষ্টি কম হয় সেবার শীত বেশি হয়। মনে কর, তুমি সে কথা জান না। এমন অবস্থায় ভাদ্র মাসে তোমাকে যদি কেহ বলে এ বৎসর শীত বেশি হইবে, তাহা হইলে তুমি তাহার কথার মর্ম কিছু বুঝিতে পারিবে না, হয়তো তাহাকে পাগল মনে করিবে। কিন্তু সে যদি নিজ বাক্যের সম্প্রসারণ করিয়া বলে, 'যে যে বৎসর কম বর্ষা হইবে সেই সেই বৎসর বেশি শীত হইয়াছে দেখা গিয়াছে। এ বৎসর কম বর্ষা হইয়াছে। অতএব এ বৎসর বেশি শীত হইবে।' তাহা হইলে বুঝিবার কষ্ট থাকে না।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'রচনার শিল্পগুণ' প্রবন্ধটি বঙ্কিম রচনাবলি থেকে সংগৃহীত। এটি রচনাশিল্প প্রসঙ্গে লেখকের রচিত 'অর্থব্যক্তি ও প্রাঞ্জলতা'- এ দুটি পাঠের সমন্বিত রূপ।

মূলবক্তব্য

রচনার দুটি প্রধান শিল্পগুণ হচ্ছে অর্থব্যক্তি ও প্রাঞ্জলতা। অর্থব্যক্তি হচ্ছে আমরা যে কথাটি বলতে চাই তা অপরকে উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে বুঝিয়ে বলা। কাজেই রচনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযোগী শব্দটি নির্বাচন করা কর্তব্য।

অন্যদিকে, প্রাঞ্জলতা বলতে রচনার সহজবোধ্যতাকে বোঝায়। যা লেখা হল তা যেন লোকে বুঝতে পারে, সেদিকে লেখককে অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে উপযুক্ত শব্দটি নির্বাচন লেখকের একটি গুরুদায়িত্ব।

শব্দার্থ ও টীকা

অর্থব্যক্তি- অর্থ প্রকাশ, যা বলতে চাই তা ঠিকভাবে বলা। **ইসতিহার** (আরবি)- বিজ্ঞপ্তি, প্রচারপত্র । **লৌকিক**- পার্থিব, সামাজিক। **পরিভাষা**- অন্যভাষা থেকে রূপান্তরিত বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ। **প্রাঞ্জলতা**- সহজে বোঝা যায় এমন, সহজবোধ্যতা। **আড়ম্বর**- বিলাস, বাইরের চাকচিক্য। **প্রতিবিধান**- প্রতিকার, প্রতিরোধ। **শৃঙ্গহীন**- শিং নেই এমন।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'রচনার শিল্পগুণ' প্রবন্ধে কঠিন কথাটা বুঝতে সহজ ও স্পষ্ট হয় কোনটি ব্যবহার করলে?
   ক. ব্যাখ্যা　　খ. উদাহরণ
   গ. পরিভাষা　　ঘ. উপযোগী শব্দ

২. 'অর্থব্যক্তি' গুণটি কোন বাক্যে রক্ষিত হয়েছে?
   ক. সূর্যদেব পূর্ব গগনে অধিষ্ঠান করে পৃথিবীকে স্বীয় কিরণমালা প্রেরণ করে।
   খ. সূর্য পূর্বাকাশে উঠে পৃথিবীকে আলোকিত করে।
   গ. সূর্য পূর্ব অন্তরীক্ষে উঠে পৃথিবীকে আলোকময় করে।
   ঘ. সূর্য পূর্বাকাশে উদিত হয়ে ধরণীকে আলোকিত করে।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'যে কথাটিতে তোমার কাজ হইবে, সেই কথাটি ব্যবহার করিবে। তাহা শুনিতে ভালো নয়, কি বিদেশি কথা, এরূপ আপত্তি গ্রাহ্য করিও না। এক সময়ে লেখকদিগের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করিব না। কিন্তু এখনকার উৎকৃষ্ট লেখকেরা প্রায়ই এই নিয়ম ত্যাগ করিয়াছেন। যে কথাটিতে মনের ভাব ঠিক ব্যক্ত হয়, তাঁহারা সেই কথাই ব্যবহার করেন।'

৩. অনুচ্ছেদটিতে প্রকাশ পেয়েছে-
   ক. দেশি শব্দের গুরুত্ব　　খ. সংস্কৃত শব্দের প্রতি অবজ্ঞা
   গ. উপযোগী শব্দ নির্বাচনের গুরুত্ব　　ঘ. সহজ শব্দ নির্বাচনের গুরুত্ব

৪. 'যে কথাটিতে মনের ভাব ঠিক ব্যক্ত হয়, তাঁহারা সেই কথাই ব্যবহার করেন।'– মনের ভাব ঠিক ব্যক্ত হওয়াকে রচনার কোন গুণ বলা যায়?
   i. শিল্পগুণ　　ii. অর্থ প্রকাশ গুণ
   iii. সহজবোধ্যতা গুণ

নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i　　খ. ii, iii
   গ. i ও ii　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

'প্রাঞ্জলতা রচনার বড় গুণ। তুমি যাহা লিখিবে লোকে পড়িবামাত্র যেন তাহা বুঝিতে পারে। যাহা লিখিলে, লোকে যদি তাহা না বুঝিতে পারিল, তবে লেখা বৃথা, কিন্তু অনেক লেখক এ কথা মনে রাখেন না। কতকগুলি নিয়ম আর কতকগুলি কৌশল মনে রাখিলে রচনা খুব প্রাঞ্জল করা যায়। যদি বলি, হুতভুক সাহায্যে বাষ্পীয় যন্ত্র সঞ্চালিত হয়, তবে অধিকাংশ বাঙালি আমার কথা বুঝিবে না। যদি বলি যে, অগ্নির সাহায্যে বাষ্পীয় যন্ত্র চলে, সকলেই বুঝিবে'।

   ক. প্রাঞ্জলতা কী?
   খ. উদ্ধৃতির আলোকে কোনো রচনা প্রাঞ্জল হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।
   গ. 'হুতভুক সাহায্যে বাষ্পীয় যন্ত্র সঞ্চালিত হয়' এবং 'অগ্নির সাহায্যে বাষ্পীয় যন্ত্র চলে'-এই বাক্য দুটির ভাষা বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য নিরূপণ কর।
   ঘ. উদ্ধৃতাংশের আলোকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনন্য গদ্যশৈলী বিশ্লেষণ কর।

অপূর্ব ক্ষমা

মীর মশাররফ হোসেন

*[**লেখক পরিচিতি** : মীর মশাররফ হোসেন ১৩ই নভেম্বর ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে কুষ্টিয়া জেলার লাহিনীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর লেখাপড়ার জীবন কাটে প্রথমে কুষ্টিয়া, পরে ফরিদপুরের পদমদী ও শেষে কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় হয় ফরিদপুর নবাব এস্টেটে চাকরি করে। তিনি কিছুকাল কলকাতায় বসবাস করেন। মীর মশাররফ হোসেন তাঁর বহুমুখী প্রতিভার মাধ্যমে উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, কাব্য ও প্রবন্ধ রচনা করে আধুনিক যুগে মুসলিম রচিত বাংলা সাহিত্যে সমৃদ্ধ ধারার প্রবর্তন করেন। সাহিত্যরসসমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। কারবালার বিষাদময় ঘটনা নিয়ে লেখা সুবৃহৎ উপন্যাস 'বিষাদসিন্ধু' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা । এ ছাড়া **উপন্যাস** : রত্নবতী, উদাসীন পথিকের মনের কথা, গাজী মিয়ার বস্তানী, ইসলামের জয়; **নাটক ও প্রহসন** : বসন্তকুমারী নাটক, জমিদার দর্পণ, এর উপায় কি; কাব্য : গোরাই ব্রীজ বা গৌরী সেতু, প্রেম পারিজাত, মদিনার গৌরব; প্রবন্ধ : গোজীবন, আমার জীবনী, বিবি কুলসুম বা আমার জীবনীর জীবনী প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাঁর সৃষ্টিকর্ম বাংলার মুসলমান সমাজে আধুনিক সাহিত্য ধারার সূচনা করে। মীর মশাররফ হোসেন ১৯১২ সালে পরলোকগমন করেন।]*

অনুজের হস্ত ধরিয়া হাসান নিজ শয্যার উপরে বসাইয়া মুখে বারবার চুম্বন দিয়া বলিতে লাগিলেন, ভাই, আমি যে কষ্ট পাইতেছি তাহা মুখে বলিবার শক্তি নাই। পূর্ব আঘাত, পূর্ব পীড়া এই উপস্থিত যন্ত্রণায় সকলি ভুলিয়া গিয়াছি। দেখত, আমার মুখের বর্ণ কি পরিবর্তিত হইয়াছে?

ভ্রাতার মুখপানে দৃষ্টিপাত করিয়া হোসেন কাঁদিতে লাগিলেন। আর আর সকলে বলিতে লাগিল, আহা ! জ্যোতির্ময় চন্দ্রবদনে বিষাদনীলিমার রেখা পড়িয়াছে।

এই কথা শুনিয়া হাসান অনুজকে বলিলেন, ভাই, বৃথা কাঁদিয়া লাভ কী? আমার আর বেশি বিলম্ব নাই; চিরবিদায়ের সময় অতি নিকট। মাতামহ যাহা বলিয়াছিলেন, সকলি প্রত্যক্ষ করিতেছি। ভাই, মাতামহ সশরীরে ঈশ্বরের আদেশে একবার ঈশ্বরের স্থানে নীত হইয়াছিলেন। সেখানে কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে অতি রমণীয় দুইটি ঘর সুসজ্জিত দেখিলেন। একটি সবুজ বর্ণ, আর একটি লোহিত বর্ণ। কাহার ঘর, প্রহরীকে এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে প্রহরী উত্তর করিল, আপনার অন্তরের নিধি হৃদয়ের ধন এবং নয়নের পুত্তলি হাসান-হোসেনের জন্য দুইটি ঘর প্রস্তুত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে প্রহরী কাঁপিয়া নতশির হইল, কোনো উত্তর করিল না। জিব্রাইল সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। তিনিই মাতামহকে বলিলেন, হায় মুহম্মদ! দ্বারবান কারণ প্রকাশে লজ্জিত হইতেছে, আমি প্রকাশ করিব। আজ আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাই বলিতে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছি। নিদারুণ গুপ্ত কথা হইলেও আজ আমি আপনার নিকটে ব্যক্ত করিব। ঐ দুইটি ঘর ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের হইবার কারণ কী উহার সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিতেছি শ্রবণ করুন। সবুজ বর্ণ গৃহ আপনার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র হাসানের জন্য; লোহিতবর্ণ কনিষ্ঠ হোসেনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। আপনার অভাবে একদল পিশাচ শত্রুতা করিয়া হাসানকে বিষ পান করাইবে এবং মৃত্যুসময়ে হাসানের মুখ সবুজ বর্ণ হইবে। তন্নিমিত্ত ঐ গৃহটি সবুজ বর্ণ। ঐ শত্রুগণ অস্ত্রদ্বারা আপনার কনিষ্ঠ দৌহিত্র হোসেনের মস্তকছেদন করিবে। ঐ রক্তমাখা মুখের চিহ্নই লোহিতবর্ণের কারণ। মাতামহের বাক্য আজ সফল হইল। আমার মুখের বর্ণ যখন বিবর্ণ হইয়াছে, তখন পরমায়ুও আজ শেষ হইয়াছে। মাতামহের বাক্য অলঙ্ঘনীয় ভাই, ঈশ্বরের কার্যও অখণ্ডনীয়।

সবিষাদে এবং সরোষে হোসেন বলিতে লাগিলেন, আমি আপনার চির আজ্ঞাবহ দাস, বিশেষ স্নেহের পাত্র এবং চিরআশীর্বাদের আকাঙ্ক্ষী, মিনতি করিয়া বলিতেছি, বলুন তো, আপনাকে এ বিষ কে দিয়াছে?

ভাই! তুমি কী জন্য বিষদাতার নাম জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি কি তাহার প্রতিশোধ নিবে?

হোসেন শয্যা হইতে উঠিয়া অতিশয় রোষভাবে দুঃখিত স্বরে বলিতে লাগিলেন, আমার প্রাণের পূজনীয় ভ্রাতাকে- এক মাতার উদরে যে ভ্রাতা অগ্রে জন্মিয়াছেন, সেই ভ্রাতাকে, আমি বাঁচিয়া থাকিতে যে নরাধম বিষ পান করাইয়াছে সে কি

অমনিই বাঁচিয়া যাইবে? আমি কি এমনই দুর্বল, আমি কি এমনই নিঃসাহসী, আমি কি এমনই ক্ষীণকায়, আমি কি এমনই কাপুরুষ, আমার হৃদয়ে কি রক্ত নাই, ভ্রাতৃস্নেহ নাই যে, ভ্রাতার প্রাণনাশক বিষপ্রদায়কের প্রতিশোধ লইতে পারিব না? যে আজ আমার একটি বাহু ভগ্ন করিল, অমূল্যধন সহোদর রত্ন হইতে যে আজ আমাকে বঞ্চিত করিল, আমি কি তাহার কিছুই করিব না? যদি সে নরাধমের কোনো সন্ধান জানিয়া থাকেন, যদি তাহাকে চিনিয়া থাকেন, যদি অনুমানে কিছু অনুভব করিয়া থাকেন, এ আজ্ঞাবহ চিরকিঙ্করকে বলুন, আমি এখনই আপনার সম্মুখে তাহার প্রতিবিধান করিতেছি। সেই পাপাত্মা বিজনবনে, পর্বতগুহায়, অতল জলে, সপ্ততল মৃত্তিকা মধ্যে যেখানে হউক, হোসেনের হস্ত হইতে তাহার পরিত্রাণ নাই। হয় আমার প্রাণ তাহাকে দিব, নয় তাহার প্রাণ আমি লইব।

অনুজের হস্ত ধরিয়া নিকটে বসাইয়া হাসান বলিতে লাগিলেন, ভাই, স্থির হও। আমি আমার বিষদাতাকে চিনি। সে আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিল, আমি সমুদয়ই জানিতে পারিয়াছি। ঈশ্বরই তাহার বিচার করিবেন। আমার কেবল এইমাত্র আক্ষেপ যে, অকারণে আমাকে নির্যাতন করিল। আমার ন্যায় অনুগত স্নেহশীল বন্ধুকে বধ করিয়া সে যে কী সুখ মনে করিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যে কারণেই হউক, যে লাভেই হউক, যে আশায়ই হউক, নিরপরাধে যে আমাকে নির্যাতন করিয়া চিরবন্ধুর প্রাণবধ করিল, দয়াময় পরমেশ্বর তাহার আশা কখনই পূর্ণ করিবেন না। দুঃখের বিষয় এই যে, সে আমাকে চিনিতে পারিল না। যাহা হউক, ভাই, তাহার নাম আমি কখনই মুখে আনিব না। তাহার প্রতি আমার রাগ হিংসাদ্বেষ কিছুই নাই। ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার বিষদাতার মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব। যে পর্যন্ত ঈশ্বরের নিকট হইতে তাহাকে মুক্ত করাইতে না পারি, সে পর্যন্ত স্বর্গের সোপানে পা রাখিব না। ভাই! ক্রমেই আমার বাকশক্তি রোধ হইতেছে। কত কথা মনে ছিল কিছুই বলিতে পারিলাম না। চতুর্দিক যেন অন্ধকারময় দেখিতেছি।

আবুল কাসেমের হস্ত ধরিয়া হোসেনের হস্তে সমর্পণ করিয়া স্নেহার্দ্র চিত্তে হাসান কাতরস্বরে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, ভাই, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ মানিয়া আজ আমি তোমার হস্তে কাসেমকে দিলাম। কাসেমের বিবাহ দেখিতে বড় সাধ ছিল, পাত্রীও স্থির করিয়াছিলাম, সময় পাইলাম না। হোসেনের হস্ত ধরিয়া আবার কহিলেন, ভাই ঈশ্বরের দোহাই, আমার অনুরোধ, তোমার কন্যা সখিনার সহিত কাসেমের বিবাহ দিও। আর ভাই আমার বিষদাতার যদি সন্ধান পাও কিংবা কোনো সূত্রে যদি ধরা পড়ে, তবে তাহাকে কিছু বলিও না। ঈশ্বরের দোহাই, তাহাকে ক্ষমা করিও। যন্ত্রণাকুল ইমাম ব্যাকুলভাবে অনুজকে এই পর্যন্ত বলিয়া সস্নেহ বচনে কাসেমকে বলিলেন, কাসেম, বৎস আর্শীবাদ করি তুমি চিরজীবী হও। আর বাপ! এই কবচটি সর্বদা হস্তে বাঁধিয়া রাখিও! যদি কখনও বিপদগ্রস্ত হও সে বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় যদি নিজ বুদ্ধিতে কিছুতেই স্থির করিতে না পার তবে এই কবচের অপর পৃষ্ঠে লক্ষ করিও; যাহা লেখা দেখিবে সেইরূপে কার্য করিবে। সাবধান তাহার অন্যথা করিও না।

কিয়ৎক্ষণ পর নিস্তব্ধ থাকিয়া উপর্যুপরি তিন চারিটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া হোসেনকে সম্বোধনপূর্বক মুমূর্ষু হাসান পুনরায় কহিলেন, ভাই, ক্ষণকালের জন্য তোমরা সকলে একবার বাহিরে যাও। কেবল জাএদা একাকিনী এখানে উপস্থিত থাকুন। জাএদার সহিত নির্জনে আমার একটি বিশেষ কথা আছে।

সকলেই আজ্ঞা পালন করিলেন। শয্যার নিকটে জাএদাকে ডাকিয়া হাসান চুপি চুপি বলিতে লাগিলেন, জাএদা, তোমার চক্ষু হইতে হাসান এখন বিদায় হইতেছে, আর্শীবাদ করি, সুখে থাক। তুমি যে কার্য করিলে সমস্তই আমি জানিতে পারিয়াছি। তোমাকে বড়ই বিশ্বাস করিতাম। বড়ই ভালোবাসিতাম, তাহার উপযুক্ত কার্যই তুমি করিয়াছ। ভালো, সুখে থাক, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। হোসেনকেও ক্ষমা করিতে বলিয়াছি; তাহাও তুমি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছ। ভিতরের নিগূঢ় কথা যদি আমি হোসেনকে বলিতাম, তাহা হইলে যে কী অনর্থ সংঘটিত হইত, তাহা তুমি বুঝিতেই পারিতেছ। যাহা হউক আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। কিন্তু যিনি সর্বসাক্ষী, সর্বময়, সর্বক্ষমার অধিকারী, তিনি তোমাকে ক্ষমা করিবেন কিনা বলিতে পারি না; তথাপি তোমার মুক্তির জন্য সর্বপ্রযত্নে সেই মুক্তিদাতার নিকট পুনঃপুন প্রার্থনা করিব। যে পর্যন্ত তোমাকে মুক্ত করাইতে না পারিব সেই পর্যন্ত আমি স্বর্গের সোপানে পা রাখিব না।

জাএদা অধোমুখে অশ্রু বিসর্জন করিলেন, একটিও কথা কহিলেন না। সময়োচিত সংকেতধ্বনি শ্রবণে হোসেনের সহিত আর আর সকলেই গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। হাসান একে একে সকলের নিকট বিদায় লইলেন। হাসনেবানু ও

জয়নাবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজকৃত অপরাধের মার্জনা চাহিলেন। শেষে হোসেনকে কহিলেন, হোসেন, এসো ভাই, জন্মের মতোন তোমার সহিত আলিঙ্গান করি। এই বলিয়া অনুজের গলা ধরিয়া সাশ্রুনয়নে আবার বলিতে লাগিলেন, ভাই সময় হইয়াছে, ঐ মাতামহ স্বর্গের দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছেন। চলিলাম। এই শেষ কথা বলিয়াই ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে দয়াময় ইমাম হাসান সর্বসমক্ষে প্রাণত্যাগ করিলেন। হাসনেবানু, জয়নাব, কাসেম ও আর সকলে হাসানের পদলুণ্ঠিত হইয়া মাথা ভাঙিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, জাএদা কাঁদিয়াছিলেন কিনা, তাহা কেহ লক্ষ করেন নাই।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'অপূর্ব ক্ষমা' গল্পাংশটি মীর মশাররফ হোসেন রচিত 'বিষাদসিন্ধু' গ্রন্থের মহরম পর্বের ষোড়শ প্রবাহ থেকে সংকলন করা হয়েছে।

মূলবক্তব্য

হযরত মুহম্মদ (স) -এর অন্যতম দৌহিত্র্য ইমাম হাসান ষড়যন্ত্রে পড়ে বিষ প্রয়োগে নিহত হওয়ার সময় বিষ দানকারিণী জাএদাকে ক্ষমা করে অপূর্ব মহত্ত্বের যে পরিচয় দিলেন তা এখানে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম হাসান মৃত্যু শয্যায় নিজের মৃত্যুর কারণ অবহিত হয়েও যে সংযম ও উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার তুলনা নেই। জাএদা শত্রু কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে স্বামীকে বিষ প্রয়োগ করে অমার্জনীয় অপরাধ করেন। ইমাম হাসান (রা:) তা জানতে পারেন । তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ না করে জাএদাকে ক্ষমা করেন এবং অন্যদের কাছে নাম প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন। এমন কি ছোট ভাই ইমাম হোসেনকে (রা:) অনুরোধ করেন, বিষ প্রয়োগকারীকে শনাক্ত করতে পারলেও যাতে ক্ষমা করেন। জীবনের শেষ মুহূর্তে ক্ষমার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ইমাম হাসান মারা যান। মদিনার খেলাফত নিয়ে হযরত আলী (রা:) ও মুয়াবিয়ার মধ্যে যে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিণতি হিসেবে পরবর্তীকালে ইমাম হাসান বিষ প্রয়োগে মারা যান এবং ইমাম হোসেন কারবালা প্রান্তরে নির্মমভাবে এজিদ সৈন্যদের দ্বারা নিহত হন।

শব্দার্থ ও টীকা

অনুজ- ছোট ভাই। **উপস্থিত যন্ত্রণা**- বিষ প্রয়োগের ফলে ইমাম হাসান অন্তিম শয্যায় শায়িত, মৃত্যু যন্ত্রণা তাঁকে প্রবলভাবে কাতর করে তুলেছে। এ যন্ত্রণার সঙ্গে আর কিছুই তুলনীয় নয়। **পিশাচ**- অতিপাপিষ্ঠ ও নিষ্ঠুর। **লোহিত বর্ণ**- লাল রঙের। **জিব্রাইল**-আল্লাহর বাণীবাহক ফেরেস্তা, যাঁর মাধ্যমে হযরত মুহম্মদ (স) - এর কাছে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়। **দৌহিত্র**- নাতি, পুত্র কন্যার পুত্র। **অলঙ্ঘনীয়**- অবশ্য প্রতিপালনীয়। **অখণ্ডনীয়**- অবিভাজ্য। **আজ্ঞাবহ**- আদেশ পালনকারী। **চিরকিঙ্কর**- চিরদাস। **নিগূঢ়**- রহস্যময়, গুপ্ত। **সোপানে**- সিঁড়িতে। **বাকশক্তি**- কথা বলার ক্ষমতা।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'যে পর্যন্ত তোমাকে মুক্ত করাইতে না পারিব সেই পর্যন্ত আমি স্বর্গের সোপানে পা রাখিব না।' -উক্তিটিতে ইমাম হাসান (রা.) এর চরিত্রের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে?

i. ক্ষমাশীলতা ii. সহায়তা
iii. মহানুভবতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

২. 'আমি বিষদাতাকে চিনি'-এ উক্তিটি কার?
   ক. ইমাম হাসান (রা.)   খ. ইমাম হোসেন (রা.)
   গ. জিব্রাইল   ঘ. জয়নব

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ইমাম হাসান (রা.) হযরত মুহম্মদ (সা.) এর যথাযোগ্য উত্তরসূরি। স্থির ধর্মচেতনা, নিবিড় বিশ্বাসবোধ, সর্বোপরি স্নিগ্ধ সুমহান ক্ষমাশীলতা ও অতুলনীয় মহানুভবতা তাঁর চরিত্রকে সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ মানবরূপে উপস্থাপিত করেছে।

৩. ইমাম হাসান (রা.)-এর সঙ্গে হযরত মুহম্মদ (স) এর সম্পর্ক–
   ক. নাতি ও নানা   খ. নাতি ও দাদা
   গ. ভাতিজা ও চাচা   ঘ. ভাগিনা ও মামা

৪. ইমাম হাসান (রা.) এর চরিত্রের শ্রেষ্ঠ গুণ-
   i. ধর্মচেতনা ও বিশ্বাসবোধ   ii. বিশ্বাসবোধ ও ক্ষমাশীলতা
   iii. ক্ষমাশীলতা ও মহানুভবতা

নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i   খ. ii
   গ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শয্যার নিকটে জাএদাকে ডাকিয়া হাসান চুপি চুপি বলিতে লাগিলেন, জাএদা, তোমার চক্ষু হইতে হাসান এখন বিদায় হইতেছে, আশীর্বাদ করি, সুখে থাক। তুমি যে কার্য করিলে সমস্তই আমি জানিতে পারিয়াছি। তোমাকে বড়ই বিশ্বাস করিতাম। বড়ই ভালোবাসিতাম, তাহার উপযুক্ত কার্যই তুমি করিয়াছ।

৫. অনুচ্ছেদটিতে 'উপযুক্ত' শব্দ টি ব্যবহার করা হয়েছে
   ক. উত্তম কাজ অর্থে   খ. তিরস্কার অর্থে
   গ. প্রশংসা অর্থে   ঘ. যথার্থ অর্থে

৬. জাএদার কোন কাজটি হাসান জানতে পেরেছে?
   ক. হাসানকে বিষ প্রয়োগ   খ. হোসেনকে বিষ প্রয়োগ
   গ. ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র   ঘ. হোসেনকে হত্যার ষড়যন্ত্র

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

হযরত ইমাম হাসান (রা.) ইসলামের পথপ্রদর্শক ও মানবতার মুক্তিদাতা হযরত মুহম্মদ (সা.) - এর দৌহিত্র এবং হযরত ইমাম হোসেন (রা.) এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। কুটিল ও ঘৃণিত ষড়যন্ত্রের আশ্রয়ে তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। ইমাম হাসান (রা.) জানতেন তাঁকে বিষ প্রয়োগকারী ব্যক্তিটি তাঁর স্ত্রী জাএদা। কিন্তু এই জিঘাংসা ও স্বার্থপরতার কথা জানতে পেরেও তিনি নির্বিচারে স্ত্রীকে ক্ষমা করে দেন এবং স্ত্রীকে ছাড়া স্বর্গে পদার্পণ করবেন না বলে শপথ করেন। ক্ষমা ও মহানুভবতার এমন মহান দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল।

   ক. হযরত মুহম্মদ (সা.) এর সঙ্গে হযরত ইমাম হাসান (রা.) এর সম্পর্ক কী?
   খ. 'স্ত্রীকে ছাড়া স্বর্গে পদার্পণ করবেন না'- এ শপথের মধ্য দিয়ে ইমাম হাসানের চরিত্রের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তার পরিচয় দাও।
   গ. মনে কর, একজন সাধারণ মানুষ জানল যে, তাকে বিষ প্রয়োগকারী ব্যক্তিটি তার আপনজন—এ ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে ইমাম হাসানের প্রতিক্রিয়ার তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন কর।
   ঘ. অনুচ্ছেদটির আলোকে ইমাম হাসান চরিত্রের মৌলিক দিকগুলো বিশ্লেষণ কর।

জড়জগৎ ও উদ্ভিদজগৎ

জগদীশচন্দ্র বসু

[লেখক পরিচিতি : জগদীশচন্দ্র বসু ৩০শে নভেম্বর ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে মুন্সীগঞ্জ জেলার রাঢ়িখাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাস করে বিলাত গমন করেন। ১৮৮৪ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে অনার্সসহ বি.এ. এবং একই বছরে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এসসি. ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর তিনি দেশে ফিরে এসে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে কর্মজীবন শুরু করেন। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর প্রধান আবিষ্কার বৃক্ষলতাদির প্রাণস্পন্দন। তিনি বেতারের মূলসূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর নিয়ে তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত 'বসু বিজ্ঞান মন্দিরে' বিজ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চায় তিনি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ 'অব্যক্ত' বাংলা ভাষার বিশিষ্ট সম্পদ। ২৩শে নভেম্বর ১৯৩৭ সালে জগদীশচন্দ্র বসু পরলোকগমন করেন।]

সকলেই মনে করেন যে জড় উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে অভেদ্য প্রাচীর বর্তমান। তবে দৃষ্টজগৎ কি কোনো নিয়মে আবন্ধ নহে? এরূপও হইতে পারে যে, আপাতত বৈষম্যের কোনো মূলগত একত্বের বন্ধন আছে।

আজ প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এই সমস্যা আমার মন অধিকার করিয়াছিল। আমি তখন আকাশের বিদ্যুৎতরঙ্গ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছিলাম, এবং দূর হইতে প্রেরিত সংবাদ লিপিবন্ধ করিবার জন্য এক নতুন কল আবিষ্কার ও নির্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। দেখিতে পাইলাম, ধাতু নির্মিত কলের লিপি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে লাগিল, যেন কলটি ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। লিপির ধরন আমাদের কান্ত লিপিরই অনুরূপ। মানুষের যেমন বিশ্রামের পর ক্লান্তি দূর হয়, কলটিরও সেইরূপ বিশ্রামের পর ক্লান্তি দূর হইল। আবার কতকগুলি ঔষধে যেমন আমাদিগকে উত্তেজিত করে, জড়নির্মিত কলেও তাহার অনুরূপ প্রক্রিয়া দেখিতে পাইলাম। উহার ফলে বহুদূর হইতে অতিক্ষীণ সংবাদ লিপিবন্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। অপিচ কতকগুলি দ্রব্য কলের উপর বিষবৎ কার্য করিয়াছিল, যাহার জন্য কলের সাড়া দিবার শক্তি একেবারেই বিলুপ্ত হইল। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, অনেক সময় যেমন অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় বিষপ্রয়োগ করিলে জীবদেহে উত্তেজকের ক্রিয়া করে, ধাতুনির্মিত যন্ত্রেও সেইরূপ ফল দৃষ্ট হইল। যে সাড়া দিবার শক্তি জীবনের এক প্রধান চিহ্ন বলিয়া গণ্য হইত, জড়েও তাহার আভাস দেখিতে পাইলাম। ইহা হইতে বুঝিতে পারিলাম যে, জড় ও জীবজগৎ একই নিয়মে পরিচালিত এবং উহারা একই সূত্রে গ্রথিত।

উদ্ভিদ জড় ও প্রাণীর মধ্যগত বলিয়া উহার মধ্যে প্রাণীর ন্যায় ক্রিয়া আরও সুস্পষ্ট দেখিতে পাইব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এরূপ বিবেচনা প্রচলিত মতের সম্পূর্ণ বিরুন্ধ প্রচলিত মতবাদীগণ মনে করেন, উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে কোনো সাদৃশ্য থাকিতে পারে না। তাহারা বলিয়া থাকেন যে, বাহিরের আঘাতে জীবপেশী যেরূপ সংকুচিত হয়, উদ্ভিদে সেরূপ হয় না। প্রাণীকে এক স্থলে আঘাত করিলে স্নায়ু দ্বারা উত্তেজনা দূরে প্রেরিত হয় এবং তথায় সংকোচনশীল পেশীকে চালিত করে। উদ্ভিদে উত্তেজনাবাহক এরূপ কোনো পথ নাই। প্রাণীগণ বিবিধ ঔষধ প্রয়োগে উত্তেজিত কিংবা অবসন্ন হয়, উদ্ভিদে সেরূপ কিছু হয় না। প্রাণিজগতে স্পন্দনশীল পেশী দেখা যায়, যাহা পুনঃপুন সংকুচিত ও প্রসারিত হয়, তাহা উদ্ভিদে দৃষ্ট হয় না।

স্বতঃস্পন্দনশীল পেশী বিবিধ ঔষধ প্রয়োগে উত্তেজিত, প্রশমিত অথবা আড়ষ্ট হয়। উদ্ভিদে তদনুরূপ প্রক্রিয়া কখনও সম্ভব হইতে পারে না, এবং অন্যান্য কল্পিত কারণে বিরুন্ধবাদীগণ মনে করিতেন যে, বৃক্ষজীবন ও প্রাণিজীবন সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।

এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার প্রকৃত কারণ এই যে, এতদিন বৃক্ষের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন অদৃষ্ট ও অজ্ঞাত ছিল। যদি কোনো অবস্থাগুণে বৃক্ষ উত্তেজিত হয় বা অন্য কোনো কারণে বৃক্ষের অবসাদ উপস্থিত হয়, তাহা জানিবার কোনো উপায় ছিল না। তবে কী করিয়া যাহা অজ্ঞাতে ছিল তাহা জ্ঞানগোচর করা যাইতে পারে? ইহার জন্য জীবন্তভাবের একটি মাপকাঠি প্রস্তুত করা আবশ্যক।

বৃক্ষে যে একস্থানে আঘাতজনিত উত্তেজনার আবেগ দূরে প্রেরিত হয় তাহা সমতাল যন্ত্র দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। এই কলের আশ্চর্য ক্ষমতা সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহার সাহায্যে সময় গণনা এত সূক্ষ্ম হইয়াছে যে এক সেকেন্ডের সহস্র ভাগের এক ভাগ অনায়াসে নির্ণীত হইয়াছে। ইহার কার্যপ্রণালী সম্পূর্ণ নতুন এবং ইহা দ্বারা বৃক্ষের কোনো স্থানের আঘাতসংবাদ দূরে পৌঁছিতে কত সময় লাগে তাহা যন্ত্র কর্তৃক লিখিত হয়। প্রাণীর স্নায়ুবীয় প্রবাহের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে। সমতাল যন্ত্র দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, যেসব কারণে প্রাণীর উত্তেজনা প্রবাহের বেগ বর্ধিত কিংবা মন্দীভূত হয়, সেই একই কারণে উদ্ভিদের উত্তেজিত প্রবাহের বেগ বর্ধিত অথবা প্রশমিত হয়। এ সম্বন্ধে প্রাণীর এবং উদ্ভিদের প্রক্রিয়া মূলত একই রূপ।

প্রাণীগণের এরূপ পেশী আছে যাহা আপনা আপনি স্পন্দিত হয়। ইহা হৃদপিণ্ডের পেশীতে বিশেষরূপে দৃষ্ট হয়। নানাবিধ ভৈষজ্য দ্বারা হৃদপিণ্ডের স্বাভাবিক তাল বিভিন্নরূপে পরিবর্তিত হয়। ইহার প্রয়োগে ক্ষণকালের জন্য হৃদপিণ্ডের স্পন্দন স্থগিত হয়, হাওয়া করিলে সেই অচৈতন্য অবস্থা চলিয়া যায়। ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে মাত্রাধিক্য হইলেই হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। বিবিধ বিষ প্রয়োগে হৃদয়ের স্পন্দন বন্ধ হয়, কোনো বিষ প্রয়োগে হৃদয় স্পন্দন সংকুচিত অবস্থায়, অন্য বিষে প্রসারিত অবস্থায় নিষ্পন্দিত হয়। এইরূপ পরস্পর বিরোধী এক বিষ দ্বারা অন্য বিষ ক্ষয় হইতে পারে। উদ্ভিদেরও যে স্পন্দনশীলতা আছে তাহা বনচাঁড়ালের ক্ষুদ্র পাতা দ্বারা প্রমাণসিদ্ধ হইয়াছে। বনচাঁড়ালের স্পন্দনের বিশেষত্ব একেবারে অজ্ঞাত ছিল, কারণ উহার স্পন্দনরেখা লিপিবন্ধ করিবার কোনো উপায় ছিল না। বিশেষ কল নির্মাণ দ্বারা এই বাধা দূরীকৃত হইয়াছে। অতি আশ্চর্য এই যে, উদ্ভিদের স্পন্দনরেখা প্রাণীর হৃদপিণ্ডের স্পন্দনরেখার সম্পূর্ণ অনুরূপ। আভ্যন্তরিক রক্তের চাপ অধিক হ্রাস করিলে যেরূপ হৃদস্পন্দন বন্ধ হয় এবং রক্তের চাপ বাড়াইলে স্পন্দন পুনরায় আরম্ভ হয়, উদ্ভিদেও আভ্যন্তরিক রসের চাপ কমাইলে স্বতঃস্পন্দন বন্ধ এবং চাপ বাড়াইলে পুনরায় আরম্ভ হয়। ইহার প্রয়োগে উদ্ভিদস্পন্দন সাময়িক আড়ষ্ট হয়, বাতাস করিলেই অচৈতন্য ভাব দূর হয়। ক্লোরোফর্ম অধিকমাত্রায় ব্যবহার করিলে স্পন্দন একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য এই যে, যে বিষ দ্বারা যেভাবে স্পন্দনশীল হৃদপিণ্ড নিষ্পন্দিত হয় সেই বিষে সেইভাবে উদ্ভিদের স্পন্দনও নিরস্ত হয়। উদ্ভিদেও এক বিষ দিয়া অন্য বিষ ক্ষয় করিতে পারিয়াছে। স্বতঃস্পন্দনের প্রকৃত রহস্য কী তাহা উদ্ভিদের উপর পরীক্ষার দ্বারা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি।

এইরূপে নিরন্তর স্পন্দন করিবার জন্য বাহিরের শক্তি সঞ্চয় আবশ্যক । সেই শক্তি সংগ্রহের জন্য আলোর সাহায্যে উদ্ভিদ বায়ু অথবা জল হইতে অঙ্গারাম্ল বিশ্লেষণ করিয়া স্বীয় শরীর গঠন করে। বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে এই প্রক্রিয়ায় ভেদাভেদ লিপিবন্ধ হয়। কখনও উদ্ভিদ এই যন্ত্রে ঘণ্টা বাজাইয়া তাহার আহারের তৎপরতা বাহিরে প্রকাশ করে।

পূর্বে বলিয়াছি যে, এইসব কলের কার্যকারিতা অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এইজন্য আমার বিরুদ্ধবাদীরা রয়াল সোসাইটিতে এইসব কল লইয়া বিশেষ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পরীক্ষার ফলে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন, এইসব কল এবং নতুন প্রণালী দ্বারা জীবজগতের অনেক দুরূহ সমস্যার উত্তর পাওয়া যাইবে। যাঁহারা আমার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন তাঁহারাই তখন আমাকে রয়াল সোসাইটির সভ্যপদে নিয়োজিত করিলেন। ভারত যে বিজ্ঞান পরীক্ষার দ্বারা পৃথিবীর জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়তা করিবে এই প্রথম তাহা স্বীকৃত হইল। যেসব পরীক্ষার অল্পবিস্তর আভাস দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে ইহা স্বীকৃত হইবে যে, প্রাণীর ও উদ্ভিদের মূলগত প্রক্রিয়া একইরূপে সাধিত হয়। এই প্রমাণের বিশেষ ফল এই যে, উদ্ভিদের অপেক্ষাকৃত সরল জীবন হইতে অধিকতর জটিল প্রাণীজগতের রহস্যোদ্ঘাটন সম্ভবপর হইবে।

বৃক্ষ জীবনের ইতিহাস হইতে আমাদের শিক্ষণীয় অনেক বিষয় আছে, যেমন, জীবন সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা।

বহুবিধ দুরবস্থার মধ্যে পড়িয়াও বৃক্ষ তাহার জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। তবে কোন শক্তিবলে মৃত্যুর বিরুদ্ধে বুঝিতে পারিয়াছে? তাহার একটি কারণ এই যে, বৃক্ষের মূল একটি নির্দিষ্ট ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, যে স্থানের রস দ্বারা তাহার জীবন সংগঠিত হইতেছে, সেই ভূমিই তাহার স্বদেশ ও তাহার পরিপোষক। বৃক্ষের ভিতর আরও একটি শক্তি নিহিত আছে যাহা দ্বারা যুগে যুগে সে আপনাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়াছে। বাহিরের কত পরিবর্তন ঘটিতেছে কিন্তু অদৃষ্ট বৈগুণ্যে সে পরাহত হয় নাই। বাহিরের আঘাতের উত্তরে পুনর্জীবন দ্বারা সে বাহিরের পরিবর্তনের সহিত সংগ্রাম করিয়াছে। যে পরিবর্তন আবশ্যক তাহা গ্রহণ করিয়াছে, যাহা অনাবশ্যক জীর্ণপত্রের ন্যায় সে তাহা ত্যাগ করিয়াছে। এইরূপে বাহিরের বিভীষিকা সে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ইহার সঙ্গে আরও একটি শক্তি তাহার সম্বল। সে যদি বটবৃক্ষের বীজ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে তবে সেই স্মৃতির ছাপ তাহার প্রতি অঙ্গে ধারণ করিয়াছে। এই জন্য তাহার মূল ভূমিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত।

তাহার শির ঊর্ধ্বে আলোকের সন্ধানে উন্নত এবং শাখা প্রশাখা ছায়াদানে চতুর্দিকে প্রসারিত। তবে কী কী শক্তিবলে সে বাহিরের আঘাত পাইয়াও বাঁচিয়া থাকে? তাহা এই, যে ধৈর্যে, যে দৃঢ়তায় সে তাহার স্বস্থানকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, সে অনুভূতিতে ভিতর ও বাহিরের সামঞ্জস্য করিয়া লয়, এবং সে স্মৃতিতে বহু জীবনের শক্তি নিজস্ব করিয়া রাখে, আর যে হতভাগ্য আপনাকে স্বদেশ হইতে বিচ্যুত করে, যে জীবন সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিয়া পরমুখাপেক্ষী ও পর অন্নে প্রতিপালিত হয়, সে জাতীয় স্মৃতি ভুলিয়া যায়, সে হতভাগ্য কী শক্তি লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে? বিনাশ তাহার সম্মুখে, ধ্বংসই তাহার পরিণাম।

অদৃশ্য আলোকের পরীক্ষার দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, অসংখ্যবিধ জ্যোতির মধ্যে এক ক্ষুদ্র গণ্ডিটিই আমাদের দৃশ্যরাজ্য। আমাদের ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে সীমাবদ্ধ এবং এই অপূর্ণতার জন্য অসীম জ্যোতিরাশির মধ্যে আমরা অন্ধবৎ ঘুরিতেছি। তাহা সত্ত্বেও মানুষের মন নিরাশ হয় নাই। বরং অদম্য উৎসাহে সে নিজের অপূর্ণতার ভেলায় অজানা সমুদ্র পার হইয়া নতুন রাজ্যের সন্ধানে ছুটিয়াছে।

অনন্তের পথযাত্রী, কী সম্বল তোমার? সম্বল কিছুই নেই, কেবল আছে অন্ধবিশ্বাস, যে বিশ্বাসবলে প্রবাল দেহাস্থি দিয়া মহাদ্বীপ রচনা করিতেছে। জ্ঞানসাম্রাজ্যও সাধকদিগের অস্থিপাতে তিল তিল করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। আঁধার লইয়াই আরম্ভ এবং আঁধারেই শেষ, মাঝে দুই একটি ক্ষীণ আলোকরেখা দেখা যাইতেছে। মানুষের অধ্যবসায়ের ফলে ঘন কুয়াশা অপসারিত হইলে বিশ্বজগৎ জ্যোতির্ময় হইবে।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'জড়জগৎ ও উদ্ভিদজগৎ' প্রবন্ধটি লেখকের 'অব্যক্ত' প্রবন্ধগ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে।

মূলবক্তব্য

প্রাণীর যেমন প্রাণ আছে উদ্ভিদেরও তেমনি প্রাণ আছে। আপাতদৃষ্টিতে উদ্ভিদের প্রাণের যথার্থ পরিচয় পাওয়া না গেলেও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষায় প্রাণের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা গেছে এবং প্রাণীর মতোই উদ্ভিদ অনুভূতি প্রকাশ করে। জড় ও জীব একই নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে। প্রাণীর মতোই উদ্ভিদ উত্তেজনা প্রকাশ করে, আবার অবসাদগ্রস্ত হয়। উদ্ভিদের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে বলে প্রমাণিত হয়েছে। উদ্ভিদের হৃদস্পন্দনের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। উদ্ভিদ নিজের চেষ্টায় তার খাদ্য সংগ্রহ করে এবং নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। প্রাণিজগতের সঙ্গে উদ্ভিদজগতের যে পার্থক্য নেই, তাই লেখক দেখিয়েছেন।

শব্দার্থ ও টীকা

জড়জগৎ- জড়পদার্থের জগৎ। **দৃষ্ট**- যা দেখা যায়। **লিপিবদ্ধ**- লেখা। **অপিচ**- আরও, পক্ষান্তরে। **সাদৃশ্য**- মিল। **অবসন্ন**- শ্রান্ত, দুর্বল। **স্বতঃস্পন্দনশীল**- যা আপনা-আপনি সাড়া দেয়। **অবসাদ**- দুর্বলতা। **জ্ঞানগোচর**- জানা। **মন্দীভূত**- হ্রাসপ্রাপ্ত, কমে আসা। **প্রশমিত**- নিবারিত। **ভৈষজ্য**- ঔষধ। **ক্লোরোফর্ম**- অজ্ঞান করার ঔষধ। **অঙ্গারাম্ল**- কার্বলিক এসিড। **অদৃষ্ট বৈগুণ্যে**- ভাগ্যবশত। **পরাহত**- পরাজিত। **ইন্দ্রিয়**- যে সকল যন্ত্র বা শক্তি দ্বারা পদার্থ বা বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। **অন্ধবৎ**- অন্ধের মতো। **প্রবাল**- সামুদ্রিক কীট বিশেষ। **দেহাস্থি**- দেহের হাড়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন–

১। জগদীশচন্দ্র বসু জন্মগ্রহণ করেন –

ক. চব্বিশ পরগনায় খ. মুন্সীগঞ্জ জেলায়
গ. কলকাতা শহরে ঘ. ঢাকা শহরে

২. 'বৃক্ষ জীবন ও প্রাণিজীবন সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন'-এই ধারণার প্রধান যুক্তি হল :

i. উদ্ভিদ ঔষধে উত্তেজিত বা অবসন্ন হয় না
ii. উদ্ভিদের স্পন্দনশীল কোনো পেশী নেই
iii. উদ্ভিদ-দেহে জীবন্ত কোষ নেই

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৩. কোন দিক থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণী একই প্রতিক্রিয়া দেখায়?

i. স্পন্দনের দিক থেকে
ii. আঘাতজনিত প্রতিক্রিয়ায়
iii. বর্জ্য নিষ্কাশনে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৪. বৃক্ষ টিকে আছে–

ক. প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে খ. অদৃশ্য এক সংগ্রামের মাধ্যমে
গ. প্রতিনিয়ত কৌশল পরিবর্তন করে ঘ. মানুষের সেবা-যত্ন ও পরিচর্যায়

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, এইসব কলের কার্যকারিতা অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এই জন্য আমার বিরুদ্ধবাদীরা রয়াল সোসাইটিতে এইসব কল লইয়া বিশেষ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পরীক্ষার ফলে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন, এইসব কল এবং নতুন প্রণালী দ্বারা জীবজগতের অনেক দুরূহ সমস্যার উত্তর পাওয়া যাইবে। যাঁহারা আমার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন তাঁহারাই তখন আমাকে রয়াল সোসাইটির সভ্যপদে নিয়োজিত করিলেন।

ক. রয়াল সোসাইটি কী?
খ. অনুচ্ছেদটিতে যে কলের কথা আছে তার কার্যকারিতা ব্যাখ্যা কর।
গ. 'এইসব কল এবং নতুন প্রণালী দ্বারা জীবজগতের অনেক দুরূহ সমস্যার উত্তর পাওয়া যাইবে।'-এ উক্তির তাৎপর্য লিখ।
ঘ. জগদীশচন্দ্র বসুকে কেন রয়াল সোসাইটির সভ্যপদে নিয়োজিত করা হয়? তোমার মতামত ব্যাখ্যা কর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[লেখক পরিচিতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮ সালে (৭ই মে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা তিনি লাভ করেননি, কিন্তু সাহিত্যের বিচিত্র ক্ষেত্রে তাঁর পদচারণা এক বিস্ময়ের বস্তু। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই অসামান্য প্রতিভাধর ব্যক্তি। বাল্যেই তাঁর কবিপ্রতিভার উন্মেষ ঘটে। মাত্র পনের বছর বয়সে তাঁর বনফুল কাব্য প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য এশীয়দের মধ্যে প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বস্তুত তাঁর একক সাধনায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সকল শাখায় দ্রুত উন্নতি লাভ করে এবং বিশ্বদরবারে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, সুরকার, নাট্য প্রযোজক ও অভিনেতা। কাব্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, গান ইত্যাদি সাহিত্যের সকল শাখাই তাঁর অবদানে সমৃদ্ধ। তাঁর অজস্র রচনার মধ্যে 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা', 'বলাকা', 'পুনশ্চ', 'চোখের বালি', 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা', 'বিসর্জন', 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী', 'গল্পগুচ্ছ', 'বিচিত্র প্রবন্ধ' ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮ সালে (৭ই আগস্ট ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ) কলকাতায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।]

বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট করিয়া একটা নতুন ভাবোদয় হইল। নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়াছিল; স্থির হইল, সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে।

যে ব্যক্তির কাঠ, আবশ্যককালে তাহার যে কতখানি বিস্ময় বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে, তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল।

কোমর বাঁধিয়া সকলেই যখন মনোযোগের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে ফটিকের কনিষ্ঠ মাখনলাল গম্ভীরভাবে সেই গুঁড়ির উপরে গিয়া বসিল; ছেলেরা তাহার এইরূপ উদার ঔদাসীন্য দেখিয়া কিছু বিমর্ষ হইয়া গেল।

একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে একটু-আধটু ঠেলিল, কিন্তু সে তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; এই অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী মানব সকল প্রকার ক্রীড়ার অসারতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।

ফটিক আসিয়া আস্ফালন করিয়া কহিল, 'দেখ, মার খাবি! এইবেলা ওঠ্!'

সে তাহাতে আরও একটু নড়িয়া চড়িয়া আসনটি বেশ স্থায়ীরূপে দখল করিয়া লইল।

এরূপ স্থলে সাধারণের নিকট রাজসম্মান রক্ষা করিতে হইলে অবাধ্য ভ্রাতার গণ্ডদেশে অনতিবিলম্বে এক চড় কষাইয়া দেওয়া ফটিকের কর্তব্য ছিল—সাহস হইল না। কিন্তু এমন একটা ভাব ধারণ করিল, যেন ইচ্ছা করিলেই এখনই উহাকে রীতিমতো শাসন করিয়া দিতে পারে, কিন্তু করিল না, কারণ পূর্বাপেক্ষা আর একটা ভালো খেলা মাথায় উদয় হইয়াছে, তাহাতে আর একটু বেশি মজা আছে। প্রস্তাব করিল, মাখনকে সুদ্ধ ঐ কাঠ গড়াইতে আরম্ভ করা যাক।

মাখন মনে করিল, ইহাতে তাহার গৌরব আছে; কিন্তু অন্যান্য পার্থিব গৌরবের ন্যায় ইহার আনুষঙ্গিক যে বিপদের সম্ভাবনাও আছে, তাহা তাহার কিংবা আর কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

ছেলেরা কোমর বাঁধিয়া ঠেলিতে আরম্ভ করিল- 'মারো ঠেলা হেঁইয়ো, সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো।' গুঁড়ি একপাক ঘুরিতে-না-ঘুরিতেই মাখন তাহার গাম্ভীর্য গৌরব এবং তত্ত্বজ্ঞান-সমেত ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

খেলার আরম্ভেই এইরূপ আশাতীত ফললাভ করিয়া অন্যান্য বালকেরা বিশেষ হৃষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু ফটিক কিছু শশব্যস্ত হইল। মাখন তৎক্ষণাৎ ভূমিশয্যা ছাড়িয়া ফটিকের উপরে গিয়া পড়িল, একেবারে অন্ধভাবে মারিতে লাগিল। তাহাদের নাকে মুখে আঁচড় কাটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে গমন করিল। খেলা ভাঙিয়া গেল।

ফটিক গোটাকতক কাশ উৎপাটন করিয়া লইয়া, একটা অর্ধনিমগ্ন নৌকার গলুইয়ের উপর চড়িয়া বসিয়া চুপচাপ করিয়া কাশের গোড়া চিবাইতে লাগিল।

এমন সময় একটা বিদেশি নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। একটি অর্ধবয়সী ভদ্রলোক কাঁচা গোঁফ এবং পাকা চুল লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'চক্রবর্তীদের বাড়ি কোথায়।'

বালক ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল, 'ওই হোথা।' কিন্তু কোন দিকে যে নির্দেশ করিল কাহারও বুঝিবার সাধ্য রহিল না।

ভদ্রলোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথা?'

সে বলিল, 'জানি নে।' বলিয়া পূর্ববৎ তৃণমূল হইতে রসগ্রহণে প্রবৃত্ত হইল। বাবুটি তখন অন্য লোকের সাহায্য অবলম্বন করিয়া চক্রবর্তীদের গৃহের সন্ধানে চলিলেন।

অবিলম্বে বাঘা বাগদি আসিয়া কহিল, 'ফটিকদাদা, মা ডাকছে।'

ফটিক কহিল, 'যাব না।'

বাঘা তাহাকে বলপূর্বক আড়কোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল, ফটিক নিষ্ফল আক্রোশে হাত পা ছুড়িতে লাগিল। ফটিককে দেখিবামাত্র তাহার মা অগ্নিমূর্তি হইয়া কহিলেন, 'আবার তুই মাখনকে মেরেছিস!'

ফটিক কহিল, 'না, মারিনি।'

'ফের মিথ্যে কথা বলছিস!'

'কখ্খনো মারিনি। মাখনকে জিজ্ঞাসা কর।'

মাখনকে প্রশ্ন করাতে মাখন আপনার পূর্ব নালিশের সমর্থন করিয়া বলিল, 'হাঁ, মেরেছে।'

তখন আর ফটিকের সহ্য হইল না। দ্রুত গিয়া মাখনকে এক সশব্দ চড় কষাইয়া দিয়া কহিল, 'ফের মিথ্যে কথা!'

মা মাখনের পক্ষ লইয়া ফটিককে সবেগে নাড়া দিয়া তাহার পৃষ্ঠে দুটা-তিনটা প্রবল চপেটাঘাত করিলেন। ফটিক মাকে ঠেলিয়া দিল।

মা চিৎকার করিয়া কহিলেন, 'অ্যাঁ, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস!'

এমন সময় সেই কাঁচাপাকা বাবুটি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, 'কী হচ্ছে তোমাদের।'

ফটিকের মা বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া কহিলেন, 'ওমা, এ যে দাদা, তুমি কবে এলে।' বলিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিলেন।

বহুদিন হইল দাদা পশ্চিমে কাজ করিতে গিয়াছিলেন, ইতোমধ্যে ফটিকের মার দুই সন্তান হইয়াছে, তাহারা অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু একবারও দাদার সাক্ষাৎ পায় নাই। আজ বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার ভগিনীকে দেখিতে আসিয়াছেন।

কিছুদিন খুব সমারোহে গেল। অবশেষে বিদায় লইবার দুই-একদিন পূর্বে বিশ্বম্ভরবাবু তাহার ভগিনীকে ছেলেদের পড়াশুনা এবং মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে ফটিকের অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খলতা, পাঠে অমনোযোগ এবং মাখনের সুশান্ত সুশীলতা ও বিদ্যানুরাগের বিবরণ শুনিলেন।

তাঁহার ভগিনী কহিলেন, 'ফটিক আমার হাড় জ্বালাতন করিয়াছে।'

শুনিয়া বিশ্বম্ভর প্রস্তাব করিলেন, তিনি ফটিককে কলিকাতায় লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন। বিধবা এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন।

ফটিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন রে ফটিক, মামার সঙ্গে কলকাতায় যাবি?'

ফটিক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, 'যাব।'

যদিও ফটিককে বিদায় করিতে তাহার মায়ের আপত্তি ছিল না, কারণ তাঁহার মনে সর্বদাই আশঙ্কা ছিল - কোন্‌দিন সে মাখনকে জলেই ফেলিয়া দেয়, কি মাথাই ফাটায়, কি কী একটা দুর্ঘটনা ঘটায়, তথাপি ফটিকের বিদায় গ্রহণের জন্য এতাদৃশ আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন।

'কবে যাবে', 'কখন যাবে', করিয়া ফটিক তাহার মামাকে অস্থির করিয়া তুলিল; উৎসাহে তাহার রাত্রে নিদ্রা হয় না।

অবশেষে যাত্রাকালে আনন্দের ঔদার্যবশত তাহার ছিপ ঘুড়ি লাটাই সমস্ত মাখনকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার পুরা অধিকার দিয়া গেল।

কলিকাতায় মামার বাড়ি পৌঁছিয়া প্রথমত মামির সঙ্গে আলাপ হইল। মামি এই অনাবশ্যক পরিবারবৃদ্ধিতে মনে মনে যে বিশেষ সন্তুষ্টি হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার নিজের তিনটি ছেলে লইয়া তিনি নিজের নিয়মে ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে সহসা একটি তের বৎসরের অপরিচিত অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে ছেলে ছাড়িয়া দিলে কিরূপ একটা বিপ্লবের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। বিশ্বম্ভরের এত বয়স হইল, তবু কিছুমাত্র যদি জ্ঞানকাণ্ড আছে।

বিশেষত, তের-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্‌ভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া ওঠে; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়; লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাফ করা যায়; কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না; এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোনো সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে, তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না, কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়।

অতএব, এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর কোনো অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারিদিকের স্নেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মতো বিঁধে।

মামির স্নেহহীন চক্ষে সে যে একটা দুর্গ্রহের মতো প্রতিভাত হইতেছে, এইটে ফটিকের সবচেয়ে বাজিত। মামি যদি দৈবাৎ তাহাকে কোনো একটা কাজ করিতে বলিতেন, তাহা হইলে সে মনের আনন্দে যতটা আবশ্যক তার চেয়ে বেশি কাজ করিয়া ফেলিত- অবশেষে মামি যখন তাহার উৎসাহ দমন করিয়া বলিতেন, 'ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে। ওতে আর তোমায় হাত দিতে হবে না। এখন তুমি নিজের কাজে মন দাওগে। একটু পড়ো গে যাও।' তখন তাহার মানসিক উন্নতির প্রতি মামির এতটা যত্নবাহুল্য তাহার অত্যন্ত নিষ্ঠুর অবিচার বলিয়া মনে হইত।

ঘরের মধ্যে এইরূপ অনাদর, ইহার পর আবার হাঁফ ছাড়িবার জায়গা ছিল না। দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়িয়া কেবলই তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত।

প্রকাণ্ড একটা ধাউস ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, 'তাইরে নাইরে নাইরে না' করিয়া উচ্চঃস্বরে স্বরচিত রাগিণী আলাপ করিয়া অকর্মণ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেইসব দল-বল উপদ্রব স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত।

জন্তুর মতো এক প্রকার অবুঝ ভালোবাসা– কেবল একটা কাছে যাইবার অন্ধ ইচ্ছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত ব্যাকুলতা, গোধূলিসময়ের মাতৃহীন বৎসের মতো কেবল একটা আন্তরিক 'মা মা' ক্রন্দন– সেই লজ্জিত শঙ্কিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলই আলোড়িত হইত।

স্কুলে এত বড়ো নির্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত। মাস্টার যখন মার আরম্ভ করিত তখন ভারক্লান্ত গর্দভের মতো নীরবে সহ্য করিত। ছেলেদের যখন খেলিবার ছুটি হইত, তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দূরের বাড়িগুলার ছাদ নিরীক্ষণ করিত; যখন সেই দ্বিপ্রহর রৌদ্রে কোনো একটা ছাদে দুটি-একটি ছেলেমেয়ে কিছু একটা খেলার ছলে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া যাইত, তখন তাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত।

একদিন অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক সাহসে মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'মামা, মার কাছে কবে যাব।'

মামা বলিয়াছিলেন, 'স্কুলের ছুটি হোক।' কার্তিক মাসে পূজার ছুটি, সে এখনো ঢের দেরি।

একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। একে তো সহজেই পড়া তৈরি হয় না, তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাস্টার প্রতিদিন তাহাকে অত্যন্ত মারধোর অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে তাহার এমন অবস্থা হইল যে, তাহার মামাতো ভাইরা তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিত। ইহার কোনো অপমানে তাহারা অন্যান্য বালকের চেয়েও যেন বলপূর্বক বেশি করিয়া আমোদ প্রকাশ করিত।

অসহ্য বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক তাহার মামির কাছে নিতান্ত অপরাধীর মতো গিয়া কহিল, 'বই হারিয়ে ফেলেছি।'

মামি অধরের দুই প্রান্তে বিরক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, 'বেশ করেছ, আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারিনে।'

ফটিক আর কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিল– সে যে পরের পয়সা নষ্ট করিতেছে, এই মনে করিয়া তাহার মায়ের ওপর অত্যন্ত অভিমান উপস্থিত হইল; নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া সেই রাত্রে তাহার মাথাব্যথা করিতে লাগিল এবং গা সির্‌সির্ করিয়া আসিল। বুঝিতে পারিল তাহার জ্বর আসিতেছে। বুঝিতে পারিল ব্যামো বাঁধাইলে তাহার মামির প্রতি অত্যন্ত অনর্থক উপদ্রব করা হইবে। মামি এই ব্যামোটাকে যে কিরূপ একটা অকারণ অনাবশ্যক জ্বালাতনের স্বরূপ দেখিবে, তাহা সে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিল। রোগের সময় এই অকর্মণ্য অদ্ভুত নির্বোধ বালক পৃথিবীতে নিজের মা ছাড়া আর কাহারও কাছে সেবা পাইতে পারে, এরূপ প্রত্যাশা করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ফটিককে আর দেখা গেল না। চতুর্দিকে প্রতিবেশীদের ঘরে খোঁজ করিয়া তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেদিন আবার রাত্রি হইতে মুষলধারে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়িতেছে। সুতরাং তাহার খোঁজ করিতে লোকজনকে অনর্থক অনেক ভিজিতে হইল। অবশেষে কোথাও না পাইয়া বিশ্বম্ভরবাবু পুলিশে খবর দিলেন।

সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একটা গাড়ি আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবুর বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। তখনও ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে, রাস্তায় এক হাঁটু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

দুই জন পুলিশের লোক গাড়ি হইতে ফটিককে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া বিশ্বম্ভরবাবুর নিকট উপস্থিত করিল। তাহার আপাদমস্তক ভিজা, সর্বাঙ্গে কাদা, মুখ চক্ষু লোহিতবর্ণ, থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। বিশ্বম্ভরবাবু প্রায় কোলে করিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

মামি তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'কেন বাপু, পরের ছেলেকে নিয়ে কেন এ কর্মভোগ। দাও, ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।'

বাস্তবিক, সমস্ত দিন দুশ্চিন্তায় তাঁহার ভালোরূপ আহারাদি হয় নাই এবং নিজের ছেলেদের সহিতও নাহক অনেক খিট্‌মিট্ করিয়াছেন।

ফটিক কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, 'আমি মার কাছে যাচ্ছিলুম, আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।'

বালকের জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি প্রলাপ বকিতে লাগিল। বিশ্বম্ভরবাবু চিকিৎসক লইয়া আসিলেন।

ফটিক তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু একবার উন্মীলিত করিয়া কড়িকাঠের দিকে হতবুদ্ধিভাবে তাকাইয়া কহিল, 'মামা, আমার ছুটি হয়েছে কি ?'

বিশ্বম্ভরবাবু রুমালে চোখ মুছিয়া সস্নেহে ফটিকের শীর্ণ তপ্ত হাতখানি হাতের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন।

ফটিক আবার বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল, বলিল, 'মা, আমাকে মারিস্ নে, মা। সত্যি বলছি, আমি কোনো দোষ করিনি।'

পরদিন দিনের বেলা কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হইয়া ফটিক কাহার প্রত্যাশায় ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিল। নিরাশ হইয়া আবার নীরবে দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিশ্বম্ভরবাবু তাহার মনের ভাব বুঝিয়া তাহার কানের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, 'ফটিক, তোর মাকে আনতে পাঠিয়েছি।'

তাহার পরদিনও কাটিয়া গেল। ডাক্তার চিন্তিত বিমর্ষ মুখে জানাইলেন, অবস্থা বড়োই খারাপ।

বিশ্বম্ভরবাবু স্তিমিত প্রদীপে রোগশয্যায় বসিয়া প্রতিমুহূর্তেই ফটিকের মাতার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ফটিক খালাসিদের মতো সুর করিয়া করিয়া বলিতে লাগিল, 'এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে- এ -এ না।' কলিকাতায় আসিবার সময় কতকটা রাস্তা স্টিমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসিরা কাছি ফেলিয়া সুর করিয়া জল মাপিত; ফটিক প্রলাপে তাহাদেরই অনুকরণে করুণস্বরে জল মাপিতেছে এবং যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে, বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।

এমন সময়ে ফটিকের মাতা ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই উচ্চকলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর বহু কষ্টে তাঁহার শোকোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত করিলে, তিনি শয্যার ওপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চঃস্বরে ডাকিলেন, 'ফটিক, সোনা, মানিক আমার!'

ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল, 'অ্যাঁ।'

মা আবার ডাকিলেন, 'ওরে ফটিক, বাপধন রে!'

ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ না করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, 'মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।'

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থ থেকে 'ছুটি' গল্পটি সংকলন করা হয়েছে।

মূলবক্তব্য

এ গল্পের ফটিক তার গ্রাম্য পরিবেশে মুক্ত, স্বচ্ছন্দবিহারী পাখির মতোই দিন কাটাত। গৃহের আরোপিত পরিবেশ বা শহরের জীবনযাত্রা তার কাছে মোটেই প্রীতিপ্রদ ছিল না। মুক্ত অবাধ জীবনের আস্বাদই তার কাছে আনন্দের ছিল। তাই শহরের কর্মব্যস্ত জীবন থেকে সে আবার গ্রামের আহ্বানে মায়ের কোলে ফিরে যাবার তীব্র ইচ্ছায় একদিন সকল বন্ধন ছিন্ন করে। সে বিশ্ব সংসার থেকে ছুটি নিয়ে কোনো অজানা দেশে চলে গেল। মামার কাছ থেকে সে গ্রামের বাড়িতে মায়ের কাছে যাবার জন্য ছুটি চেয়েছিল। মামা বলেছিলেন, পূজার ছুটির অপেক্ষা করতে। প্রবাসী কিশোর জন্মভূমির মাটিতে মায়ের কাছে ফিরে যাবার আশায় থেকে একদিন সবার কাছ থেকে চিরদিনের জন্য ছুটি নিয়ে অসীমের পথে পাড়ি দিল।

শব্দার্থ ও টীকা

শালকাষ্ঠ- শাল কাঠ। শালগাছের কাঠে মাস্তুল এবং শালগাছের গুড়িতে নৌকা তৈরি হয়। মাস্তুল হল নৌকায় স্থাপিত পাল খাটাবার কাঠের দণ্ড। **প্রবৃত্ত**- নিযুক্ত। **ঔদাসীন্য**- অনাসক্তি। **বিমর্ষ**- মনমরা ভাব।

অকাল তত্ত্বজ্ঞানী মানব- এখানে খেলার অনুপযুক্ততা বা তুচ্ছতা।

গাম্ভীর্য গৌরব এবং তত্ত্বজ্ঞান-সমেত ভূমিসাৎ হইয়া গেল- ফটিকের ছোট ভাই মাখন ছেলেদের খেলাকে নেহাত খেলা মনে করেই যেন কপট গাম্ভীর্য নিয়ে কাঠের উপর বসেছিল। ছেলেরা প্রস্তাব করল, মাখনকে সুদ্ধ ঐ কাঠ গড়িয়ে নিয়ে যাবে। মাখন শুনেও তা গ্রাহ্য করল না। মনে করল, বেশ তো সবাই তাকে কাঠের ওপর বসিয়ে রেখে খেলা খেলবে - এতেও গৌরব আছে। এতে যে বালকোচিত বুদ্ধি তার টিকল না। কাঠটি গড়াতে গেলেই মাখনও মাটিতে পড়ে গেল।

আনন্দের ঔদার্যবশত- মামা বিশ্বম্ভরবাবুর সঙ্গে ফটিক কলকাতায় যাবে, এই খুশিতেই সে যাত্রাকালে তার ছোট ভাই মাখনকে ছিপ ঘুড়ি লাটাই সব অকাতরে দান করে দিল। অথচ এসবের ওপর একদিন তার প্রবল আকর্ষণ ছিল।

শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা চলিয়া যায়- কিশোর বয়সে হঠাৎ শরীর মনে জৈবিক কারণেই একটা পরিবর্তন আসে তখন চেহারার কমনীয়তা এবং কণ্ঠস্বরের মাধুর্য থাকে না। শরীরেও বেশ একটা বেপরোয়া ভাব আসে যেটা স্বাভাবিক হলেও অনেকের পক্ষেই অসহ্য মনে হয়। বড়দের দৃষ্টিতে তা বেমানান মনে হয়। শৈশবের কমনীয়তা ও কণ্ঠস্বরের মধুরতা হারিয়ে যাওয়ার ফলে বড়রা অনেক সময় তাদের সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না।

নিরীক্ষণ- যত্নের সঙ্গে দেখাশোনা করা। **উন্মীলিত করিয়া**- মেলিয়া। **স্তিমিত**-অনুজ্জ্বল। **অহর্নিশি** - দিনরাত্রি। **প্রত্যাশা**- পাওয়ার আশা।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ফটিক মামার বাড়ি থেকে কেন পালিয়েছিল?
   - ক. বই হারিয়ে ফেলেছিল বলে
   - খ পরের পয়সা নষ্ট করছে ভেবে
   - গ. স্কুলে যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে বলে
   - ঘ. ব্যামো বাঁধালে মামির ওপর উপদ্রব হবে মনে করে

২. 'ছুটি' গল্পে মাখনকে অকাল তত্ত্বজ্ঞানী মানব বলা হয়েছে। 'অকাল তত্ত্বজ্ঞানী' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
   - i. অল্প বয়সে তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জনকারী হিসাবে
   - ii. অল্প বয়সে অধিক পাকামো প্রদর্শনকারী হিসাবে
   - iii. অল্প বয়সে গম্ভীর প্রশান্ত ভাব প্রদর্শনকারী হিসাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. i ও iii
গ. ii ও iii	ঘ. iii

৩. 'বেশ করেছ, আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচ বার করে বই কিনে দিতে পারিনে'-এই বাক্যটি

ক. উপহাসসূচক	খ. বিদ্রূপাত্মক
গ. শ্লেষাত্মক	ঘ. ব্যঙ্গাত্মক

নিচের অংশটুকু পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না; এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিত অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোনো সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে, তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে।

৪. **'এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিত অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়'—এখানে কোন বয়সের কথা বলা হয়েছে?**

ক. শৈশবের　　খ. কৈশোরের

গ. বয়ঃসন্ধিকালের　　ঘ. যৌবনের

৫. **উদ্ধৃতাংশের নিম্নোক্ত কোন বৈশিষ্ট্যটি তের চৌদ্দ বছরের ছেলেদের মধ্যে দেখা যায়?**

ক. সদা লজ্জিত　　খ. সর্বদা ক্ষমাপ্রার্থী

গ. স্নেহকাতরতা　　ঘ. আত্মবিক্রীত মনোভাব

৬. **তের-চৌদ্দ বছরের বয়সীদের প্রতি বড়দের আচরণ হতে হবে-**

ক. বন্ধুসুলভ　　খ. স্নেহশীল

গ. সখ্যপূর্ণ　　ঘ. উদার

৭. **'ছুটি' গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?**

ক. ছেলেবেলা　　খ. জীবনস্মৃতি

গ. গল্পগুচ্ছ　　ঘ. কল্পনা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

আকৃতিতে কাহিনী ছোট হলেই ছোটগল্প হয় না। ছোটগল্প আকারে ছোট হবে বলে এতে জীবনের পূর্ণাবয়ব আলোচনা থাকতে পারে না। জীবনের খণ্ডাংশকে লেখক যখন রস-নিবিড় করে ফোটাতে পারেন তখনই এর সার্থকতা। জীবনের কোনো একটি বিশেষ মুহূর্ত কোনো বিশেষ পরিবেশের মধ্যে যেমনভাবে লেখকের কাছে প্রতিভাত হয়, ছোটগল্প তারই রূপায়ণ। স্বল্পসংখ্যক চরিত্র ও সুনির্দিষ্ট ঘটনার সাহায্যে ইঙ্গিতপূর্ণ পরিণতি ছোটগল্পের উদ্দেশ্য। এমনই পরিণতি লক্ষ করা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছুটি' গল্পের শেষ উক্তিতে- 'মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।'

ক. উল্লিখিত অনুচ্ছেদের শেষে উক্তিটি কার?

খ. উপরি-উক্ত অনুচ্ছেদের আলোকে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত কর।

গ. 'জীবনের কোনো একটি বিশেষ মুহূর্ত কোনো বিশেষ পরিবেশের মধ্যে যেমনভাবে লেখকের কাছে প্রতিভাত হয়, ছোটগল্প তারই রূপায়ণ।'-উদ্ধৃতাংশটি তোমার পঠিত 'ছুটি' গল্পের ক্ষেত্রে কতটুকু প্রযোজ্য বলে তুমি মনে কর? যৌক্তিক উত্তর উপস্থাপন কর।

ঘ. ফটিক চরিত্র বিশ্লেষণে 'মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।'– উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

আমার ছেলেবেলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাল রাত্তির থেকে মেঘের কামাই নেই। কেবলই চলছে বৃষ্টি। গাছগুলো বোকার মতো জবুথবু হয়ে রয়েছে। পাখির ডাক বন্ধ। আজ মনে পড়ছে আমার ছেলেবেলাকার সন্ধেবেলা।

তখন আমাদের ঐ সময়টা কাটত চাকরদের মহলে। তখনো ইংরেজি শব্দের বানান আর মানে-মুখস্থর বুক-ধড়াস সন্ধেবেলার ঘাড়ে চেপে বসে নি। সেজদাদা বলতেন, আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি, তারপরে ইংরেজি শেখার পত্তন। তাই যখন আমাদের বয়সী ইস্কুলের সব পোড়োরা গড়ুগড়ু করে আউড়ে চলেছে I am up আমি হই উপরে, He is down তিনি হন নিচে, তখনো বি-এ-ডি ব্যাড এম-এ-ডি ম্যাড পর্যন্ত আমার বিদ্যে পৌঁছয়নি।

নবাবি জবানিতে চাকর নোকরদের মহলকে তখন বলা হত তোশাখানা। যদিও সেকেলে আমিরি দশা থেকে আমাদের বাড়ি নেবে পড়েছিল অনেক নিচে, তবু তোশাখানা দপ্তরখানা বৈঠকখানা নামগুলো ছিল ভিত আঁকড়ে।

জানিয়ে রাখি, আমাদের চাল ছিল গরিবের মতো। গাড়িঘোড়ার বালাই ছিল না বললেই হয়। বাইরে কোণের দিকে তেঁতুল গাছের তলায় ছিল চালাঘরে একটা পালকিগাড়ি আর একটা বুড়ো ঘোড়া। পরনের কাপড় ছিল নেহাত সাদাসিধে। অনেক সময় লেগেছিল পায়ে মোজা উঠতে। যখন ব্রজেশ্বরের ফর্দ এড়িয়ে জলপানে বরাদ্দ হল পাঁউরুটি আর কলাপাতা-মোড়া মাখন, মনে হল আকাশ যেন হাতে নাগাল পাওয়া গেল। সাবেক কালের বড়ো মানুষির ভগ্নদশা সহজেই মেনে নেবার তালিম চলছিল।

আমাদের এই মাদুর-পাতা আসরে যে চাকরটি ছিল সর্দার, তার নাম ব্রজেশ্বর। চুলে গোঁফে লোকটা কাঁচা পাকা, মুখের ওপর টানপড়া শুকনো চামড়া, গম্ভীর মেজাজ, কড়া গলা, চিবিয়ে চিবিয়ে কথা। তার পূর্ব মনিব ছিলেন লক্ষ্মীমন্ত, নামডাকওয়ালা। সেখান থেকে তাকে নাবতে হয়েছে আমাদের মতো হেলায়-মানুষ ছেলেদের খবরদারির কাজে। শুনেছি গ্রামের পাঠশালায় সে গুরুগিরি করেছে। এই গুরুমশায়ি ভাষা আর চাল ছিল তার শেষ পর্যন্ত। বাবুরা 'বসে আছেন' না বলে সে বলত 'অপেক্ষা করে আছেন।' শুনে মনিবরা হাসাহাসি করতেন। যেমন ছিল তার গুমোর তেমনি ছিল তার শুচিবাই। স্নানের সময় সে পুকুরে নেমে উপরকার তেলভাসা জল দুই হাত দিয়ে পাঁচ সাত বার ঠেলে দিয়ে একেবারে ঝুপ করে দিত ডুব। স্নানের পর পুকুর থেকে উঠে বাগানের রাস্তা দিয়ে ব্রজেশ্বর এমন ভঙ্গিতে হাত বাঁকিয়ে চলত যেন কোনোমতে বিধাতার এই নোংরা পৃথিবীটাকে পাশ কাটিয়ে চলতে পারলেই তার জাত বাঁচে। চাল চলনে কোনটা ঠিক কোনটা ঠিক নয়, এ নিয়ে খুব ঝোঁক দিয়ে সে কথা কইত। এ দিকে তার ঘাড়টা ছিল কিছু বাঁকা, তাতে তার কথার মান বাড়ত। কিন্তু ওরই মধ্যে একটা খুঁত ছিল গুরুগিরিতে। ভেতরে ভেতরে তার আহারের লোভটা ছিল চাপা।

আমাদের পাতে আগে থাকতে ঠিকমতো ভাগে খাবার সাজিয়ে রাখা তার নিয়ম ছিল না। আমরা খেতে বসলে একটি একটি করে লুচি আলগোছে দুলিয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করত, 'আর দেব কি।' কোন উত্তর তার মনের মতো, সেটা বোঝা যেত তার গলার সুরে। আমি প্রায়ই বলতুম, 'চাইনে।' তার পরে আর সে পীড়াপীড়ি করত না। দুধের বাটিটার 'পরেও তার অসামাল রকমের টান ছিল, আমার মোটে ছিল না। শেলফওয়ালা একটা খাটো আলমারি ছিল তার ঘরে। তার মধ্যে একটা বড়ো পিতলের বাটিতে থাকত দুধ, আর কাঠের বারকোশে লুচি তরকারি। বিড়ালের লোভ জালের বাইরে বাতাস শুঁকে শুঁকে বেড়াত।

এমনি করে অল্প খাওয়া আমাদের ছেলেবেলা থেকেই দিব্যি সয়ে গিয়েছিল। সেই কম খাওয়াতে আমাকে কাহিল করেছিল, এমন কথা বলবার জো নেই। যে ছেলেরা খেতে কসুর করত না, তাদের চেয়ে আমার গায়ের জোর বেশি বৈ কম ছিল না। শরীর এত বিশ্রী রকমের ভালো ছিল যে, ইস্কুল পালাবার ঝোঁক যখন হয়রান করে দিত, তখনো শরীরে কোনোরকম জুলুমের জোরেও ব্যামো ঘটাতে পারতুম না। জুতো জলে ভিজিয়ে বেড়ালুম সারাদিন, সর্দি হল না। কার্তিক মাসে খোলা ছাদে শুয়েছি, চুল জামা গেছে ভিজে, গলার মধ্যে একটু খুস্‌খুসুনি কাশিরও সাড়া পাওয়া যায়নি।

আর পেট-কামড়ানি বলে ভেতরে ভেতরে বদহজমের যে একটা তাগিদ পাওয়া যায় সেটা বুঝতে পাইনি পেটে, কেবল দরকার মতো মুখে জানিয়েছি মায়ের কাছে। শুনে মা মনে মনে হাসতেন, একটুও ভাবনা করতেন বলে মনে হয়নি। তবু চাকরকে ডেকে বলে দিতেন, 'আচ্ছা যা, মাস্টারকে জানিয়ে দে, আজ আর পড়াতে হবে না।' আমাদের সেকেলে মা মনে করতেন, ছেলে মাঝে মাঝে পড়া কামাই করলে এতই কি লোকসান। এখনকার মায়ের হাতে পড়লে মাস্টারের কাছে তো ফিরে যেতেই হত, তার উপরে খেতে হত কানমলা। হয়তো বা মুচকি হেসে গিলিয়ে দিতেন ক্যাস্টর অয়েল। চিরকালের জন্যে আরাম হত ব্যামোটা। দৈবাৎ কখনো আমার জ্বর হয়েছে; তাকে কেউ জ্বর বলত না, বলত গা-গরম। আসতেন নীলমাধব ডাক্তার। থার্মোমিটার তখন চোক্ষেও দেখিনি; ডাক্তার একটু গায়ে হাত দিয়েই প্রথম দিনের ব্যবস্থা করতেন ক্যাস্টর অয়েল আর উপোস। জল খেতে পেতুম অল্প একটু, সেও গরম জল। তার সঙ্গে এলাচদানা চলতে পারত। তিন দিনের দিনই মৌরলা মাছের ঝোল আর গলা ভাত উপোসের পরে ছিল অমৃত।

জ্বরে ভোগা কাকে বলে মনে পড়ে না। ম্যালেরিয়া বলে শব্দটা শোনাই ছিল না। ওয়াক-ধরানো ওষুধের রাজা ছিল ঐ তেলটা, কিন্তু মনে পড়ে না কুইনিন। গায়ে ফোঁড়াকাটা ছুরির আঁচড় পড়েনি কোনোদিন। হাম বা জলবসন্ত কাকে বলে আজ পর্যন্ত জানি নে। শরীরটা ছিল একগুঁয়ে রকমের ভালো। মায়েরা যদি ছেলেদের শরীর এতটা নীরুগী রাখতে চান যাতে মাস্টারের হাত এড়াতে না পারে, তা হলে ব্রজেশ্বরের মতো চাকর খুঁজে বের করবেন। খাবার-খরচার সঙ্গে সঙ্গেই সে বাঁচাবে ডাক্তার-খরচা; বিশেষ করে এই কলের জাঁতার ময়দা আর এই ভেজাল দেওয়া ঘি-তেলের দিনে। একটা কথা মনে রাখা দরকার, তখনো বাজারে চকোলেট দেখা দেয় নি। ছিল এক পয়সা দামের গোলাপি রেউড়ি। গোলাপি গন্ধের আমেজ দেওয়া এই তিলে ঢাকা চিনির ড্যালা আজও ছেলেদের পকেট চট্‌চটে করে তোলে কিনা জানি নে—নিশ্চয়ই এখনকার মানী লোকের ঘর থেকে লজ্জায় দৌড় মেরেছে। সেই ভাজা মসলার ঠোঙা গেল কোথায়। আর সেই সস্তা দামের তিলে গজা? সে কি এখনো টিঁকে আছে। না থাকে তো তাকে ফিরিয়ে আনার দরকার নেই।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'আমার ছেলেবেলা' রচনাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছেলেবেলা' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

মূল বক্তব্য

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক কবিতায়, জীবনীতে নয়, তাঁর কাব্যে তাঁকে খুঁজতে বলেছেন। কবির একথা অনস্বীকার্য ধরে নিলেও তাঁকে গভীরভাবে পাওয়া যায় তাঁর জীবনস্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থগুলোতে। তিনি তাঁর জীবনস্মৃতির অনুপম রেখাচিত্র এঁকেছেন 'ছেলেবেলা', 'জীবন স্মৃতি' ও 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থ তিনটিতে। কবি তাঁর ছেলেবেলাকার মধুর ও বৈচিত্র্যময় নিঃসঙ্গতার দিনগুলোর কথা লিখেছেন এই 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে।

শব্দার্থ ও টীকা

জবুথবু- জড়সড়। **পোড়োরা**- পড়ুয়ারা। **ফর্দ**- তালিকা। **বারকোশ**- কাঠের বড় থালা। **থার্মোমিটার**- তাপমানযন্ত্র। **ক্যাস্টর অয়েল**- রেড়ির তেল, জোলাপের জন্য ব্যবহৃত।

বুক-ধড়াস সন্ধেবেলার ঘাড়ে চেপে বসেনি- রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায়ও ইংরেজি শিখতে ও মুখস্থ করতে গিয়ে বিদ্যালয়গামী কচি শিশুদের মন আতঙ্কে ভরে উঠত। ইংরেজি শব্দের বানান মুখস্থ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের বুক কেঁপে উঠত। রবীন্দ্রনাথকে অবশ্য এভাবে মুখস্থ করা ইংরেজি শিখতে হয়নি। আর তাকে বাংলা ভাষা ভালোভাবে শিখতে হয়েছিল । এ শেখার মধ্যে আনন্দ ছিল, ভয় ছিল না। তাই পড়াশেখার সেই সন্ধ্যাবেলাটা ভয়ের কারণ হয়ে তাঁর বুকে চেপে বসেনি। রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে তাঁর বিভিন্ন লেখায় এ ধরনের মুখস্থ করা বিদেশি ভাষা শেখার পদ্ধতিকে নানাভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন মাতৃভাষাই ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম। আগে সে ভাষা ভালোভাবে শিখতে হবে।

নবাবি জবানিতে- বড়লোকদের ভাষায়। **তোশাখানা-** (ফারসি শব্দ) আভিধানিক অর্থ মূল্যবান জিনিসপত্র রাখার ঘর বা ভাঁড়ার। রবীন্দ্রনাথ চাকর-বাকরদের মহলকেই তোশাখানা অর্থে প্রয়োগ করেছেন।

আমিরি- মূল আরবি শব্দ 'আমির'। বাংলা ই-প্রত্যয় যোগে শব্দটি আমিরি হয়েছে। বাংলা ভাষায় এ রকম বহু শব্দ আছে। বিদেশি শব্দের সঙ্গে বাংলা ই-প্রত্যয় যোগে গঠিত এমন আরও শব্দ হল : নবাব + ই = নবাবি, বেঈমান + ই = বেঈমানি, খানদান + ই = খানদানি। আমির শব্দের অর্থ শাসক বা আদেশদাতা। এখানে বড়লোকি অর্থে 'আমিরি' (আমির + ই) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

বিশ্রী রকমের ভালো- রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায় শরীর এত সুস্থ ছিল যে, অনেক সময় নানারকম চেষ্টা করেও তিনি অসুখ বাঁধাতে পারতেন না। তাই নিজের শরীরকে তিনি কৌতুক করে বলেছেন বিশ্রী রকমের ভালো।

রেউড়ি- চিনি বা গুড়ের রসে পাক করা খোসাহীন তিলের ছোট টিকার মতো মিষ্টি দ্রব্য বিশেষ। এ ধরনের মিষ্টি দ্রব্য গোলাপি রং মাখিয়ে শিশুদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করা হত।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। **নিচের কোন গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনস্মৃতি নিয়ে রচিত?**

ক. যোগাযোগ　　খ. বিচিত্র প্রবন্ধ
গ. আত্মপরিচয়　　ঘ. ঘরে বাইরে

২। **'আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি, তারপরে ইংরেজি শেখার পত্তন।'–এ উক্তির তাৎপর্য হল-**

i. বাংলা ভাষা শেখার সঙ্গে ইংরেজিও শিখতে হবে
ii. বাংলা ভাষা ভালো করে শিখলে ইংরেজির প্রয়োজন নেই
iii. বাংলা ভাষা ভালো করে শিখেই ইংরেজি শেখা শুরু করা দরকার

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i　　খ. ii ও iii
গ. i ও iii　　ঘ. iii

৩. **'এমনি করে অন্ন খাওয়া আমাদের ছেলেবেলা থেকেই দিব্যি সয়ে গিয়েছিল।' এতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর–**

ক. কাহিল হয়ে পড়েছিলেন　　খ. পর্যাপ্ত শক্তি অনুভব করতেন
গ. অসুখ-বিসুখে ভুগতেন　　ঘ. ঠিক মতো পড়াশুনা করতে পারতেন না

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জানিয়ে রাখি, আমাদের চাল ছিল গরিবের মতো। গাড়িঘোড়ার বালাই ছিল না বললেই হয়। বাইরে কোণের দিকে তেঁতুল গাছের তলায় ছিল চালাঘরে একটা পালকিগাড়ি আর একটা বুড়ো ঘোড়া। পরনের কাপড় ছিল নেহাত সাদাসিধে। অনেক সময় লেগেছিল পায়ে মোজা উঠতে। যখন ব্রজেশ্বরের ফর্দ এড়িয়ে জলপানে বরাদ্দ হল পাঁউরুটি আর কলাপাতা-মোড়া মাখন, মনে হল আকাশ যেন হাতে নাগাল পাওয়া গেল। সাবেক কালের বড়ো মানুষির ভগ্নদশা সহজেই মেনে নেবার তালিম চলছিল।

ক. রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি আছে এমন একটি গ্রন্থের নাম লেখ।
খ. 'ব্রজেশ্বরের ফর্দ'–কথাটির ব্যাখ্যা দাও।
গ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শৈশবের সঙ্গে তোমার শৈশবের তুলনামূলক আলোচনা কর।
ঘ. 'সাবেক কালের বড়ো মানুষি ভগ্নদশা সহজেই মেনে নেবার তালিম চলছিল।'–উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

বই পড়া

প্রমথ চৌধুরী

[লেখক পরিচিতি : প্রমথ চৌধুরী ৭ই আগস্ট ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল পাবনা জেলায় হরিপুর গ্রামে। তাঁর শিক্ষাজীবন ছিল অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ। তিনি ১৮৯০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন এবং পরে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলাত যান। বিলাত থেকে ফিরে এসে ব্যারিস্টারি পেশায় যোগদান না করে তিনি কিছুকাল ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন এবং পরে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম ছিল 'বীরবল'। তাঁর সম্পাদিত 'সবুজ পত্র' বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষারীতি প্রবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বস্তুত তাঁরই নেতৃত্বে বাংলা সাহিত্যে নতুন গদ্যধারা সূচিত হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : বীরবলের হালখাতা, রায়তের কথা, চার-ইয়ারি কথা, আহুতি, প্রবন্ধ সংগ্রহ, নীললোহিত, সনেট পঞ্চাশৎ, পদচারণ ইত্যাদি। প্রমথ চৌধুরী ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ সালে কলকাতায় পরলোকগমন করেন।]

বই পড়া শখটা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শখ হলেও আমি কাউকে শখ হিসেবে বই পড়তে পরামর্শ দিতে চাইনে। প্রথম, সে পরামর্শ কেউ গ্রাহ্য করবেন না; কেননা, আমরা জাত হিসেবে শৌখিন নই। দ্বিতীয়ত, অনেকে তা কুপরামর্শ মনে করবেন; কেননা আমাদের এখন ঠিক শখ করবার সময় নয়। আমাদের এই রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্যের দেশে সুন্দর জীবন ধারণ করাই যখন হয়েছে প্রধান সমস্যা, তখন সেই জীবনকেই সুন্দর করা, মহৎ করার প্রস্তাব অনেকের কাছে নিরর্থক এবং নির্মমও ঠেকবে। আমরা সাহিত্যের রস উপভোগ করতে প্রস্তুত নই ; কিন্তু শিক্ষার ফল লাভের জন্য আমরা সকলে উদ্বাহু। আমাদের বিশ্বাস শিক্ষা আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুই-ই দূর করবে। এ আশা সম্ভবত দুরাশা ; কিন্তু তা হলেও আমরা তা ত্যাগ করতে পারি নে। কেননা, আমাদের উদ্ধারের জন্য কোনো সদুপায় আমরা চোখের সুমুখে দেখতে পাইনে। শিক্ষার মাহাত্ম্যে আমিও বিশ্বাস করি, এবং যিনিই যাই বলুন সাহিত্যচর্চা যে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। লোকে যে তা সন্দেহ করে, তার কারণ এ শিক্ষার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তার কোনো নগদ বাজার দর নেই। এই কারণে ডেমোক্রেসি সাহিত্যের সার্থকতা বোঝে না, বোঝে শুধু অর্থের সার্থকতা। ডেমোক্রেসির গুরুরা চেয়েছিলেন সকলকে সমান করতে কিন্তু তাদের শিষ্যরা তাদের কথা উল্টো বুঝে সকলেই হতে চায় বড় মানুষ। একটি বিশিষ্ট অভিজাত সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়েও ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমরা ডেমোক্রেসির গুণগুলো আয়ত্ত করতে না পেরে তার দোষগুলো আত্মসাৎ করেছি। এর কারণও স্পষ্ট। ব্যাধিই সংক্রামক স্বাস্থ্য নয়। আমাদের শিক্ষিত সমাজের লোলুপদৃষ্টি আজ অর্থের ওপরই পড়ে রয়েছে। সুতরাং সাহিত্যচর্চার সুফল সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান। যাঁরা হাজারখানা ল-রিপোর্ট কেনেন, তারা একখানা কাব্যগ্রন্থও কিনতে প্রস্তুত নন, কেননা, তাতে ব্যবসার কোনো সুসার নেই। নজির না আউড়ে কবিতা আবৃত্তি করলে মামলা যে হারতে হবে সে তো জানা কথা, কিন্তু যে কথা জজে শোনে না, তার যে কোনো মূল্য নেই, এইটেই হচ্ছে পেশাদারদের মহাভ্রান্তি। জ্ঞানের ভাণ্ডার যে ধনের ভাণ্ডার নয় এ সত্য তো প্রত্যক্ষ। কিন্তু সমান প্রত্যক্ষ না হলেও সমান সত্য যে, এ যুগে যে জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য সে জাতির ধনের ভাঁড়েও ভবানী। তারপর যে জাতি মনে বড় নয়, সে জাতি জ্ঞানেও বড় নয়; কেননা ধনের সৃষ্টি যেমন জ্ঞান সাপেক্ষ তেমনি জ্ঞানের সৃষ্টি মন সাপেক্ষ এবং মানুষের মনকে সরল, সচল, সরাগ ও সমৃদ্ধ করার ভার আজকের দিনে সাহিত্যের ওপরও ন্যস্ত হয়েছে। কেননা, মানুষের দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্মনীতি, অনুরাগ-বিরাগ, আশা-নৈরাশ্য, তার অন্তরের সত্য ও স্বপ্ন এই সকলের সমবায়ে সাহিত্যের জন্ম। অপরাপর শাস্ত্রের ভিতর যা আছে সেসব হচ্ছে মানুষের মনের ভগ্নাংশ; তার পুরো মনটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় শুধু সাহিত্যে। দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি হচ্ছে তার মনগঙ্গার তোলা জল, তার পূর্ণ স্রোত আবহমানকাল সাহিত্যের ভেতরই সোল্লাসে সবেগে বয়ে চলেছে এবং সেই গঙ্গাতে অবগাহন করেই আমরা আমাদের সকল পাপমুক্ত হব।

অতএব, দাঁড়াল এই যে, আমাদের বই পড়তে হবে, কেননা বই পড়া ছাড়া সাহিত্যচর্চার উপায়ান্তর নেই। ধর্মের চর্চা চাই কি মন্দিরের বাইরেও করা চলে, দর্শনের চর্চা গুহায়, নীতির চর্চা ঘরে এবং বিজ্ঞানের চর্চা জাদুঘরে; কিন্তু সাহিত্যের চর্চার জন্য চাই লাইব্রেরি ; ও-চর্চা মানুষে কারখানাতেও করতে পারে না; চিড়িয়াখানাতেও নয়।

এইসব কথা যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের মানতেই হবে যে, সাহিত্যের মধ্যে আমাদের জাত মানুষ হবে। সেইজন্য আমরা যত বেশি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করব, দেশের তত বেশি উপকার হবে।

আমাদের মনে হয় এ দেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয় এবং স্কুল কলেজের চাইতে একটু বেশি। একথা শুনে অনেকে চমকে উঠবেন। কেউ কেউ আবার হেসেও উঠবেন; কিন্তু আমি জানি, আমি রসিকতাও করছিনে, অদ্ভুত কথাও বলছিনে ; যদিও এ বিষয়ে লোকমত যে আমার মতের সমরেখায় চলে না, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। অতএব আমার কথার আমি কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। আমার বক্তব্য আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি তার সত্য মিথ্যার বিচার আপনারা করবেন। সে বিচারে আমার কথা যদি না টেকে তাহলে রসিকতা হিসেবেই গ্রাহ্য করবেন।

আমার বিশ্বাস শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত। আজকের বাজারে বিদ্যাদাতার অভাব নেই। এমন কি, এ ক্ষেত্রে দাতাকর্ণেরও অভাব নেই ; এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিত থাকি এই বিশ্বাসে যে, সেখানে থেকে তারা এতটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে যার সুদে তার বাকি জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক। মনোরাজ্যের দান গ্রহণসাপেক্ষ, অথচ আমরা দাতার মুখ চেয়ে গ্রহীতার কথাটা একেবারেই ভুলে যাই। এ সত্য ভুলে না গেলে আমরা বুঝতাম যে, শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষাদান করায় নয়, কিন্তু ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, তার কৌতূহল উদ্রেক করতে পারেন, তার বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার জ্ঞান পিপাসাকে জ্বলন্ত করতে পারেন, এর বেশি আর কিছু পারেন না। যিনি যথার্থ গুরু তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে শিষ্য নিজের মন নিজে গড়ে তোলে, নিজের অভিমত বিদ্যা নিজে অর্জন করে। বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে অর্জন করতে হয়। গুরু উত্তরসাধক মাত্র।

আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উলটো। সেখানে ছেলেদের বিদ্যে গেলানো হয়, তারা তা জীর্ণ করতে পারুক আর নাই পারুক। এর ফলে ছেলেরা শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্নিতে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে। একটা জানাশোনা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যাক। আমাদের সমাজে এমন অনেক মা আছেন যাঁরা শিশু সন্তানকে ক্রমান্বয়ে গরুর দুধ গেলানোটাই শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার ও বলবৃদ্ধির সর্বপ্রধান উপায় মনে করেন। দুগ্ধ অবশ্য অতিশয় উপাদেয় পদার্থ, কিন্তু তার উপকারিতা যে ভোক্তার জীর্ণ করবার শক্তির ওপর নির্ভর করে এ জ্ঞান ও শ্রেণীর মাতৃকুলের নেই। তাদের বিশ্বাস ও বস্তু পেটে গেলেই উপকার হবে। কাজেই শিশু যদি তা গিলতে আপত্তি করে তাহলে সে যে বেয়াড়া ছেলে, সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। অতএব তখন তাকে ধরে বেঁধে জোর জবরদস্তি করে দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। শেষটায় সে যখন এই দুগ্ধপান ক্রিয়া হতে অব্যাহতি লাভ করার জন্য মাথা নাড়াতে, হাত-পা ছুড়তে শুরু করে, তখন স্নেহময়ী মাতা বলেন, আমার মাথা খাও, মরামুখ দেখ, এই ঢোক, আর এক ঢোক, আর এক ঢোক ইত্যাদি। মাতার উদ্দেশ্য যে খুব সাধু, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, উক্ত বলা কওয়ার ফলে মা শুধু ছেলের যকৃতের মাথা খান এবং ঢোকের পর ঢোকে তার মরামুখ দেখবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে চলেন। আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষা পদ্ধতিটাও ঐ একই ধরনের। এর ফলে কত ছেলের সুস্থ সরল মন যে ইনফ্যান্টাইল লিভারে গতাসু হচ্ছে তা বলা কঠিন। কেননা দেহের মৃত্যুর রেজিস্টারি রাখা হয়, আত্মার হয় না।

আমরা কিন্তু এই আত্মার অপমৃত্যুতে ভীত হওয়া দূরে থাক, উৎফুল্ল হয়ে উঠি। আমরা ভাবি দেশে যত ছেলে পাশ হচ্ছে তত শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে। পাশ করা ও শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয়, এ সত্য স্বীকার করতে আমরা কুণ্ঠিত হই। শিক্ষা শাস্ত্রের একজন জগদ্বিখ্যাত ফরাসি শাস্ত্রী বলেছেন যে, এক সময়ে ফরাসি দেশে শিক্ষা পদ্ধতি এতই বেয়াড়া ছিল যে, সে যুগে France was saved by her idlers : অর্থাৎ যারা পাশ করতে পারেনি বা চায়নি তারাই ফ্রান্সকে রক্ষা করেছে। এর কারণ, হয় তাদের মনের বল ছিল বলে কলেজের শিক্ষাকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল, নয় সে শিক্ষা প্রত্যাখান করেছিল বলেই তাদের মনের বল বজায় ছিল। তাই এই স্কুল-পালানো ছেলেদের দল থেকে সে যুগের ফ্রান্সের যত কৃতকর্মা লোকের আবির্ভাব হয়েছিল।

সে যুগে ফ্রান্সে কী রকম শিক্ষা দেওয়া হত তা আমার জানা নেই। তবুও আমি জোর করে বলতে পারি যে, এ যুগে আমাদের স্কুল কলেজে শিক্ষার যে রীতি চলছে, তার চাইতে সে শিক্ষাপদ্ধতি কিছুতেই নিকৃষ্ট ছিল না। সকলেই জানেন যে, বিদ্যালয়ে মাস্টার মহাশয়েরা নোট দেন এবং সেই নোট মুখস্থ করে তারা হয় পাশ। এর জুড়ি আর একটি ব্যাপারও আমাদের দেশে দেখা যায়। এদেশে একদল বাজিকর আছে, যারা বন্দুকের গুলি থেকে আরম্ভ করে উত্তরোত্তর কামানের গুলি পর্যন্ত গলাধঃকরণ করে। তারপর একে একে সবগুলো উগলে দেয়। এর ভেতর যে অসাধারণ কৌশল আছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই খেলা আর ওগলানো দর্শকের কাছে তামাশা হলেও বাজিকরের কাছে তা প্রাণান্তকর ব্যাপার। ও কারদানি করা তার পক্ষে যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি অপকারী। বলা বাহুল্য, সে বেচারাও লোহার গোলাগুলোর এক কণাও জীর্ণ করতে পারে না। আমাদের ছেলেরাও তেমনি নোট নামক গুরুদত্ত নানা আকারের ও নানা প্রকারের গোলাগুলো বিদ্যালয়ে গলাধঃকরণ করে পরীক্ষালয়ে তা উদ্গীরণ করে দেয়। এ জন্য সমাজ বাহবা দেয় দিক, কিন্তু মনে যেন না ভাবে যে, এ জাতির প্রাণশক্তি বাড়ছে। স্কুল কলেজের শিক্ষা যে অনেকাংশে ব্যর্থ নয়, অনেক স্থলে মারাত্মক। কেননা আমাদের স্কুল কলেজের ছেলেদের স্বশিক্ষিত হবার সে সুযোগ দেয় না, শুধু তাই নয়, স্বশিক্ষিত হবার শক্তি পর্যন্ত নষ্ট করে। আমাদের শিক্ষাযন্ত্রের মধ্যে যে যুবক নিষ্পেষিত হয়ে বেরিয়ে আসে, তার আপনার বলতে বেশি কিছু থাকে না, যদি না তার প্রাণ অত্যন্ত কড়া হয়। সৌভাগ্যের বিষয়, এই ক্ষীণপ্রাণ জাতির মধ্যেও জনকতক এমন কঠিন প্রাণের লোক আছে, এহেন শিক্ষাপদ্ধতিও তাদের মনকে জখম করলেও একেবারে বধ করতে পারে না।

আমি লাইব্রেরিকে স্কুল কলেজের ওপরে স্থান দিই এই কারণে যে, এ স্থলে লোকে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বশিক্ষিত হবার সুযোগ পায়; প্রতিটি লোক তার স্বীয় শক্তি ও রুচি অনুসারে নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। স্কুল কলেজ বর্তমানে আমাদের যে অপকার করছে সে অপকারের প্রতিকারের জন্য শুধু নগরে নগরে নয়, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য। আমি পূর্বে বলেছি যে, লাইব্রেরি হাসপাতালের চাইতে কম উপকারী নয়, তার কারণ আমাদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় লাইব্রেরি হচ্ছে একরকম মনের হাসপাতাল। অতঃপর আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, বই পড়ার পক্ষ নিয়ে এ ওকালতি করবার, বিশেষত প্রাচীন নজির দেখাবার কী প্রয়োজন ছিল? বই পড়া যে ভালো, তা কে না মানে? আমার উত্তর সকলে মুখে মানলেও কাজে মানে না। মুসলমান ধর্মে মানবজাতি দুই ভাগে বিভক্ত। যারা কেতাবি, আর এক যারা তা নয়। বাংলায় শিক্ষিত সমাজ যে পূর্বদলভুক্ত নয়, একথা নির্ভয়ে বলা যায় না; আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় মোটের ওপর বাধ্য না হলে বই স্পর্শ করেন না। ছেলেরা যে নোট পড়ে এবং ছেলের বাপেরা যে নজির পড়েন, দুই-ই বাধ্য হয়ে, অর্থাৎ পেটের দায়ে। সেইজন্য সাহিত্যচর্চা দেশে একরকম নেই বললেই হয় ; কেননা, সাহিত্য সাক্ষাৎভাবে উদরপূর্তির কাজে লাগে না। বাধ্য হয়ে বই পড়ায় আমরা এতটা অভ্যস্ত হয়েছি যে, কেউ স্বেচ্ছায় বই পড়লে আমরা তাকে নিষ্কর্মার দলেই ফেলে দিই; অথচ একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না, যে জিনিস স্বেচ্ছায় না করা যায়, তাতে মানুষের মনের সন্তোষ নেই। একমাত্র উদরপূর্তিতে মানুষের সম্পূর্ণ মনস্তুষ্টি হয় না। একথা আমরা সকলেই জানি যে, উদরের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের দেহ বাঁচে না ; কিন্তু একথা আমরা সকলেই মানিনে যে, মনের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না। দেহরক্ষা অবশ্য সকলেরই কর্তব্য, কিন্তু আত্মরক্ষাও অকর্তব্য নয়। মানবের ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে যে মানুষের প্রাণ মনের সম্পর্ক যত হারায় ততই তা দুর্বল হয়ে পড়ে। মনকে সজাগ ও সবল রাখতে না পারলে জাতির প্রাণ যথার্থ স্ফূর্তিলাভ করে না ; তারপর যে জাতি যত নিরানন্দ সে জাতি তত নির্জীব। একমাত্র আনন্দের স্পর্শেই মানুষের মনপ্রাণ সজীব, সতেজ ও সরাগ হয়ে ওঠে। সুতরাং সাহিত্যচর্চার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, জাতির জীবনীশক্তির হ্রাস করা। অতএব, কোনো নীতির অনুসারেই তা কর্তব্য হতে পারে না। অর্থনীতিরও নয়, ধর্মনীতিরও নয়।

কাব্যামৃতে যে আমাদের অরুচি ধরেছে সে অবশ্য আমাদের দোষ নয়, আমাদের শিক্ষার দোষ। যার আনন্দ নেই সে নির্জীব একথা যেমন সত্য, যে নির্জীব তারও আনন্দ নেই, সে কথাও তেমনি সত্য। আমাদের শিক্ষাই আমাদের নির্জীব করেছে। জাতির আত্মরক্ষার জন্য এ শিক্ষার উলটো টান যে আমাদের টানতে হবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এই বিশ্বাসের বলেই আমি স্বেচ্ছায় সাহিত্যচর্চার সপক্ষে এত বাক্য ব্যয় করলুম। সে বাক্যে আপনাদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছি কিনা জানিনে। সম্ভবত হইনি। কেননা, আমাদের দুরবস্থার কথা যখন স্মরণ করি, তখন খালি কোমল সুরে আলাপ করা আর চলে না ; মনের আক্ষেপ প্রকাশ করতে মাঝে মাঝেই কড়ি লাগাতে হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'বই পড়া' প্রবন্ধটি প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহ থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। একটি লাইব্রেরির বার্ষিক সভায় প্রবন্ধটি পঠিত হয়েছিল।

মূলবক্তব্য

আমাদের পাঠচর্চার অনভ্যাস যে শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য ঘটছে তা সহজেই লক্ষণীয়। আর্থিক অনটনের কারণে অর্থকরী নয় এমন সবকিছুই এদেশে অনর্থক বলে বিবেচনা করা হয়। সেজন্য বই পড়ার প্রতি লোকের অনীহা বিদ্যমান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে লব্ধ শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ নয় বলে ব্যাপকভাবে বই পড়া দরকার। কারণ সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত। যথার্থ শিক্ষিত হতে হলে মনের প্রসার দরকার। তার জন্য বই পড়ার অভ্যাস বাড়াতে হবে। এর জন্য লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। বাধ্য না হলে লোকে বই পড়ে না। লাইব্রেরিতে লোকে নিজের পছন্দ অনুযায়ী বই পড়ে যথার্থ শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। প্রগতিশীল জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য সাহিত্যচর্চা করা আবশ্যক বলে লেখক মনে করেন।

শব্দার্থ ও টীকা

শৌখিন- রুচিবান। **উদ্বাহু**- উর্ধ্ববাহু। আহ্লাদে হাত ওঠানো। **ডেমোক্রেসি**- গণতন্ত্র। **সন্দিহান**- সন্দেহযুক্ত। **সুসার**- প্রাচুর্য, সচ্ছলতা, সুবিধা। **জজ**- বিচারক। **ভাঁড়েও ভবানী**- রিক্ত, শূন্য। **আবহমানকাল**- চিরকাল। **সোল্লাসে**- আনন্দে। **অবগাহন**- সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে গোসল। **উপায়ান্তর**- অন্য কোনো উপায়। **স্বশিক্ষিত**- নিজে নিজে শিক্ষিত। **প্রচ্ছন্ন**- গোপন। **জীর্ণ**- হজম। **অব্যাহতি**- মুক্তি। **গতাসু**- মৃত। **গলাধঃকরণ**- গিলে ফেলা। **কারদানি**- বাহাদুরি। **উদরপূর্তি**- পেট ভরানো। **ধান ভানতে শিবের গীত**- অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা। **এথেন্স**- গ্রিসের রাজধানী। **ডেমোক্রেটিক**- গণতান্ত্রিক। **দাতাকর্ণ** - মহাভারতের বিশিষ্ট চরিত্র, কুন্তিপুত্র; দানের জন্য প্রবাদতুল্য মানুষ। **কেতাবি**- কেতাব অনুসরণ করে চলে যারা।

অনুশীলনী

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. প্রমথ চৌধুরী কোন শতকে জন্মগ্রহণ করেন?

ক. সপ্তদশ খ. অষ্টাদশ
গ. উনবিংশ ঘ. বিংশ

২. 'বই পড়া' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য কোনটি?

ক. বই পড়ায় আগ্রহ সৃষ্টি করা খ. জ্ঞানার্জনের জন্য উপদেশ দেওয়া
গ. শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন করা ঘ. সাহিত্য-চর্চায় গুরুত্বারোপ করা

৩. ‘বই পড়া’ এবং ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধ দুটির ঐক্য রয়েছে নিম্নোক্ত বিবেচনায় :

i. জ্ঞানচর্চা ii. সাহিত্যচর্চা
iii. আত্মার মুক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii, খ. i ও iii,
গ ii ও iii ঘ. iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের উদ্দীপকটির অনুসরণে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. ‘বই পড়া’ প্রবন্ধের লেখকের মতে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শখ কোনটি?

২. প্রাবন্ধিক অন্তর্নিহিত শক্তি বলতে কী বুঝিয়েছেন?—ব্যাখ্যা কর।

৩. সারণিতে ‘বই পড়া’ প্রবন্ধের কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে? – যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

৪. সুশিক্ষিত ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে সারণির ধাপগুলো পর্যালোচনা কর।

মহেশ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[লেখক পরিচিতি : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আর্থিক সংকটের কারণে এফ.এ. শ্রেণীতে পড়ার সময় তাঁর ছাত্রজীবনের অবসান ঘটে। তিনি কিছুদিন ভবঘুরে হয়ে বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণ করেন। পরে ১৯০৩ সালে ভাগ্যের সন্ধানে বার্মা (বর্তমানে মায়ানমার) যান এবং রেঙ্গুনে একাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে কেরানি পদে চাকুরি করেন। প্রবাস জীবনেই তাঁর সাহিত্য সাধনা শুরু এবং তিনি অল্পদিনেই খ্যাতি লাভ করেন। ১৯১৬ সালে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন এবং নিয়মিতভাবে সাহিত্য সাধনা করতে থাকেন। গল্প, উপন্যাস রচনার পাশাপাশি তিনি কিছু প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে তা ত্যাগ করেন। তিনি ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী পদক' এবং ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট উপাধি লাভ করেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা কথা সাহিত্যে দুর্লভ জনপ্রিয়তার অধিকারী। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : বড়দিদি, বিরাজ বৌ, রামের সুমতি, দেবদাস, বিন্দুর ছেলে, পরিণীতা, পণ্ডিতমশাই, মেজদিদি, পল্লীসমাজ, বৈকুণ্ঠের উইল, শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, দত্তা, ছবি, গৃহদাহ, দেনা পাওনা, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন, বিপ্রদাস ইত্যাদি। শরৎচন্দ্র ১৬ই জানুয়ারি ১৯৩৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।]

গ্রামের নাম কাশিপুর।

পূজা সারিয়া তর্করত্ন দ্বিপ্রহর বেলায় বাটী ফিরিতেছিলেন। বৈশাখ শেষ হইয়া আসে, কিন্তু মেঘের ছায়াটুকু কোথাও নেই, অনাবৃষ্টির আকাশ হইতে যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে।

সম্মুখের দিগন্তজোড়া মাঠখানা জ্বলিয়া পুড়িয়া ফুটিফাটা হইয়া আছে, আর সেই লক্ষ ফাটল দিয়া ধরিত্রীর বুকের রক্ত নিরন্তর ধুঁয়া হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। অগ্নিশিখার মতো তাহাদের সর্পিল ঊর্ধ্বগতির প্রতি চাহিয়া থাকিলে মাথা ঝিম ঝিম করে- যেন নেশা লাগে।

ইহারই সীমানায় পথের ধারে গফুর মিঞার বাড়ি। তাহার মাটির প্রাচীর পড়িয়া গিয়া প্রাঙ্গণ আসিয়া পথে মিশিয়াছে এবং অন্তঃপুরের লজ্জা সম্ভ্রম পথিকের করুণায় আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিত হইয়াছে।

পথের ধারে একটা পিটালি গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া তর্করত্ন উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, ওরে, ও গফরা, বলি ঘরে আছিস?

তাহার বছর দশেকের মেয়ে দুয়ারে দাঁড়াইয়া সাড়া দিল, কেন বাবাকে? বাবার যে জ্বর!

ডেকে দে তাকে। পাষণ্ড!

হাঁক-ডাকে গফুর মিঞা ঘর হইতে বাহির হইয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাঙা প্রাচীরের গা ঘেঁষিয়া একটা পুরাতন বাবলা গাছ, তাহার ডালে বাঁধা একটা ষাঁড়। তর্করত্ন দেখাইয়া কহিলেন, ওটা হচ্ছে কী শুনি ? এ হিঁদুর গাঁ, ব্রাহ্মণ জমিদার, সে খেয়াল আছে ? তাঁর মুখখানা রাগে ও রৌদ্রের ঝাঁকে রক্তবর্ণ, সুতরাং সে মুখ দিয়া তপ্ত খরবাক্যই বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু হেতুটা বুঝিতে না পারিয়া গফুর শুধু চাহিয়া রহিল।

তর্করত্ন বলিলেন, যাবার সময় দেখে গেছি বাঁধা, দুপুরে ফেরবার পথে দেখছি তেমনি ঠাঁয় বাঁধা, গোহত্যা হলে যে কর্তা তোকে জ্যান্ত কবর দেবে। সে যে-সে বামুন নয়।

কী করব বাবাঠাকুর, বড় লাচারে পড়ে গেছি। কদিন থেকে গায়ে জ্বর, দড়ি ধরে যে দুমুঠো খাইয়ে আনব তা মাথা ঘুরে পড়ে যাই।

তবে ছেড়ে দে না, আপনি চরাই করে আসুক।

কোথায় ছাড়ব বাবাঠাকুর, লোকের ধান এখনও সব ঝাড়া হয়নি- খামারে পড়ে খড় এখনও গাদি দেওয়া হয়নি, মাঠের

আলগুলো সব জ্বলে গেল- কোথাও এক মুঠো ঘাস নেই। কার ধানে মুখ দেবে, কার গাদা ফেড়ে খাবে, ক্যাম্‌নে ছাড়ি বাবাঠাকুর?

তর্করত্ন একটু নরম হইয়া কহিলেন, না ছাড়িস্ তা ঠান্ডায় কোথাও বেঁধে দিয়ে দু আঁটি বিচুলি ফেলে দে না ততক্ষণ চিবোক। তোর মেয়ে ভাত রাঁধেনি? ফ্যানে-জলে দে না এক গামলা খাক্।

গফুর জবাব দিল না। নিরুপায়ের মতো তর্করত্নের মুখের পানে চাহিয়া তাহার নিজের মুখ দিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। তর্করত্ন বলিলেন, তাও নেই বুঝি? কী করলি খড়? ভাগে এবার যা পেলি সমস্ত বেচে পেটায় নমঃ? গরুটার জন্য এক আঁটি ফেলে রাখতে নেই? ব্যাটা কসাই !

এই নিষ্ঠুর অভিযোগ গফুরের যেন বাক্‌রোধ হইয়া গেল ! ক্ষণেক পরে ধীরে ধীরে কহিল, কাহন-খানেক খড় এবার ভাগে পেয়েছিলাম, কিন্তু গেল সনের বকেয়া বলে কর্তামশায় সব ধরে রাখলেন। কেঁদে কেটে হাতে-পায়ে পড়ে বললাম, বাবুমশাই, হাকিম তুমি, তোমার রাজত্বি ছেড়ে আর পালাব কোথায়, আমাকে পণদশেক বিচুলিই না হয় দাও। চালে খড় নেই- একখানি ঘর, বাপ- বেটিতে থাকি, তাও না হয় তালপাতার গোঁজাগাঁজা দিয়ে এ বর্ষাটা কাটিয়ে দেব, কিন্তু না খেতে পেয়ে আমার মহেশ মরে যাবে।

তর্করত্ন হাসিয়া কহিলেন, ইস ! সাধ করে আবার নাম রাখা হয়েছে মহেশ ! হেসে বাঁচি নে !

কিন্তু এ বিদ্রূপ গফুরের কানে গেল না, সে বলিতে লাগিল, কিন্তু হাকিমের দয়া হল না। মাস দুয়েক খোরাকের মতো ধান দুটি আমাদের দিলেন, কিন্তু বেবাক খড় সরকারে গাদা হয়ে গেল, ও আমার কুটোটি পেলে না। বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর তাহার অশ্রুভারে ভারী হইয়া উঠিল।

কিন্তু তর্করত্নের তাহাতে করুণার উদয় হইল না; কহিলেন, আচ্ছা মানুষ তো তুই- খেয়ে রেখেছিস, দিবি নে ? জমিদার কি তোকে ঘর থেকে খাওয়াবে নাকি ? তোরা তো রামরাজত্বে বাস করিস- তাই তাঁর নিন্দে করে মরিস।

গফুর লজ্জিত হইয়া বলিল, নিন্দে করব কেন বাবাঠাকুর, নিন্দে তার আমরা করি নে। কিন্তু কোথা থেকে দিই, বলত ? বিঘে চারেক জমি ভাগে করি, কিন্তু উপরি উপরি দু সন অজন্মা-মাঠের ধান মাঠে শুকিয়ে গেল, বাপ-বেটিতে দুবেলা দুটো পেট ভরে খেতে পর্যন্ত পাইনি। ঘরের পানে চেয়ে দেখ, বিষ্টি-বাদল মেয়েটিকে নিয়ে, কোণে বসে রাত কাটাই, পা ছড়িয়ে শোবার ঠাঁই মেলে না। মহেশকে একটিবার তাকিয়ে দেখ, পাঁজরা গোনা যাচ্ছে, দাও না ঠাকুরমশাই, কাহন-দুই ধার, গরুটাকে দুদিন পেট পুরে খেতে দিই। বলিতে বলিতেই সে ধপ্ করিয়া ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। তর্করত্ন তীরবৎ দুপা পিছাইয়া গিয়া কহিলেন, আ মর্, ছুঁয়ে ফেলবি না কি?

না বাবাঠাকুর, ছোঁব কেন, ছোঁব না ! কিন্তু দাও এবার আমাকে কাহন-দুই খড়। তোমার চার-চারটে গাদা সে দিন দেখে এসেছি- একটি দিলে তুমি টেরও পাবে না । আমরা না খেয়ে মরি ক্ষতি নেই, কিন্তু আমার অবলা জীব কথা বলতে পারে না, শুধু চেয়ে থাকে, আর চোখ দিয়ে জল পড়ে।

তর্করত্ন কহিলেন, ধার নিবি, শুধবি কী করে শুনি ? গফুর আশান্বিত হইয়া ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল, যেমন করে পারি শুধব বাবাঠাকুর, তোমাকে ফাঁকি দেব না।

তর্করত্ন মুখে এক প্রকার শব্দ করিয়া গফুরের ব্যাকুল-কণ্ঠের অনুকরণ করিয়া কহিলেন, ফাঁকি দেব না ! যেমন করে পারি শুধব ! যা যা সর, পথ ছাড়। ঘরে যাই, বেলা হয়ে গেল। এই বলিয়া তিনি একটু মুচকি হাসিয়া পা বাড়াইয়া সহসা সভয়ে পিছাইয়া দিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, আরে, শিং নেড়ে আসে যে, গুঁতোবে না কি?

গফুর উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরের হাতে ফলমূল ও ভিজা চালের পুঁটলি ছিল, সেইটা দেখাইয়া কহিল, গন্ধ পেয়েছে, একমুঠো খেতে চায়।

খেতে চায়? তা বটে ! যেমন চাষী, তার তেমনি বলদ। খড় জোটে না, চাল-কলা খাওয়া চাই ! নে নে, পথ থেকে সরিয়ে বাঁধ। যে শিং, কোন্ দিন দেখছি কাকে খুন করবে। এই বলিয়া তর্করত্ন পাশ কাটাইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

গফুর সে দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া মহেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নিবিড় গভীর কালো চোখ দুটি বেদনা ও ক্ষুধায় ভরা; কহিল, তোকে দিলে না এক মুঠো? ওদের অনেক আছে, তবু দেয় না। না দিকগে। তাহার গলা বুজিয়া আসিল, তারপরে চোখ দিয়া টপ্‌টপ্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কাছে আসিয়া নীরবে ধীরে ধীরে তাহার গলায় মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে চুপি চুপি বলিতে লাগিল, মহেশ, তুই আমার ছেলে, তুই আমাদের আট সন প্রতিপালন করে বুড়ো হয়েছিস, তোকে আমি পেট পুরে খেতে দিতে পারি নে, কিন্তু তুই তো জানিস তোকে আমি কত ভালোবাসি।

মহেশ প্রত্যুত্তরে শুধু গলা বাড়াইয়া আরামে চোখ বুজিয়া রহিল। গফুর চোখের জল গরুটার পিঠের ওপর রগড়াইয়া মুছিয়া ফেলিয়া তেমনি অস্ফুটে কহিতে লাগিল, জমিদার তোর মুখের খাবার কেড়ে নিলে, শ্মশানধারে গাঁয়ের যে গোচরটুকু ছিল তাও পয়সার লোভে জমা-বিলি করে দিলে। এই দুর্বচ্ছরে তোকে কেমন করে বেঁধে রাখি বল? ছেড়ে দিলে তুই পরের গাদা ফেলে খাবি। দেশের কেউ তোকে চায় না- লোকে বলে তোকে গোহাটায় বেচে ফেলতে। কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করিয়াই আবার তাহার দু চোখ বাহিয়া টপ্‌টপ্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া গফুর একবার এদিকে ওদিকে চাহিল। তারপর ভাঙা ঘরের পিছন হতে কতকটা পুরানো বিবর্ণ খড় আনিয়া মহেশের মুখের কাছে রাখিয়া দিয়া আস্তে আস্তে কহিল, নে, শীগগির করে একটু খেয়ে নে বাবা, দেরি হলে আবার-

বাবা !

কেন মা?

ভাত খাবে এসো। বলিয়া আমিনা ঘর হইতে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। এক মুহূর্তে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, মহেশকে আবার চাল ফেড়ে খড় দিয়েছ, বাবা?

ঠিক এই ভয়ই সে করিতেছিল, লজ্জিত হইয়া বলিল, পুরানো পচা খড় মা, আপনিই ঝরে যাচ্ছিল-

আমি যে ভেতর থেকে শুনতে পেলাম বাবা. তুমি টেনে বার করছ?

না, মা, ঠিক টেনে নয় বটে-

কিন্তু দেয়ালটা যে পড়ে যাবে বাবা-

গফুর চুপ করিয়া রহিল। একটি মাত্র ঘর ছাড়া যে আর সবই গিয়াছে এবং এমন করিলে আগামী বর্ষায় ইহাও টিকিবে না, এ কথা তাহার নিজের চেয়ে আর কে বেশি জানে ? অথচ এ উপায়েই বা কটা দিন চলে !

মেয়ে কহিল, হাত ধুয়ে ভাত খাবে, এসো বাবা, আমি বেড়ে দিয়েছি।

গফুর কহিল, ফ্যানটুকু দে তো মা, একেবারে খাইয়া দিয়ে যাই।

ফ্যান যে আজ নেই বাবা, হাঁড়িতেই মরে গেছে।

নেই ? গফুর নীরব হইয়া রহিল। দুঃখের দিনে এটুকুও যে নষ্ট করা যায় না এই দশ বছরের মেয়েটা তাহাও বুঝিয়াছে। হাত ধুইয়া সে ঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। একটা পিতলের থালায় পিতার শাকান্ন সাজাইয়া দিয়া কন্যা নিজের জন্য একখানি মাটির সানকিতে ভাত বাড়িয়া লইয়াছে। চাহিয়া চাহিয়া গফুর আস্তে আস্তে কহিল, আমিনা, আমার গায়ে যে আবার শীত করে মা- জ্বরগায়ে খাওয়া কি ভালো?

আমিনা উদ্বিগ্ন মুখে কহিল, কিন্তু তখন যে বললে বড় খিদে পেয়েছে?

তখন? হয়তো জ্বর ছিল না মা।

তাহলে তুলে রেখে দি, সাঁঝের বেলা খেয়ো।

গফুর মাথা নাড়িয়া বলিল. কিন্তু ঠান্ডা ভাত খেলে যে অসুখ বাড়বে আমিনা।

আমিনা কহিল, তবে?

গফুর কত কী যেন চিন্তা করিয়া হঠাৎ এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া ফেলিল; কহিল, এক কাজ কর না মা, মহেশকে না হয় ধরে দিয়ে আয়। তখন রাতের বেলা আমাকে এক মুঠো ফুটিয়ে দিতে পারবি নে আমিনা? প্রত্যুত্তরে আমিনা মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চুপ করি পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তার পরে মাথা নিচু করিয়া ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, পারব বাবা।

গফুরের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। পিতা ও কন্যার মাঝখানে এই যে একটুখানি ছলনার অভিনয় হইয়া গেল, তাহা এই দুটি প্রাণী ছাড়া আরও একজন বোধ করি অন্তরীক্ষে থাকিয়া লক্ষ করিলেন।

পাঁচ সাত দিন পরে এক দিন পীড়িত গফুর চিন্তিত-মুখে দাওয়ায় বসিয়াছিল, তাহার মহেশ কাল হইতে এখন পর্যন্ত ঘরে ফিরে নাই। নিজে সে শক্তিহীন, তাই আমিনা সকাল হইতে সর্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। পড়ন্ত বেলায় সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, শুনেছ বাবা, মানিক ঘোষেরা আমাদের মহেশকে থানায় দিয়েছে।

গফুর কহিল, দুর পাগলি!

হাঁ বাবা, সত্যি, তাদের চাকর বলল, তোর বাপকে বলগে যা দরিয়াপুরের খোঁয়াড়ে খুঁজতে।

কী করেছিল সে?

তাদের বাগানে ঢুকে গাছপালা নস্ট করেছে বাবা। গফুর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মহেশের সম্বন্ধে সে মনে মনে বহু প্রকারের দুর্ঘটনা কল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু ও আশঙ্কা ছিল না। সে যেমন নিরীহ তেমনি গরিব, সুতরাং প্রতিবেশী কেহ তাহাকে এত বড় শাস্তি দিতে পারে এ ভয় তাহার নাই। বিশেষত মানিক ঘোষ। গো-ব্রাহ্মণে ভক্তি তাহার এ অঞ্চলে বিখ্যাত।

মেয়ে কহিল, বেলা যে পড়ে এল বাবা, মহেশকে আনতে যাবে না?

গফুর বলিল, না।

কিন্তু তারা যে বলল তিন দিন হলেই পুলিশের লোক তাকে গোহাটায় বেচে ফেলবে।

গফুর বলিল, ফেলুক গে।

গোহাটা বস্তুটা যে ঠিক কী, আমিনা তাহা জানিত না, কিন্তু মহেশের সম্পর্কে ইহার উল্লেখমাত্রই তাহার পিতা যে কিরূপ বিচলিত হইয়া উঠিত ইহা সে বহুবার লক্ষ করিয়াছে। কিন্তু আজ সে আর কোনো কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

রাত্রের অন্ধকারে লুকাইয়া গফুর বংশীর দোকানে আসিয়া কহিল, খুড়ো,একটা টাকা দিতে হবে। এই বলিয়া সে তাহার পিতলের থালাটি বসিবার মাচার নিচে রাখিয়া দিল। এই বস্তুটির ওজন ইত্যাদি বংশীর সুপরিচিত। বছর দুয়ের মধ্যে সে বার পাঁচেক ইহাকে বন্ধক রাখিয়া একটি করিয়া টাকা দিয়েছে। অতএব আজও আপত্তি করিল না।

পরদিন যথাস্থানে আবার মহেশকে দেখা গেল। সেই বাবলা তলা, সেই দড়ি, সেই খুঁটা, সেই তৃণহীন শূন্য আধার, সেই ধাতুর কালো চোখের সজল উৎসুক দৃষ্টি। একজন বুড়োগোছের মুসলমান তাহাকে অত্যন্ত তীব্র চক্ষু দিয়া পর্যবেক্ষণ করিতেছে। অদূরে একধারে হাঁটু জড় করিয়া গফুর মিঞা চুপ করিয়া বসিয়াছিল। পরীক্ষা শেষ করিয়া বুড়া চাদরের খুঁট হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহার ভাঁজ খুলিয়া বারবার মসৃণ করিয়া তাহার কাছে গিয়ে কহিল, আর ভাঙাব না, এই পুরোপুরিই দিলাম। নাও।

গফুর হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়া তেমনি নিঃশব্দেই বসিয়া রহিল। যে দুই জন লোক সঙ্গে আসিয়াছিল তাহারা গবুর দড়ি খুলিবার উদ্যোগ করিতেই কিন্তু সে অকস্মাৎ সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া উদ্ধতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, দড়িতে হাত দিয়ো না বলছি- খবরদার বলছি, ভালো হবে না!

তাহারা চমকিয়া গেল। বুড়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, কেন? গফুর তেমনি রাগিয়া জবাব দিল, কেন আবার কী! আমার জিনিস আমি বেচব না - আমার খুশি। বলিয়া সে নোটখানি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহারা কহিল, কাল পথে আসতে বায়না নিয়ে এলে যে?

এই নাও তোমাদের বায়না ফিরিয়ে ! বলিয়া সে ট্যাঁক হইতে দুটা টাকা বাহির করিয়া ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিল।

একটা কলহ বাঁধিবার উপক্রম হয় দেখিয়া বুড়ো হাসিয়া ধীরভাবে কহিল, চাপ দিয়া আর দুটা বেশি নেবে, এই তো? দাও হে পান খেতে ওর মেয়ের হাতে দুটো টাকা দাও। কেমন, এই না?

না।

কিন্তু এর বেশি কেউ একটা আধলা দেবে না তা জানো?

গফুর সজোরে মাথা নাড়িয়া কহিল, না।

বুড়ো বিরক্ত হইল, কহিল, না তো কী? চামড়াটাই যে দামে বিকোবে, নইলে মাল আর আছে কি?

তোবা ! তোবা ! গফুরের মুখ দিয়া হঠাৎ একটা কটু কথা বাহির হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই সে ছুটিয়া গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া চিৎকার করিয়া শাসাইতে লাগিল যে, তাহারা যদি অবিলম্বে গ্রাম ছাড়িয়া না যায় তো জমিদারের লোক ডাকিয়া জুতাপেটা করিয়া ছাড়িবে।

হাঙ্গামা দেখিয়া লোকগুলো চলিয়া গেল, কিন্তু কিছুক্ষণেই জমিদার সদর হইতে তাহার ডাক পড়িল। গফুর বুঝিল, এ কথা কর্তার কানে গিয়াছে।

সদরে ভদ্র অভদ্র অনেকগুলি ব্যক্তি বসিয়াছিল। শিববাবু চোখ রাঙা করিয়া কহিলেন, গফুর, তোকে যে আমি কী সাজা দেব ভেবে পাই নে। কোথায় বাস করে আছিস জানিস?

গফুর হাতজোড় করিয়া কহিল, জানি। আমরা খেতে পাই নে, নইলে আজ আপনি যা জরিমানা করতেন আমি না করতাম না।

সকলেই বিস্মিত হইল। এই লোকটা জেদি এবং বদমেজাজি বলিয়াই তাহারা জানিত। সে কাঁদ কাঁদ হইয়া কহিল, এমন কাজ আর কখনও করব না কর্তা। বলিয়া সে নিজের দুই হাত দিয়া নিজের দুই কান মলিল।

শিববাবু সদয়কণ্ঠে কহিলেন, আচ্ছা, যা যা, হয়েছে। আর কখনও এ সব মতিবুদ্ধি করিস নে। বিবরণ শুনিয়া সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন এবং এ মহাপাতক যে শুধু কর্তার পুণ্য প্রভাবে ও শাসন ভয়েই নিবারিত হইয়াছে সে বিষয়ে কাহারও সংশয়মাত্র রহিল না। তর্করত্ন উপস্থিত ছিলেন, তিনি গো শব্দের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করিলেন এবং সে জন্য এই ধর্মজ্ঞানহীনকে গ্রামের ত্রিসীমানায় বসবাস করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ তাহা প্রকাশ করিয়া সকলের জ্ঞাননেত্র বিকশিত করিয়া দিলেন।

গফুর একটা কথারও জবাব দিল না, যথার্থ প্রাপ্য মনে করিয়া অপমান ও সকল তিরস্কার সবিনয়ে মাথা পাতিয়া লইয়া প্রসন্নচিত্তে ঘরে ফিরিয়া আসিল। প্রতিবেশীদের গৃহ হইতে ফ্যান চাহিয়া আনিয়া মহেশকে খাওয়াইল এবং তাহার গায়ে, মাথায় ও শিঙে বারংবার হাত বুলাইয়া অস্ফুটে কত কথাই বলিতে লাগিল।

জ্যৈষ্ঠ শেষ হইয়া আসিল। এমনি দিনে দ্বিপ্রহর বেলায় গফুর ঘরে ফিরিয়া আসিল।

পরের দ্বারে জন মজুর খাটা অভ্যাস নয়, এবং মাত্র দিন চার-পাঁচ তাহার জ্বর থামিয়াছে, কিন্তু দেহ যেমন দুর্বল তেমনি শ্রান্ত। তবুও আজ সে কাজের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রচন্ড রৌদ্রে কেবল তাহার মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, আর কোনো ফল হয় নাই। ক্ষুধায়, পিপাসায় ও ক্লান্তিতে সে প্রায় অন্ধকার দেখিতেছিল, প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ডাক দিল, আমিনা ভাত হয়েছে রে?

মেয়ে ঘর হইতে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া নিরুত্তরে খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইল। জবাব না পাইয়া গফুর চেঁচাইয়া কহিল, হয়েছে ভাত? কী বললি -হয়নি? কেন শুনি?

চাল নেই বাবা।

চাল নেই? সকালে আমাকে বলিসনি কেন?

তোমাকে রাত্তিরে যে বলেছিলুম।

গফুর মুখ ভ্যাঙাইয়া কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া কহিল, রাত্তিরে যে বলেছিলুম। রাত্তিরে বললে কারু মনে থাকে? নিজের কর্কশকণ্ঠে ক্রোধ তাহার দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। মুখ অধিকতর বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, চাল থাকবে কী করে? রোগা বাপ খাক আর নাই খাক, বুড়ো মেয়ে চার বার পাঁচ বার করে ভাত গিলবি ! এবার থেকে চাল আমি কুলুপ বন্ধ করে বাইরে যাব। দে, এক ঘটি জল দে, তেস্টায় বুক ফেটে গেল। বল, তাও নেই।

আমিনা তেমনি অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া গফুর বুঝিল গৃহে তৃষ্ণার জল পর্যন্ত নাই, তখন সে আর আত্মসংবরণ করিতে পারলি না। দ্রুত পদে কাছে গিয়া ঠাস করিয়া সশব্দে তাহার গালে এক চড় কসাইয়া দিয়া কহিল, মুখপোড়া মেয়ে, সারাদিন তুই করিস কী? এত লোক মরে তুই মরিসনে!

মেয়ে কথাটি কহিল না। মাটির শূন্য কলসটি তুলিয়া লইয়া সেই রৌদ্রের মাঝেই চোখ মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। সে চোখের আড়াল হইতেই কিন্তু গফুরের বুকে শেল বিঁধিল। মা-মরা এই মেয়েটিকে সে যে কী করিয়া মানুষ করিয়াছে, সে কেবল সেই জানে। তাহার মনে পড়িল, তাহার এই স্নেহশীলা কর্মপরায়ণা শান্ত মেয়েটির কোনো দোষ নাই। খেতের সামান্য ধান কয়টি ফুরানো পর্যন্ত তাহাদের পেট ভরিয়া দু বেলা অন্ন জুটে না। কোনদিন এক বেলা, কোনোদিন বা তাহাও নয়। দিনে পাঁচ ছয় বার ভাত খাওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি মিথ্যা এবং পিপাসার জল না থাকার হেতুও তাহার অবিদিত নয়। গ্রামে যে দুই তিনটা পুষ্করিণী আছে তাহা একেবারে শুষ্ক। শিবচরণ বাবুর খিড়কির পুকুরে যা একটু জল আছে তা সাধারণে পায় না। অন্যান্য জলাশয়ের মাঝখানে দু-একটা গর্ত খুড়িয়া যা কিছু জল সঞ্চিত হয় তাহাতে যেমন কাড়াকাড়ি, তেমনি ভিড়। বিশেষত মুসলমান বলিয়া এই ছোট মেয়েটা তো কাছেই ঘেঁষিতে পারে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দূরে দাঁড়াইয়া বহু অনুনয় বিনয়ে কেহ দয়া করিয়া যদি তাহার পাত্রে একটু ঢালিয়া দেয় সেই টুকুই সে ঘরে আনে। এ সমস্তই সে জানে। হয়তো আজ জল ছিল না। কিংবা কাড়াকাড়ির মাঝখানে কেহ মেয়েকে তাহার কৃপা করিবার অবসর পায় নাই। এমনিই কিছু একটা হইয়া থাকিবে নিশ্চয় বুঝিয়া তাহার নিজের চোখেও জল ভরিয়া আসিল। এমনি সময়ে জমিদারের পিয়াদা যমদূতের ন্যায় আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া চিৎকার করিয়া ডাকিল, গফরা ঘরে আছিস?

গফুর তিক্ত কণ্ঠে সাড়া দিয়া কহিল, আছি, কেন?

বাবু মশায় ডাকছেন, আয়।

গফুর কহিল, আমার খাওয়া দাওয়া হয়নি, পরে যাব।

এত বড় স্পর্ধা পিয়াদার সহ্য হইল না। সে কুৎসিত একটা সম্বোধন করিয়া কহিল, বাবুর হুকুম মারতে মারতে টেনে নিয়ে যেতে।

গফুর দ্বিতীয় বার আত্মবিস্মৃত হইল। সেও একটা দুর্বাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিল, মহারাণীর রাজত্বে কেউ কারও গোলাম নয়। খাজনা দিয়ে বাস করি, আমি যাব না।

কিন্তু সংসারে এতক্ষুদ্রের অত বড় দোহাই দেওয়া শুধু বিফল নয়, বিপদেরও কারণ। রক্ষা এই যে, এত ক্ষীণকণ্ঠ এত বড় কানে গিয়া পৌঁছায় না। না হইলে তাঁহার মুখের অন্ন ও চোখের নিদ্রা দু-ই ঘুচিয়া যাইত। তাহার পর কী ঘটিল বিস্তারিত করিয়া বলার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ঘণ্টাখানিক পরে যখন সে জমিদারের সদর হইতে ফিরিয়া ঘরে গিয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল তখন তাহার চোখ মুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাহার এত বড় শাস্তির হেতু প্রধানত মহেশ। গফুর বাটী হইতে বাহির হইবার পরে সেও দড়ি ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে এবং জমিদারের প্রাঙ্গণে ঢুকিয়া ফুলগাছ খাইয়াছে, ধান শুকাইতেছিল তাহা ফেলিয়া ছড়াইয়া নষ্ট করিয়াছে, পরিশেষে ধরিবার উপক্রম করায় বাবুর ছোট মেয়েকে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে। এরূপ ঘটনা এই প্রথম নয় ইতিপূর্বেও ঘটিয়াছে, শুধু গরিব বলিয়াই তাহাকে মাফ করা হইয়াছে। পূর্বের মতো এবারও সে আসিয়া হাতে পায়ে পড়িলে হয়তো ক্ষমা করা হইত, কিন্তু সে যে কর দিয়া বাস করে বলিয়া কাহারও গোলাম নয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে-প্রজার মুখে এত বড় স্পর্ধা জমিদার হইয়া শিবচরণবাবু কোনো

মতেই সহ্য করিতে পারেন নাই। সেখানে সে প্রহার ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদ মাত্র করে নাই, সমস্ত মুখ বুজিয়া সহিয়াছে, ঘরে আসিয়া সে তেমনি নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা তাহার মনে ছিল না। কিন্তু বুকের ভিতরটা যেন বাহিরের মধ্যাহ্ন আকাশের মতোই জ্বলিতে লাগিল। এমন কতক্ষণ কাটিল তাহার হুঁশ ছিল না, কিন্তু প্রাঙ্গণ হইতে সহসা তাহার মেয়ের আর্তকণ্ঠ কানে যাইতেই সে সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, আমিনা মাটিতে পড়িয়া এবং তাহার বিক্ষিপ্ত ভাঙা ঘট হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছে। আর মহেশ মাটিতে মুখ দিয়া সেই জল মরুভূমির মতো যেন শুষিয়া খাইতেছে। চোখের পলক পড়িল না, গফুর দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া গেল। মেরামত করিবার জন্য কাল সে তাহার লাঙলের মাথাটা খুলিয়া রাখিয়াছিল। তাহাই দুই হাতে গ্রহণ করিয়া মহেশের অবনত মাথার ওপর সজোরে আঘাত করিল।

একটিবার মাত্র মহেশ মাথা তুলিবার চেষ্টা করিল, তাহার পরে তাহার অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণদেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। চোখের কোণ বাহিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু ও কান বাহিয়া ফোঁটা কয়েক রক্ত গড়াইয়া পড়িল। বার দুই সমস্ত শরীরটা তাহার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তারপরে সম্মুখে ও পশ্চাতে পা দুটা তাহার যতদূর যায় প্রসারিত করিয়া দিয়া মহেশ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। আমিনা কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, কী করলে বাবা, আমাদের মহেশ যে মরে গেল।

গফুর নড়িল না, জবাব দিল না। শুধু নিমিষে চক্ষে আর এক জোড়া নিমেষহীন গভীর কালো চক্ষুর পানে চাহিয়া পাথরের মতো নিশ্চল হইয়া রহিল।

ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে সংবাদ পাইয়া গ্রামান্তের মুচির দল আসিয়া জুটিল। তাহারা বাঁশে বাঁধিয়া মহেশকে ভাগাড়ে লইয়া চলিল। তাহাদের হাতে ধারালো চকচকে ছুরি দেখিয়া গফুর শিহরিয়া চক্ষু মুদিল, কিন্তু একটি কথাও কহিল না।

পাড়ার লোক কহিল, তর্করত্নের কাছে ব্যবস্থা নিতে জমিদার লোক পাঠিয়েছেন, প্রাচিত্তিরের খরচ যোগাতে এবার তোকে না ভিটে বেচতে হয়।

গফুর এ সকল কথারও উত্তর দিল না, কেবল হাঁটুর ওপর মুখ রাখিয়া ঠাঁয় বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে গফুর মেয়েকে তুলিয়া কহিল, আমিনা চল আমরা যাই। সে দাওয়ায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, কোথায় বাবা?

গফুর কহিল, ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে।

মেয়ে আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রহিল। ইতিপূর্বে অনেক দুঃখেও তাহার পিতা কলে কাজ করিতে রাজি হয় নাই। সেখানে ধর্ম থাকে না, এ কথা সে বহুবার শুনিয়াছে।

গফুর কহিল, দেরি করিস নে মা, চল অনেক পথ হাঁটতে হবে।

আমিনা জল খাইবার ঘটি ও পিতার ভাত খাইবার পিতলের থালাটি সঙ্গে লইতেছিল, গফুর নিষেধ করিল, ও সব থাক মা, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে। অন্ধকার গভীর নিশীথে সে মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল। এ গ্রামে আত্মীয় তাহার ছিল না। কাহাকেও বলিবার কিছু নাই। আঙিনা পার হইয়া পথের ধারে সেই বাবলাতলায় আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সহসা হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্র খচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, আল্লাহ ! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখে নি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয় নি, তার কসুর তুমি যেন কখনও মাফ কোরো না।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'মহেশ' গল্পটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'হরিলক্ষ্মী' নামক গল্পগ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। ১৯২৬ সালে 'হরিলক্ষ্মী' প্রথম পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়।

মূলবক্তব্য

'মহেশ' গল্পে সমাজের দরিদ্র ও নিচু স্তরের মানুষের নির্যাতিত জীবনের বেদনার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দরিদ্র গফুর তার প্রিয় ষাঁড় মহেশকে ঠিক মতো খেতে দিতে পারত না। গরুর প্রতি অবহেলার জন্য সে জমিদারের কাছে নির্যাতিত হয়েছে। কিন্তু মহেশকে বেঁধে রাখার জন্য যৎসামান্য সাহায্যও দেয় নি। অভাব অনটনে কসাইয়ের কাছে বিক্রি করতেও তার মন সাড়া দেয় নি। মহেশ দড়ি ছিঁড়ে অন্যের ক্ষতি করায় শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে গফুরকে। শেষ পর্যন্ত রাগে ক্ষুব্ধ হয়ে গফুর মহেশকে আঘাত করে। মহেশ মারা যায়। জমিদারের শাস্তির ভয়ে রাতের আঁধারে মেয়ের হাত ধরে গ্রাম ছেড়ে পাটকলে চলে যায় গফুর।

শব্দার্থ ও টীকা

দ্বিপ্রহর- দুপুর। **ধরিত্রী** - পৃথিবী। **তপ্ত**- গরম। **গোহত্যা**- হিন্দুদের কাছে গরু দেবতা হিসেবে বিবেচ্য। গফুরের গরুটি না খেয়ে মরে গেলে গাঁয়ের হিন্দু জমিদার তা মেনে নেবে না। বরং গো হত্যার দায়ে গফুরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। **চরাই**- নিজে নিজে চরে আসা। **পেটায় নমঃ**- পেটের পূজায় দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ সব খেয়ে ফেলেছে। **রামরাজত্ব**- জনসাধারণের অবাধ বা একচেটিয়া অধিকার হয়েছে এমন রাজত্ব বা শাসন ব্যবস্থা। **অজন্মা**- ফলন না হওয়া অবস্থা। **পাঁজর**- বুকের হাড়। **গোচরটুকু**- গরু চরানোর মাঠটুকু। **গোহাটা** - গরু বেচাকেনার হাট। **অন্তরীক্ষে**- আকাশে। **খোয়াড়**- যেখানে গবাদি পশু আটক করে রাখা হয়। **মহারানী**- মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব। ইংরেজ রাজত্ব, ইংরেজ শাসন আমল। **ভাগাড়**- যেখানে মরা গরু ফেলা হয়। **দাওয়া**- ঘরের বারান্দা। **কুলুপ** - খিল বা খিড়কি, বাড়ির পেছনের দরজা।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'ইস! সাধ করে আবার নাম রাখা হয়েছে মহেশ! হেসে বাঁচি নে!' —তর্করত্নের এ উক্তির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে-

i. বিদ্বেষ ii. বিস্ময়

iii. বিদ্রুপ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. iii

২. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩, ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

গফুর একটা কথারও জবাব দিল না, যথার্থ প্রাপ্য মনে করিয়া অপমান ও সকল তিরস্কার সবিনয়ে মাথা পাতিয়া লইয়া প্রসন্নচিত্তে ঘরে ফিরিয়া আসিল। প্রতিবেশীদের গৃহ হইতে ফ্যান চাহিয়া আনিয়া মহেশকে খাওয়াইল এবং তাহার গায়ে মাথায় ও শিঙে বারংবার হাত বুলাইয়া অস্ফুটে কত কথাই বলিতে লাগিল।

৩. 'গফুর একটা কথারও জবাব দিল না'-কেন?
   ক. অনুশোচনায় খ. ভয়ে
   গ. ক্ষোভে ঘ. দুঃখে

৪. গফুর কোন কথার জবাব দিল না?
   ক. মহেশকে বিক্রির প্রস্তাবে
   খ. অন্যের খেত খাওয়া নিয়ে ঝগড়ায়
   গ. ক্রেতার মহেশকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে
   ঘ. বিচারকার্যে তাকে ভর্ৎসনায়।

৫. 'মহেশ গফুরের সন্তানতুল্য'–এ উক্তিটি নিচের কোন বিবরণের মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে?
   ক. মহেশের জন্য অপমান ও তিরস্কার সহ্য করা
   খ. প্রতিবেশীদের ঘর থেকে ফ্যান এনে মহেশকে খাওয়ানো
   গ. মাথায় ও শিঙে হাত বুলিয়ে অস্ফুটে কথা বলা
   ঘ. কসাই মহেশকে নিতে চাইলে তার প্রতি উদ্ধত আচরণ

৬. গফুর মিঞার বাড়ি কোন গ্রামে?
   ক. কাশিপুর খ. রসুলপুর
   গ. কাশিমপুর ঘ. শিবপুর

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের উদ্ধৃতিটির আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

" 'মহেশ' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি ছোটগল্প। এই গল্পের আর্ট অতি অপূর্ব। ইহাতে মহেশকে কেন্দ্র করিয়া পল্লীসমাজের বহু প্রতিনিধির চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ জমিদার, শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তর্করত্ন, কায়স্থ গৃহস্থ মানিক ঘোষ, গো ব্যবসায়ী কসাই ও গো প্রতিপালক কৃষক গফুর উল্লেখযোগ্য। ইহাদের চরিত্র দুই একটি কথায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আর গফুরের সঙ্গে অন্য সকলের পার্থক্য সর্বত্র দেদীপ্যমান হইয়াছে। বর্ণনার বাহুল্য নাই, বর্ণের প্রাচুর্য নাই, কিন্তু বস্তুত চিত্রটি হইয়াছে সর্বাঙ্গ সুন্দর। "

   ক. 'মহেশ' গল্পের লেখক কে?
   খ. উদ্ধৃতাংশে পল্লী সমাজের বহু প্রতিনিধির চিত্র বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
   গ. অনুচ্ছেদে যে জাতিভেদের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা বর্তমান সমাজে কীভাবে এবং কতটা লক্ষ করা যায়?
   ঘ. 'বর্ণনার বাহুল্য নাই, বর্ণের প্রাচুর্য নাই, কিন্তু বস্তুত চিত্রটি হইয়াছে সর্বাঙ্গ সুন্দর' – উক্তিটি 'মহেশ' গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের অনুচ্ছেদটির আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

গফুর কতক্ষণ চিন্তা করে বলল, "এক কাজ কর না মা, মহেশকে না হয় ধরে দিয়ে আয়। তখন রাতের বেলা আমাকে একমুঠো ফুটিয়ে দিতে পারবি নে, আমিনা?" প্রত্যুত্তরে আমিনা কিছুক্ষণ চুপ থেকে ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে বলল, "পারব বাবা।" গফুরের মুখ রাঙা হয়ে উঠল। তাদের এই ছলনা অন্তরীক্ষের কেউ বোধ হয় লক্ষ করলেন।

   ক. 'মহেশ' গল্পে আমিনা কে?
   খ. গফুরের মুখ রাঙা হয়ে উঠল কেন? –ব্যাখ্যা কর।
   গ. গফুর এখানে এই পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবেলা করতে পারত? যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।
   ঘ. 'তাদের এই ছলনা অন্তরীক্ষের কেউ বোধ হয় লক্ষ করলেন।' –এ অংশের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

জাগো গো ভগিনী

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

[লেখিকা পরিচিতি : বেগম রোকেয়া ৯ই ডিসেম্বর ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জহীরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী ছিলেন। ছোটবেলায় বড় বোন করিমুন্নেসা বেগম রোকেয়াকে বাংলা শিক্ষায় সাহায্য করেন। পরে তিনি বড় ভাই ইব্রাহিম সাবেরের তত্ত্বাবধানে ইংরেজি শেখেন। বিহারের অন্তর্গত ভাগলপুরের সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে বিবাহের পর তিনি বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নামে পরিচিত হন। স্বামীর প্রেরণায় তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। সমকালীন মুসলমান সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি লেখনী ধারণ করেন। মুসলিম নারী জাগরণে তিনি অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল ও আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে তিনি মুসলমান নারীদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেন। পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী, মতিচুর, সুলতানার স্বপ্ন ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ৯ই ডিসেম্বর ১৯৩২ সালে বেগম রোকেয়া মৃত্যুবরণ করেন।]

আমাদের শয়নকক্ষে যেমন সূর্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রুপ মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পারে না। যেহেতু আমাদের উপযুক্ত স্কুল কলেজ এক প্রকার নাই। পুরুষ যত ইচ্ছা অধ্যয়ন করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের নিমিত্ত জ্ঞানরূপ সুধাভাণ্ডারের দ্বার কখনও সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইবে কি? যদি কোনো উদারচেতা মহাত্মা দয়া করিয়া আমাদের হাত ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সহস্র জনে বাধাবিঘ্ন উপস্থিত করেন।

সহস্র জনের বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া এক জনের কাজ নহে। তাই একটু আশার আলোক দীপ্তি পাইতে না পাইতে চির নিরাশার অন্ধকারে বিলীন হয়। স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে অধিকাংশ লোকের কেমন একটা কুসংস্কার আছে যে, তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা শব্দ শুনিলেই শিক্ষার কুফলের একটা ভাবী বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শতদোষ সমাজ অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া থাকে। কিন্তু সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলা দোষ না করিলেও সমাজ কোনো কল্পিত দোষ শতগুণ বাড়াইয়া সে বেচারীর ঐ শিক্ষার ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় এবং শত কণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে স্ত্রীশিক্ষাকে নমস্কার।

আজিকাল অধিকাংশ লোকে শিক্ষাকে কেবল চাকুরি লাভের পথ মনে করে।

মহিলাগণের চাকুরি গ্রহণ অসম্ভব, সুতরাং এই সকল লোকের চক্ষে স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

যাহা হউক, শিক্ষার অর্থ কোনো সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের অন্ধ অনুকরণ নহে। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা দিয়াছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি করাই শিক্ষা। ঐ গুণের সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ। ঈশ্বর আমাদিগকে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মন এবং চিন্তাশক্তি দিয়াছেন। যদি আমরা অনুশীলন দ্বারা হস্তপদ সচল করি, হস্ত দ্বারা সৎকার্য করি, চক্ষু দ্বারা মনোযোগ সহকারে দর্শন করি, কর্ণ দ্বারা মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করি এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিতে শিখি তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আমরা কেবল পাস করা বিদ্যাকে প্রকৃত শিক্ষা বলি না। দর্শনশক্তি বৃদ্ধি বা বিকাশ সম্বন্ধে একটা উদাহরণ দিতেছি :

যেখানে অশিক্ষিত-চক্ষু ধূলি কর্দম ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না, সেখানে শিক্ষিত-চক্ষু অনেক মনোরম চমৎকার বস্তু দেখিতে পায়। আমাদের পদদলিত যে কাদাকে আমরা কেবল মাটি, বালি, কয়লার কালি ও জলমিশ্রিত পদার্থ বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করি, বিজ্ঞানবিদ তাহা বিশ্লিষ্ট করিলে নিম্নলিখিত বস্তু চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইবেন, যথা-বালুকা বিশ্লেষণ করিলে সাদা পাথর বিশেষ, কর্দম পৃথক করিলে চিনে বাসন প্রস্তুতকরণোপযোগী মৃত্তিকা অথবা নীলকান্তমণি; পাথর-কয়লার কালি দ্বারা হীরক এবং জল দ্বারা একবিন্দু নীহার। যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু কর্দম দেখে সেখানে শিক্ষিত চক্ষু হীরামাণিক দেখে । আমরা যে এহেন চক্ষু চির-অন্ধ করিয়া রাখি এ জন্য খোদার নিকট কী উত্তর দিব?

মনে করুন, আপনার দাসীকে আপনি একটা সম্মার্জনী দিয়া বলিলেন, যা আমার অমুক বাড়ি পরিষ্কার রাখিস। দাসী

সম্মার্জনীটা আপনার দান মনে করিয়া অতি যত্নে জরির ওয়াড়ে ঢাকিয়া উচ্চস্থানে তুলিয়া রাখিল- কোনো কাজে ব্যবহার করিল না। এদিকে আপনার বাড়ি ক্রমে আবর্জনাপূর্ণ হইয়া বাসের অযোগ্য হইল। অতঃপর আপনি যখন দাসীর কার্যের হিসাব লইবেন, তখন বাড়ির দুরবস্থা দেখিয়া আপনার মনে কী হইবে? শতমুখী ব্যবহার করিয়া বাড়ি পরিষ্কার রাখিলে আপনি খুশি হইবেন, না তাহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিলে সন্তুষ্ট হইবেন? বিবেক আমাদিগকে আমাদের প্রকৃত অবনতি দেখাইয়া দিতেছে- এখন উন্নতির চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য।

আমাদের উচিত যে, স্বহস্তে দ্বার উন্মুক্ত করি। এক স্থলে আমি বলিয়াছি, 'ভরসা কেবল পতিত পাবন,' কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, উর্ধ্বে হস্ত উত্তোলন না করিলে পতিতপাবনও হাত ধরিয়া তুলিবেন না। ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য করেন, যে নিজে নিজের সাহায্য করে। তাই বলি আমাদের অবস্থা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না, ভাবিলেও তাহাতে আমাদের ষোল আনা উপকার হইবে না।

অনেকে মনে করেন যে, পুরুষের উপার্জিত ধন ভোগ করে বলিয়া নারী তাহার প্রভুত্ব সহ্য করে। কথাটা অনেক পরিমাণে ঠিক। বোধ হয়, স্ত্রীজাতি প্রথমে শারীরিক শ্রমে অক্ষম হইয়া পরের উপার্জিত ধনভোগে বাধ্য হয় এবং সেই জন্য তাহাকে মস্তক নত করিতে হয়। কিন্তু এখন স্ত্রীজাতির মন পর্যন্ত দাস হওয়ায় দেখা যায়, যে স্থলে দরিদ্র স্ত্রীলোকেরা সূচিকর্ম বা দাসীবৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া পতিপুত্র প্রতিপালন করে, সেখানেও ঐ অকর্মণ্য পুরুষেরাই 'স্বামী' থাকে। আবার যিনি স্বয়ং উপার্জন না করিয়া প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করেন, তিনিও তো স্ত্রীর উপর প্রভুত্ব করেন এবং স্ত্রী তাঁহার প্রভুত্বে আপত্তি করে না। ইহার কারণ এই যে, বহুকাল হইতে নারীহৃদয়ের উচ্চ বৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায়, নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিষ্ক, হৃদয়, সবই দাসী হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর আমাদের স্বাধীনতা, ওজস্বিতা বলিয়া কোনো বস্তু নাই এবং তাহা লাভ করিবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত লক্ষিত হয় না! তাই বলিতে চাই :

প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে, জানি! সমাজ মহাগোলযোগ বাঁধাইবে জানি! কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত জাগিতে হইবেই। বলিয়াছি তো, কোনো ভালো কাজ অনায়াসে করা যায় না। কারামুক্ত হইয়াও গ্যালিলিও বলিয়াছিলেন, কিন্তু যাহাই হউক পৃথিবী ঘুরিতেছে। আমাদিগকেও ঐরূপ বিবিধ নির্যাতন সহ্য করিয়া জাগিতে হইবে। তাই বলি, একবার একই সঙ্গে সকলে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হও, সময়ে সবই সহিয়া যাইবে। স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা বুঝিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কী করিলে লুপ্ত রত্ন উদ্ধার হইবে? কী করিলে আমরা দেশের উপযুক্ত কন্যা হইব? প্রথমত সাংসারিক জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলিবার ইচ্ছা অথবা সংকল্প আবশ্যক এবং আমরা যে গোলাম জাতি নই- এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডি-কেরানি হইতে আরম্ভ করিয়া লেডি-ম্যাজিস্ট্রেট, লেডি-ব্যারিস্টার, লেডি-জজ সবই হইব। উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কী নাই? যে পরিশ্রম আমরা স্বামীর গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?

আমরা যদি রাজকীয় কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিব। কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিত করিয়া কার্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক। কার্যক্ষেত্রেও পুরুষের পরিশ্রমের মূল্য বেশি, নারীর কাজ সস্তায় বিক্রয় হয়। অবশ্য কখনও কখনও স্ত্রীলোককে পারিশ্রমিক বেশি পাইতেও দেখা যায়।

যদি বল আমরা দুর্বলভুজা, মূর্খ হীনবুদ্ধি নারী সে দোষ কাহার? আমাদের। আমরা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তাহা হীনতেজ হইয়াছে। এখন অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করিব। যে বাহুলতা পরিশ্রম না করায় হীনবল হইয়াছে, তাহাকে খাটাইয়া সবল করিলে হয় না? এখন একবার জ্ঞানচর্চা করিয়া দেখি তো এই অনুর্বর মস্তিষ্ক সুতীক্ষ্ণ হয় কিনা।

পরিশেষে বলি, আমরা সমাজেরই অর্ধ অঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে ? কোনো এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে ? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে, একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতামাতা উভয়েরই সমান দরকার। কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে-সর্বত্র আমরা যাহাতে তাঁহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক। প্রথমত উন্নতির পথে তাঁহারা দ্রুত বেগে অগ্রসর হইলেন- আমরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম। এখন তাঁহারা উন্নতিরাজ্যে গিয়া দেখিতেছেন সেখানে তাহাদের সঙ্গিনী নাই বলিয়া তাঁহারা একাকী হইয়া আছেন। তাই আবার ফিরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইতেছেন এবং জগতের যে সকল সমাজের পুরুষেরা সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন। আমাদের উচিত যে, তাঁহাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝাবিশেষ না হইয়া আমরা সহচরী, সহকর্মিণী, সহধর্মিণী ইত্যাদি হইয়া তাঁহাদের সহায়তা করি। আমরা অকর্মণ্য পুতুল-জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্টি হই নাই, এ কথা নিশ্চিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'জাগো গো ভগিনী' বেগম রোকেয়ার 'মতিচুর' গ্রন্থের 'স্ত্রীজাতির অবনতি' শীর্ষক নিবন্ধের অংশবিশেষ। এখানে লেখিকা নারীশিক্ষার সপক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন।

মূলবক্তব্য

শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনাকে জাগ্রত করে। এ দেশের অবহেলিত নারীসমাজ শিক্ষার এই সুফল থেকে বঞ্চিত। ফলে তারা নানা নির্যাতনের শিকার হয়ে আছে। নারী জাতিকে অবশ্যই এ হীন অবস্থা থেকে মুক্ত করতে হবে। শিক্ষাই তাদের উন্নতির পথ সুগম করতে পারে। শিক্ষিতা নারী স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের পথ বেছে নিতে পারে। শিক্ষা লাভ করে তারা বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন করবে। বস্তুত নারী বৃহত্তর সমাজেরই অর্ধ অঙ্গ বা অর্ধেক অংশ। নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই সমাজের উন্নতি নিশ্চিত হয়। নারী ও পুরুষের স্বার্থ এক ও অভিন্ন।

শব্দার্থ ও টীকা

সুধাভাণ্ডার- অমৃতভাণ্ডার। **বিভীষিকা**- ভয়ংকর, যা ভয় সৃষ্টি করে। **কর্দম**-কাদা, নরম মাটি। **নীলকান্তমণি**- নীল রঙের মহামূল্যবান পাথর, নীলা। **পতিত পাবন**- যিনি পাপীকে ত্রাণ করেন, বিধাতা। **নীহার**- তুষার, হিমানী, বরফ। **সম্মার্জনী**- ঝাড়ু, ঝাঁটা। **দুর্বলভুজা**- দুর্বল বাহুবিশিষ্ট, এখানে শারীরিক দিক থেকে দুর্বলকে বোঝানো হয়েছে। **ওজস্বিতা** - তেজস্বিতা।

স্ত্রী শিক্ষাকে নমস্কার- এ উক্তিটি ব্যঙ্গার্থক। স্ত্রীশিক্ষাকে 'নমস্কার' জানানোর মধ্য দিয়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন নেই এ কথাই বলা হয়েছে। আমাদের সমাজে শিক্ষিতা নারীর সামান্য দোষত্রুটিকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেখা হয়। অপরদিকে, অশিক্ষিতা নারীর দোষ-ত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে, যারা নারী শিক্ষার বিরোধিতা করেন তারাই শিক্ষিতা নারীর দোষত্রুটির প্রতি কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করেন।

পাসকরা বিদ্যাকে প্রকৃত শিক্ষা বলি না- নারী শিক্ষার সপক্ষে বলতে গিয়ে লেখিকা পাসকরা বিদ্যা বা সার্টিফিকেট লাভকে শিক্ষার লক্ষ্যবস্তু হিসেবে গণ্য করতে সম্মত নন। নারী জাতি শিক্ষার মধ্য দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করবে। পরানুকরণ মানুষের সৃজনশীলতা বা চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করে না। নারী জাতি প্রকৃত শিক্ষা লাভ করে সৃজনশীল সত্তার বিকাশে প্রয়াসী হবে। তারা দেশ ও জাতির উন্নতির পথে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

অতএব, জাগো, জাগো গো ভগিনী- এ উক্তিটির মধ্য দিয়ে নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার জীবনব্যাপী সাধনার মর্মবাণীই ঘোষিত হয়েছে। তাঁর দৃষ্টিতে, নারী জাতি আত্মশক্তিতে বলীয়ান নয়। তাদের মধ্যে বিরাজ করছে এক ধরনের দাস মনোভাব। বহুকাল ধরে নারীহৃদয়ের উচ্চবৃত্তিগুলো বিনষ্ট হওয়ায় তাদের মস্তিষ্ক ও হৃদয় দাসী হয়ে পড়েছে। এ হীন অবস্থা কাম্য হতে পারে না। অতএব, নারীকে জেগে উঠতেই হবে। এই জাগরণের পথে নানা বাধা আসবে। নারীকে অবশ্যই সে বাধা অতিক্রম করতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নারীজাতি জেগে উঠলে সবচেয়ে বেশি কল্যাণ সাধিত হবে–
ক. নারীদের খ. পুরুষদের
গ. সমাজের ঘ. পরিবারের

২. বেগম রোকেয়া নারীর 'স্বাধীনতা' বলতে বুঝিয়েছেন
ক. অর্থ উপার্জন করা খ. পুরুষের অধীনস্ত না থাকা
গ. বিবেক জাগ্রত করা ঘ. পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা

নিচের অংশটুক পড় এবং ৩, ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ব্রিটিশ-ভারতে বঙ্গীয় মুসলমান নারীসমাজ ছিল অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধের নিগড়ে আবদ্ধ। নিরক্ষরতা, অশিক্ষা ও সামাজিক ভেদ বুদ্ধিও ছিল তাদের জন্য নিয়তির মতো সত্য। অবরুদ্ধ জীবনযাপনে অভ্যস্ত এক অসহায় জীবে তারা পরিণত হয়েছিল। শিক্ষা গ্রহণ ও জীবিকা অর্জনের মধ্য দিয়ে যে স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব - এ বিষয়টি তাদের কাছে ছিল একেবারেই অজ্ঞাত।

৩. নারীর এই অসহায় পরিস্থিতির জন্য মূলত দায়ী–
ক. নারী নিজেরাই খ. পুরুষেরা
গ. ব্রিটিশ শাসন ঘ. সমাজের নীতিনির্ধারক

৪. অনুচ্ছেদটিতে 'অবরুদ্ধ জীবনযাপন' বলতে বোঝানো হয়েছে–
i. শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া
ii. জীবিকা নির্বাহের সুযোগ না থাকা
iii. নেতৃত্বের সুযোগ না থাকা

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত জীবিকার সঙ্গে স্বাধীনতার সম্পর্ক–
i. কর্তৃত্ব নির্ধারণে ii. মর্যাদা বৃদ্ধিতে
iii. একাধিপত্য নির্ধারণে

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

'যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু ধূলি কর্দম ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না, সেখানে শিক্ষিত চক্ষু অনেক মনোরম চমৎকার বস্তু দেখিতে পায়। আমাদের পদদলিত যে কাদাকে কেবল মাটি, বালি, কয়লার কালি ও জলমিশ্রিত পদার্থ বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করি, বিজ্ঞানবিদ তাহা বিশ্লিষ্ট করিলে নিম্নলিখিত বস্তু চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইবেন, যথা- বালুকা বিশ্লেষণ করিলে সাদা পাথর বিশেষ, কর্দম পৃথক করিলে চিনে বাসন প্রস্তুত-করণোপযোগী মৃত্তিকা অথবা নীলকান্তমণি; পাথর-কয়লার কালি দ্বারা হীরক এবং জল দ্বারা একবিন্দু নীহার। যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু কর্দম দেখে সেখানে শিক্ষিত চক্ষু হীরামাণিক দেখে।'

ক. নীলকান্তমণি কী?
খ. শিক্ষিত চোখ ও অশিক্ষিত চোখের দৃষ্টিসীমার পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্ধৃতিটির আলোকে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তির স্বরূপ তুলে ধর।
ঘ. 'যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু কর্দম দেখে সেখানে শিক্ষিত চক্ষু হীরামাণিক দেখে।' – এ উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

পল্লীসাহিত্য

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

[লেখক পরিচিতি : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১০ই জুলাই ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার পেয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯১০ সালে কলকাতা সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে বি.এ. অনার্স পাস করেন। ১৯১২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্যারিসের সোরবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে ডিপ্লোমা এবং ডি.লিট.লাভের গৌরব অর্জন করেন। তিনি সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল বাংলাদেশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষরূ পে নিয়োজিত ছিলেন। অসামান্য প্রতিভাধর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছিলেন সুপণ্ডিত ও ভাষাবিদ। তিনি ছিলেন মুক্তবুদ্ধির অধিকারী। প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে দুরূহ ও জটিল সমস্যার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে তিনি অসামান্য পান্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত, বাংলা সাহিত্যের কথা (দুই খন্ড) এবং বাংলা ভাষার ব্যাকরণ তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাঁর অন্যতম কালজয়ী সম্পাদনা গ্রন্থ 'বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান'। তিনি আলাওলের 'পদ্মাবতী', 'বিদ্যাপতি শতক'সহ আরও অনেক গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। শিশু পত্রিকা 'আঙুর' তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া পাঠ্যপুস্তক অনুবাদ, এবং নানা মৌলিক রচনায় তিনি তাঁর দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। ১৩ই জুলাই ১৯৬৯ সালে ঢাকায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র জীবনাবসান ঘটে।]

পল্লীগ্রামে শহরের মতো গায়ক, বাদক, নর্তক না থাকলেও তার অভাব নেই। চারদিকে কোকিল, দোয়েল, পাপিয়া প্রভৃতি পাখির কলগান, নদীর কুল কুল ধ্বনি, পাতার মর্মর শব্দ, শ্যামল শস্যের ভঙ্গিময় হেলাদুলা প্রচুর পরিমাণে শহরের অভাব এখানে পূর্ণ করে দিচ্ছে। পল্লীর ঘাটে মাঠে, পল্লীর আলোবাতাসে, পল্লীর প্রত্যেক পরতে পরতে সাহিত্য ছড়িয়ে আছে। কিন্তু বাতাসের মধ্যে বাস করে যেমন আমরা ভুলে যাই বায়ু-সাগরে আমরা ডুবে আছি, তেমনি পাড়াগাঁয়ে থেকে আমাদের মনেই হয় না যে কত বড় সাহিত্য ও সাহিত্যের উপকরণ ছড়িয়ে আছে।

শ্রদ্ধেয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন 'মৈমনসিংহ গীতিকা' সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন, সাহিত্যের কী এক অমূল্য খনি পল্লীজননীর বুকের কোণে লুকিয়ে আছে। সুদূর পশ্চিমের সাহিত্যরসিক রোঁমা রোঁলা পর্যন্ত ময়মনসিংহের মদিনা বিবির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। মনসুর বয়াতির মতো আরও কত পল্লীকবি শহুরে চক্ষুর অগোচরে পল্লীতে আত্মগোপন করে আছেন, কে তাঁদের সাহিত্যের মজলিসে এনে জগতের সঙ্গে চেনাশোনা করিয়ে দেবে? আজ যদি বাংলাদেশের প্রত্যেক পল্লী থেকে এইসব অজানা অচেনা কবিদের গাথা সংগ্রহ করে প্রকাশ করা হত, তাহলে দেখা যেত বাংলার মুসলমানও সাহিত্য সম্পদে কত ধনী। কিন্তু হায় ! এ কাজের জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল কই?

আমরা পল্লীগ্রামে বুড়োবুড়ির মুখে কোনো ঝিল্লীমুখর সন্ধ্যাকালে যেসব কথা শুনতে শুনতে ছেলেবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছি, সেগুলি না কত মনোহর! কত চমকপ্রদ ! আরব্য উপন্যাসের আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ, আলিবাবা ও চল্লিশ দস্যু প্রভৃতির চেয়ে পল্লীর উপকথাগুলোর মূল্য কম নয়। আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোতে সেগুলো বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। এখনকার শিক্ষিত জননী সন্তানকে আর রাখালের পিঠা গাছের কথা, রাক্ষসপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যার কথা বা পঙ্খিরাজ ঘোড়ার কথা শুনান না, তাদের কাছে বলেন আরব্য উপন্যাসের গল্প কিংবা Lamb's Tales from Shakespeare-এর গল্পের অনুবাদ। ফলে কোনো সুদূর অতীতের সাক্ষীস্বরূপ এই রূপকথা নষ্ট হয়ে অতীতের সঙ্গে আমাদের সমবন্ধ লোপ করে দিচ্ছে। যদি আজ বাংলার সমস্ত রূপকথা সংগৃহীত হত, তবে কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করে দেখিয়ে দিতে পারতেন যে, বাংলার নিভৃত কোণের কোনো কোনো পিতামহী মাতামহীর গল্প ভারতীয় উপমহাদেশের অন্য প্রান্তে কিংবা ভারত উপমহাদেশের বাইরে সিংহল, সুমাত্রা, যাভা, কম্বোডিয়া প্রভৃতি স্থানে এমনিভাবে প্রচলিত আছে। হয়তো এশিয়ার বাইরে ইউরোপখন্ডে লিথোনিয়া কিংবা ওয়েলসের কোনো পল্লীরমণী এখনও হুবহু বা কিছু রূপান্তরিতভাবে সেই উপকথাগুলো তার ছেলেপুলে বা নাতি-পোতাকে শোনাচ্ছে। কে আছে এই উপকথাগুলো সংগ্রহ করে তাদের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে? ইউরোপ, আমেরিকা দেশে বড় বড়

বিদ্বানদের সভা আছে, যাকে বলা হয় Folklore Society। তাদের কাজ হচ্ছে এইসব সংগ্রহ করা এবং অন্য সভ্য দেশের উপকথার সঙ্গে সাদৃশ্য নিয়ে বিচার করা। এগুলো নৃতত্ত্বের মূল্যবান উপকরণ বলে পণ্ডিত সমাজে গৃহীত হয়। শ্রীযুত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' বা 'ঠাকুরদার থলে' যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশের সমস্ত উপকথাগুলো এক জায়গায় জড় করলে বিশ্বকোষের মতো কয়েক বালামে তার সংকুলান হত না।

আমরা Shakespeare-এ পড়েছি রাক্ষসদের বাঁধা বুলি হচ্ছে Fi, fie, foh, fun! I smell the blood of a British man- এর সঙ্গে তুলনা কর পল্লীর 'হাউ, মাউ, খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ'! এ সাদৃশ্য হল কোথা থেকে? তবে কি একদিন ঐ সাদা ইংরেজ ও এই কালো বাঙালির পূর্ব পুরুষগণ ভাই ভাই রূপে একই তাঁবুর নিচে বাস করত? সে আজ কত দিনের কথা কে জানে? আমরা কথায় কথায় প্রবাদ বাক্য জুড়ে দিই- যেমন 'দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা নেই', 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি', 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম', এই রকম আরও কত কী! তারপর ডাকের কথা আছে, খনার বচন আছে।
যেমন ধরুন-

কলা রুয়ে না কেটো পাত,
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।

প্রবাদ বাক্যে এবং ডাক ও খনার বচনে কত যুগের ভূয়োদর্শনের পরিপক্ক ফল সঞ্চিত হয়ে আছে, কে তা অস্বীকার করতে পারে? শুধু তাই নয়, জাতির পুরনো ইতিহাসের অনেক গোপন কথাও এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

আমরা আজও বলি-'পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর।' এই প্রবাদ বাক্যটি সেই সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়, যখন পাণ্ডুয়া বঙ্গের রাজধানী ছিল। কে এই প্রবাদ বাক্য, ডাক, খনার বচনগুলি সংগ্রহ করে তাদের চিরকাল জীবন্ত করে রাখবে?
তারপর ধরুন, ছড়ার কথা। কথায় কথায় ছেলেমেয়েগুলো ছড়া কাটতে থাকে। রোদের সময় বৃষ্টি হচ্ছে, অমনি তারা সমস্বরে ঝংকার দিয়ে ওঠে-

রোদ হচ্ছে, পানি হচ্ছে,
খেঁকশিয়ালীর বিয়ে হচ্ছে।

এর সঙ্গে সঙ্গে মনে করুন মায়ের সেই ঘুমপাড়ানী গান, সেই খোকা-খুকির ছড়া। এগুলি সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস, কিন্তু আজ দুঃখে দৈন্যে প্রাণে সুখ নেই। ছড়াও ক্রমে লোকে ভুলে যাচ্ছে। কে এগুলিকে বইয়ের পাতায় অমর করে রাখবে?

শুধু ছড়া কেন? খেলাধুলার না কত বাঁধা গৎ আছে বা ছিল আমাদের এ দেশে। যখন ফুটবল, ব্যাটবলের নাম কারও জানা ছিল না, তখন কপাটি খেলার খুব ধুম ছিল। সে খেলার সঙ্গে কত না বাঁধা বুলি ছেলেরা ব্যবহার করত-

এক হাত বোল্লা বার হাত শিং
উড়ে যায় বোল্লা ধা তিং তিং।

বিদেশি খেলার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে এসব লোপ পাবার উপক্রম হয়েছে। কে এদের বাঁচিয়ে রাখবে?
তারপর ধরুন, পল্লীগানের কথা। পল্লীসাহিত্য সম্পদের মধ্যে এই গানগুলি অমূল রত্ন বিশেষ। সেই জারি গান, সেই ভাটিয়ালি গান, সেই রাখালি গান, মারফতি গান—গানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার পল্লীর ঘাটে, মাঠে ছড়ানো রয়েছে। তাতে কত প্রেম, কত আনন্দ, কত সৌন্দর্য, কত তত্ত্বজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। শহুরে গানের প্রভাবে সেগুলো এখন বর্বর চাষার গান বলে ভদ্রসমাজে আর বিকায় না। কিন্তু-

মনমাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি আর বাইতে পারলাম না।

এই গানটির সঙ্গে আপনার শহুরে গানের কোনো তুলনা হতে পারে? কিন্তু ধারাবাহিকরূপে সেগুলো সংগ্রহের জন্য কোনো চেষ্টা হচ্ছে কি?

এ পর্যন্ত যা বললাম সেগুলো হচ্ছে পল্লীর প্রাচীন সম্পদ। সাহিত্যের ভাণ্ডারে দান করবার মতো পল্লীর নতুন সম্পদেরও অভাব নেই। আজকাল বাংলাসাহিত্য বলে যে সাহিত্য চলছে, তার পনেরো আনা হচ্ছে শহুরে সাহিত্য, সাধু ভাষায় বলতে গেলে নাগরিক সাহিত্য। সে সাহিত্যে আছে রাজ-রাজড়ার কথা, বাবু-বিবির কথা, মোটরগাড়ির কথা, বিজলি বাতির কথা, সিনেমা থিয়েটারের কথা, চায়ের বাটিতে ফুঁ দেবার কথা। এইসব কথা নিয়ে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক রাশি রাশি লেখা হচ্ছে। পল্লীর গৃহস্থ কৃষকদের, জেলে-মাঝি, মুটে-মজুরের কোনো কথা তাতে ঠাঁই নাই। তাদের সুখ-দুঃখ, তাদের পাপ-পুণ্য, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথায় কজন মাথা ঘামাচ্ছে? আমাদের বিশ্ববরেণ্য কবিসম্রাটও একবার 'এবার ফিরাও মোরে' বলে আবার পুরানো পথে নাগরিক সাহিত্য নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। ধানগাছে তক্তা হয় কিনা, এখন শহুরে লোকেরা এটা জানলেও পাড়াগাঁয়ের জীবন তাদের কাছে এক অজানা রাজ্য। সেটা কারো কাছে একেবারে পচা জঘন্য, আর কারো কাছে একেবারে চাঁদের জ্যোৎস্না দিয়ে ঘেরা। তাঁরা পল্লীর মর্মকথা কী করে জানবেন? কী করেই বা তার মুখচ্ছবিখানি আঁকবেন? আমাদের আজ দরকার হয়েছে শহুরে সাহিত্যের বালাখানার পাশে গেঁয়ো সাহিত্যের জোড়াবাংলা ঘর তুলতে। আজ অনেকের আত্মা ইট-পাথর ও লোহার কৃত্রিম বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে মাটির ঘরে মাটির মানুষ হয়ে থাকতে চাচ্ছে। তাদের জন্য আমাদের কিছু গড়াগাঁথার দরকার আছে। ইউরোপ, আমেরিকায় আজ এই Proletariat সাহিত্য ক্রমে আদরের আসন পাচ্ছে, আমাদের দেশেও পাবে। কিন্তু কোথায় সে পল্লীর কবি, ঔপন্যাসিক ও সাহিত্যিক, যাঁরা নিখুঁতভাবে এই পল্লীর ছবি শহরের চশমা-আঁটা চোখের সামনে ধরতে পারবেন?

এই সমস্ত রূপকথা, পল্লীগাথা, ছড়া প্রভৃতি দেশের আলোবাতাসের মতো সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি। তাতে হিন্দু মুসলমান কোনো ভেদ নেই। যেরূপ মাতৃস্তন্যে সন্তান মাত্রেরই অধিকার, সেরূপ এই পল্লীসাহিত্যে পল্লীজননীর হিন্দু মুসলমান সকল সন্তানেরই সমান অধিকার।

এক বিরাট পল্লীসাহিত্য বাংলায় ছিল। তার কঙ্কালবিশেষ এখনও কিছু আছে, সময়ের ও রুচির পরিবর্তনে সে অনাদৃত হয়ে ধ্বংসের পথে দাঁড়িয়েছে। নেহাত সেকেলে পাড়াগাঁয়ের লোক ছাড়া সেগুলোর আর কেউ আদর করে না। কিন্তু একদিন ছিল যখন নায়ের দাঁড়ি-মাঝি থেকে গৃহস্থের বউ-ঝি পর্যন্ত, বালক থেকে বুড়ো পর্যন্ত, আমির থেকে গরিব পর্যন্ত সকলকেই এগুলো আনন্দ উপদেশ বিলাতো। যদি পল্লীসাহিত্যের দিকে পল্লীজননীর সন্তানেরা মনোযোগ দেয়, তবেই আমার মনে হয় এরূপ পল্লীসাহিত্য সভার আয়োজন সার্থক হবে, নচেৎ এ সকল কেবলি ভুয়া, কেবলি ফক্কিকার।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে কিশোরগঞ্জ জেলায় 'পূর্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনী'র একাদশ অধিবেশনে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সভাপতিত্ব করেন। এ সম্মেলনে সভাপতি হিসাবে তিনি যে অভিভাষণ দেন তারই পুনর্লিখিত রূপ এই 'পল্লীসাহিত্য' প্রবন্ধটি।

মূলবক্তব্য

আলোচ্য প্রবন্ধে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলার পল্লীসাহিত্যের বিশেষ কয়েকটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। লেখক এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, একদিন এক বিরাট পল্লীসাহিত্য বাংলাদেশে ছিল, আজ উপযুক্ত গবেষক এবং আগ্রহী সাহিত্যিকদের উদ্যোগ ও চেষ্টায় সেই সম্পদগুলো সংগ্রহ করবার নিতান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং প্রসারের জন্য পল্লীসাহিত্যের বিচিত্র সম্পদ বিশেষ যত্নের সঙ্গে আহরণ করা একান্ত আবশ্যক।

শব্দার্থ ও টীকা

কলগান- শ্রুতিমধুর ধ্বনি। **পরতে পরতে**- স্তরে স্তরে। **ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন**- বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষক ও সাধক দীনেশচন্দ্র সেন মানিকগঞ্জ জেলার বগজুরী গ্রামে ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে তিনিই সর্বপ্রথম 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের গৌরব ও মর্যাদা সাহিত্যের দরবারে তুলে ধরেন।

তাঁরই সুযোগ্য সম্পাদনায় চন্দ্রকুমার দে কর্তৃক সংগৃহীত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' এবং 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। দীনেশচন্দ্র সেনের মৌলিক গ্রন্থগুলোর মধ্যে রামায়ণী কথা, বৃহৎবঙ্গ, বেহুলা, ফুল্লরা, জড়ভরত ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। **রোঁমা রোঁলা**- (Roman Rolland) ফরাসি দেশের কালজয়ী সাহিত্যিক ও দার্শনিক। রোঁমা রোঁলার জন্ম ২৯শে জানুয়ারি ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে। 'জাঁ ক্রিস্তফ' তাঁর অমূল্য কীর্তি। এ গ্রন্থের জন্য তিনি ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৩৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

মদিনা বিবি- মৈমনসিংহ গীতিকায় অন্তর্ভুক্ত লোকগাথা 'দেওয়ানা-মদিনা'র নায়িকা।

মনসুর বয়াতি- 'দেওয়ানা-মদিনা' লোকগাথার প্রখ্যাত কবি।

আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ- আরব্য উপন্যাসের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক গল্প 'আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ'। এ গল্পটির ঘটনাস্থল চীন দেশ। আলাউদ্দিন নামের এক সাহসী তরুণ এক চতুর জাদুকরের বিস্ময়কর প্রদীপ লাভ করে। আলাউদ্দিন ছিল গরিব এক দুঃখিনী মায়ের একমাত্র ছেলে। এ প্রদীপে ঘষা দিলেই এক মহাশক্তিধর দৈত্য এসে হাজির হত এবং আলাউদ্দিনের আদেশ অনুযায়ী অলৌকিক কাজ করত। এভাবেই এ প্রদীপের বদৌলতে আলাউদ্দিন প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হয়। মায়ের দুঃখও দূর হয়।

আলিবাবা ও চল্লিশ দস্যু- আরব্য উপন্যাসের অন্যতম বিখ্যাত গল্প। গরিব কাঠুরে আলিবাবা ভাগ্যক্রমে পাহাড়ের গুহায় দস্যুদলের গুপ্ত ধনভাণ্ডারের সন্ধান পায়। সেখান থেকে প্রচুর ধনরত্ন এনে সে বাড়িতে রাখে। দস্যুদল আলিবাবার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করে। আলিবাবা তার বুদ্ধিমতী বাঁদি মর্জিনার সহায়তায় এই দস্যুদলকে কাবু করে।

Lamb's Tales from Shakespeare- বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজি নাট্যকার ও কবি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের নাটকগুলো চার্লস ল্যাম্ব সহজ ভাষায় কিশোরদের উপযোগী করে রূপান্তর করেন। সেই গ্রন্থেরই উল্লেখ এখানে করা হয়েছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক- পুরাতত্ত্ববিদ। যিনি প্রাচীন লিপি, মুদ্রা বা ভগ্নাবশেষ থেকে পুরাকালের তথ্য নির্ণয় করেন।

Folklore Society- যে সমিতি লোকশিল্প ও গান, উৎসব-অনুষ্ঠান ও খেলাধুলার উপাদান সংগ্রহ করে এবং প্রচারের জন্য নানা কাজ করে থাকে। এ সমিতি লোকসাহিত্য সংরক্ষণ ও গবেষণার কাজে নিয়োজিত। উইলিয়াম থমস ফোকলোর কথাটির উদ্ভাবক। ১৮৪৮ সালে সর্বপ্রথম লন্ডনে এই সমিতি গঠিত হয়।

নৃতত্ত্ব (Anthropology) - মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞান।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার- প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক ও বাংলার লোকগাথা ও রূপকথার রূপকার দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের জন্ম ১২৮৪ বঙ্গাব্দে, মৃত্যু ১৩৬৩ সালে। তিনি বাংলার নানা অঞ্চল ঘুরে বহু পরিশ্রম করে রূপকথা সংগ্রহ করেন। তাঁর রচিত 'ঠাকুরমার ঝুলি' শিশুদের প্রিয় বই।

প্রবাদ বাক্য- দীর্ঘদিন ধরে লোকমুখে প্রচলিত বিশ্বাসযোগ্য কথা বা জনশ্রুতি, যেমন, 'নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা'।

খনা- প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত মহিলা জ্যোতিষী। বাংলাদেশের জলবায়ু নির্ভর কৃষিতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশমূলক খনার ছড়াগুলো অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে রচিত বলে ধারণা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত বারাসত মহকুমার দেউলি গ্রামে তাঁর নিবাস ছিল বলে জনশ্রুতি আছে।

বালাম- বইয়ের খণ্ড, ইংরেজি Volume। **ভূয়োদর্শন–** প্রচুর দেখা ও শোনার মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা। **বালাখানা**- প্রাসাদ। **Proletariat সাহিত্য** -অত্যাচারিত শ্রমজীবী দুঃখী মানুষের সাহিত্য। **ফক্কিকার**- ফাঁকিবাজি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'কিন্তু হায়! এ কাজের জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল কই?' পল্লীসাহিত্য সংগ্রহের কাজে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর এ হতাশা দূর হতে পারে –

i. পল্লীসাহিত্য সভার আয়োজন করে
ii. ফোকলোর সোসাইটি স্থাপন করে
iii. জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i, ii খ. ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২। 'পল্লীসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক ঘুমপাড়ানী গান ও খোকা-খুকির ছড়া সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন 'এগুলি সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস' কারণ:

i. ভাষা ও ছন্দ প্রাণবন্ত
ii. শিশুদের কাছে প্রিয়
iii. বিষয়বস্তু বৈচিত্র্যপূর্ণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i, ii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩। 'বাংলাদেশের উপকথাগুলো এক জায়গায় জড় করলে বিশ্বকোষের মতো কয়েক বালামে তার সংকুলান হত না'– এ অংশে উপকথার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা হল :

ক. জনপ্রিয়তা অনুধাবন খ. প্রগাঢ়তা
গ. সরসতা ঘ. বিপুলতা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

পল্লীসাহিত্যে বাংলার সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক, মনোবৈজ্ঞানিক এমন কি ঐতিহাসিক উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এই বিপুল পল্লীসাহিত্য আজ বিলুপ্ত প্রায়। আজ এর ব্যাপক উদ্ধার ও সংরক্ষণ প্রয়োজন। শিক্ষিত শিষ্ট সমাজের নাগরিক সাহিত্যের পাশাপাশি এই সাহিত্যকে স্থান করে দিতে পারলেই আমাদের সামগ্রিক সাহিত্যের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

ক. পল্লীসাহিত্য কাকে বলে?

খ. পল্লীসাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের পরিতাপের কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. উদাহরণসহ পল্লীসাহিত্যের সামাজিক উপাদান ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নাগরিক সাহিত্যের পাশাপাশি পল্লীসাহিত্যকে স্থান করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ কর।

উদ্যম ও পরিশ্রম

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

[লেখক পরিচিতি : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে মাগুরা জেলার পারনান্দুয়ালী গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস যশোর জেলার হাজীগ্রামে। লুৎফর রহমান এফ.এ. পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। তিনি প্রথমে শিক্ষক এবং পরে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করেন। নারী সমাজের উন্নতির জন্য 'নারীতীর্থ' নামে সেবা প্রতিষ্ঠান গঠন এবং 'নারীশক্তি' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি চিন্তাশীল ও যুক্তিবাদী প্রাবন্ধিক হিসেবে খ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ সহজবোধ্য কিন্তু ভাবগম্ভীর। তিনি মহৎ জীবনের লক্ষ্যে সাহিত্যের মাধ্যমে মহৎ চিন্তাচেতনায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। গভীর জীবনবোধ, মানবিক মূল্যবোধ এবং আতসম্মান ও মর্যাদার প্রতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর রচনার প্রসাদগুণ। উন্নত জীবন, মহৎ জীবন, উচ্চ জীবন, সত্য জীবন, মানব জীবন, প্রীতি উপহার প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। প্রবন্ধ ছাড়াও তিনি কবিতা, উপন্যাস ও ছোটদের বই রচনা করেছেন। ১৯৩৬ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।]

চাকরি করা কাজ উত্তম, যখন তা হয় জাতির সেবা- যখন তাতে মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয় না। যখন জীবন ধারণের সম্বল হয়ে পড়ে চাকরি- যখন সেটাকে দেশ-সেবা বলে মনে হয় না, তখন তা কোরো না। সত্য ও আইন অপেক্ষা উপরিস্থ কর্মচারীকে যদি বেশি মানতে হয়, তা হলে সরে পড়। প্রভুর সামনে যদি মনের বল না থাকে, কঠিনভাবে সত্য বলতে না পার, প্রয়োজন হলেই চাকরি ছেড়ে দেবার সঙ্গতি না থাকে-তা হলে বুঝব চাকরি করে তুমি পাপ করেছ।

মনের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে না পারলে তোমাতে ও পশুতে প্রভেদ থাকবে না- জীবন তোমার মিথ্যা হবে। স্বাধীন-হৃদয়, সত্যের সেবক কামার হও, সেও ভালো। নিজকে যন্ত্র করে ফেলো না।

সৎ, জ্ঞানী ও মহৎ যিনি, তিনি নিজকে ব্যক্তিত্বহীন করতে ভয়ংকর লজ্জা বোধ করেন। তিনি তাতে পাপ বোধ করেন।

চাকরি করে অন্যায় পয়সায় ধনী হবার লোভ রাখ? তোমার চেয়ে মুদি ভালো। মুদির পয়সা পবিত্র। অনেক যুবক থাকতে পারে, যারা মনে করে কোনোরকম একটা চাকরি সংগ্রহ করে সমাজের ভেতরে আসন প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই হল। চুরির সাহায্যেই হোক বা অসৎ উপায় অবলম্বন করেই হোক, ক্ষতি নেই।

চরিত্র তোমার নিষ্কলঙ্ক- সামান্য কাজ করে পয়সা উপায় কর, তাতে জাত যাবে না। চুরি অন্যায়ের সাহায্যে যে বাঁচতে চেষ্টা করে, তারই জাত যায়, অসৎ উপায়ে আয় কোরো না, মিথ্যার আশ্রয় নিও না। লোককে কায়দায় ফেলে অর্থ সংগ্রহ করতে তুমি ঘৃণা বোধ কোরো।

ইউরোপের জ্ঞানগুরু প্লেটো মিসর ভ্রমণকালে মাথায় করে তেল বেচে রাস্তা-খরচ যোগাড় করতেন। যে কুঁড়ে, আলসে, ঘুষখোর ও চোর, সেই হীন। ব্যবসা বা ছোট স্বাধীন কাজে মানুষ হীন হয় না- হীন হয় মিথ্যা চতুরতা ও প্রবঞ্চনায়। পাছে জাত যায়, সম্মান নষ্ট হয়- এই ভয়ে পরের গলগ্রহ হয়ে মাসের পর মাস কাটিয়ে দিচ্ছ? সম্মান কোথায়, তা তুমি টের পাওনি?

সৎ উপায়ে যে পয়সা উপায় করা যায় তাতে তোমার আত্মার পতন হবে না। তোমার আত্মার পতন হবে আলস্য ও অসাধুতায়। তোমারই স্পর্শে কাজ গৌরবময় হবে।

আমাদের দেশের লোক যেমন আজকাল বিলেতে যায় এক কালে তেমনি করে বিলেতের লোক গ্রিস ভ্রমণে যেত।

বিলেত-ফেরত লোককে কেউ ইট টেনে বা কুলির কাজ করে পয়সা উপায় করতে দেখেছে?

বিলেতের এক পণ্ডিত দেশভ্রমণ দ্বারা অগাধ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন- গ্রিকদেশ থেকে ফিরে এসে তিনি আরম্ভ করলেন এমন কাজ- যা তুমি আমি করতে লজ্জাবোধ করব। তাতে কি তাঁর জাত গিয়েছিল? যার মধ্যে জ্ঞান ও গুণ আছে, সে কয়দিন নিচে পড়ে থাকে? লোকে তাকে সম্মান করে উপরে টেনে তোলেই।

কাজে মানুষের জাত যায় না- এটা বিশ্বাস করতে হবে। কাজহীন হও ঐ সময় যখন কাজের ভেতর অসাধুতা প্রবেশ করে, আর কোনো সময়েই নয়।

বিশ্ব-সভ্যতার এত দান তুমি ভোগ কর এসব কী করে হল? হাতের সাহায্যে নয় কি? কাজকামকে খেলো মনে করলে চলবে না । মিস্ত্রির হাতুড়ির আঘাত, কামারের কপালের ঘাম, কুলির কোদালকে শ্রদ্ধার চোখে দেখো।

অনেকে বলে, তাদের জন্য কোনো কাজ নেই। যে কাজই তারা করুক, যে দিকেই তারা হাঁটুক- কেবল ব্যর্থতা আর ব্যর্থতা! মূর্খ যারা তারাই এ কথা বলে। তাদের এ ব্যর্থতার জন্য তারা নিজে দায়ী! এই নৈরাশ্যের হা-হুতাশ তাদেরই অমনোযোগ আর কুঁড়েমির ফল।

ডাক্তার জনসন মাত্র কয় আনা পয়সা নিয়ে লন্ডনের মতো শহরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, অথচ তিনি কারও কাছে কোনো হাত পাতেননি। এক বন্ধু তাঁকে এক সময় এক জোড়া জুতো দিয়েছিলেন। অপমানবোধ করে তিনি সে জুতো পথে ফেলে দিয়েছিলেন। উদ্যম , পরিশ্রম ও চেষ্টার সামনে সব বাধাই পানি হয়ে যায়। এ গুণ যার মধ্যে আছে, যে ব্যক্তি পরিশ্রমী, তার দুঃখ নেই। জনসনকে অনেক সময় রাত্রিতে না খেয়ে শুয়ে থাকতে হত, তাতে তিনি কোনোদিন ব্যথিত বা হতাশ হননি। বাধাকে চূর্ণ করে বীরপুরুষের মতো তিনি যে কীর্তি রেখে গিয়েছেন, তা অনেক দেশের অনেক পন্ডিতই পারবেন না।

গুণ থাকলেও চেষ্টা না করলে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না। আরভিং সাহেব বলেছেন, চুপ করে বসে থাকলে কাজ হবে না। চেষ্টা কর, নড়াচড়া কর, এমন কি কিছু-নাড়, ভেতর কিছু ফলাতে পারবে। কুকুরের মতো চিৎকার কর, সিংহ হয়েও ঘুমিয়ে থাকলে কী লাভ?

পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছ, তারপর মনে হচ্ছে তোমার মূল্য এক পয়সা নয়। জিজ্ঞাসা করি, কেন ? জান না, এ জগতে যারা নিতান্ত আনাড়ি তারা মাসে হাজার হাজার টাকা উপায় করছে?

তোমার এই মর্মবেদনা ও দুঃখের কারণ তুমি মূর্খ। মানুষ বালিতে সোনা ফলাতে পারে, এ তুমি বিশ্বাস কর না? তুমি কুঁড়ে, তোমার উদ্যম নেই, তুমি একটা আত্মপ্রত্যয়হীন অভাগা।

কাজ ছোট হোক, বড় হোক, প্রাণ-মন দিয়ে করবে। মূল্যহীন বন্ধুগণের লজ্জায় কাজকে ঘৃণা কোরো না। সকল দিকে, সকল রকমে তোমার কাজ যাতে সুন্দর হয় তার চেষ্টা করবে।

ফক্স সাহেবকে এক সময় এক ভদ্রলোক বলেছিলেন, আপনার লেখা ভালো নয়। কাজের চারুতার প্রতি তাঁর এত নজর ছিল যে, তিনি সেই দিন থেকে স্কুলের বালকের ন্যায় লেখা আরম্ভ করলেন এবং অল্পকালের মধ্যে তাঁর লেখা চমৎকার হয়ে গেল।

উন্নতির আর এক কারণ হচ্ছে দৃষ্টি ও মনোযোগ। এক ভদ্রলোকের খানিক জমি ছিল। জমিতে লাভ তো হতই না, বরং দিন দিন তাঁর ক্ষতি হচ্ছিল। নিরুপায় হয়ে নামমাত্র টাকা নিয়ে তিনি এক ব্যক্তিকে জমিগুলি ইজারা দিলেন। কয়েক বছর শেষে ইজারাদার এক দিন ভূস্বামীকে বললেন, যদি জমিগুলি বিক্রয় করেন তাহলে আমাকেই দেবেন। আপনার কৃপায় এই কয় বছরে আমি অনেক টাকা জমা করতে সক্ষম হয়েছি। ভূস্বামী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এক বছরের ভেতর যে জমিতে আমি একটা পয়সা উপায় করতে পারি নি, সেই জমি মাত্র কয়েক বছর চাষ করেই খরিদ করতে সাহস করছ? সে বলল, আপনার মতো অমনোযোগী ও বাবু আমি নই! পরিশ্রম ছাড়া আমি আর কিছু জানি নাই। বেলা দশটা পর্যন্ত ঘুমানো আমার অভ্যাস নয়।

এক যুবক স্কট সাহেবের কাছে উপদেশ চেয়েছিল। যুবককে তিনি এই উপদেশ দেন : কুঁড়েমি কোরো না, যা করবার, তা এখনই আরম্ভ কর। বিশ্রাম যদি করতে হয় কাজ সেরে করবে।

সময়ের যারা সদ্ব্যবহার করে, তারা জিতবেই। সময়েই টাকা, সময় টাকার চেয়েও বেশি। জীবনকে উন্নত করো কাজ করে। জ্ঞান অর্জন কর। চরিত্রকে ঠিক করে বসে থাক। কৃপণের মতো সময়ের কাছ থেকে তোমার পাওনা বুঝে নাও।

এক ঘণ্টা করে প্রতিদিন নষ্ট কর, দেখবে বৎসর শেষে গুনে দেখ, অবহেলায় কত সময় নষ্ট হয়েছে। এক ঘণ্টা করে প্রতিদিন একটু করে কাজ কর, দেখবে বৎসর শেষে, এমনকি মাসে কত কাজ তোমার হয়েছে। তোমার কাজ দেখে তুমি নিজেই বিস্মিত হবে। প্রতিদির তোমার চিন্তা একখানা কাগজে বেশি নয়-দশ লাইন করে ধরে রাখ, দেখবে বছর শেষে তুমি একখানা সুচিন্তিত চমৎকার বই লিখে ফেলেছ। জীবনকে ব্যবহার কর, দেখবে মৃত্যু জীবনের হাজার কীর্তির নিশান উড়িয়ে দিয়েছে। জীবন আলস্যে, বিনা কাজে কাটিয়ে দাও, মৃত্যুকালে মনে হবে জীবনে তোমার একটা মিথ্যা লীলার অভিনয় ছাড়া আর কিছু হয়নি- একটা সীমাহীন দুঃখ ও হা-হুতাশের সমষ্টি! জীবন শেষে যদি বল, 'জীবনে কী করলাম? কিছু হল না' তাতে কী লাভ হবে? কাজের প্রারম্ভে ভেবে নিও, তুমি কোন কাজের উপযোগী, জগতে কোন কাজ করবার জন্য তুমি তৈরি হয়েছ- কোন কাজে তোমার আত্মা তৃপ্তি লাভ করে।

সাধুতা ও সত্যের ভেতর দিয়ে যেমন উন্নতি লাভ করা যায়, এমন আর কিছুতে নয়। সত্য এবং সাধুতাকে লক্ষ রেখে ব্যবসা কর, তোমার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। জুয়াচুরি করে দু দিনের জন্য তুমি লাভবান হতে পার, সে লাভ দু দিনের। জগতে যে সমস্ত মানুষ ব্যবসাতে উন্নতি করেছেন তাঁদের কাজেকামে কখনও মিথ্যা, জুয়াচুরি ছিল না। ব্যবসা, ভালো কাজ-এর ভেতর অমর্যাদার কিছু নেই। অগৌরব হয় হীন পরাধীনতায়, মিথ্যা ও অসাধুতায়।

এক ব্যক্তি মুদি জীবনের লজ্জা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছিল। মরবার আগে একখানা কাগজে লিখে রেখে গিয়েছিল- 'এ হীন জীবন আমার পক্ষে অসহনীয়।' তার মৃত্যুতে আমাদের মনে কোনো দয়ার উদ্রেক হয় না। লোকটি এত হীন ছিল যে, তার মুদি হয়ে বাঁচবারও অধিকার ছিল না। কাজকাম বা ব্যবসাতে অগৌরব নেই। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ নবাব বংশের নাম পূর্ববঙ্গে প্রসিদ্ধ। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলিমউল্লাহ্ ছিলেন এক জন ব্যবসায়ী। জাতির কল্যাণ হয় ব্যবসার ভেতর দিয়ে। ব্যবসাকে যে শ্রদ্ধার চোখে দেখে না সে মূর্খ। ইংরেজ জাতির এই গৌরব-গরিমার এক কারণ ব্যবসা। ব্যবসা না করলে তারা এত বড় হতে পারত না।

যে জিনিস নিজে কিনলে ঠকেছ বলে মনে হয়, সে জিনিস ক্রেতাকে কখনও দিও না। কখনও অনভিজ্ঞ ক্রেতাকে ঠকিও না। হয়তো মনে হবে তোমার লোকসান হল, কিন্তু না, অপেক্ষা কর, তোমার সাধুতা ও সুনাম ছড়াতে দাও, লোকসানের দশ গুণ এসে তোমার পকেটে ভর্তি হবে।

ব্যবসার ভেতর সাধুতা রক্ষা করে কাজ করায় অনেকখানি মনুষ্যত্বের দরকার। যে ব্যবসায়ী লোভ সংবরণ করে নিজের সুনামকে বাঁচিয়ে রাখে, সে কম মহত্ত্বের পরিচয় দেয় না। মিষ্ট ও সহিষ্ণু ব্যবহার, ভদ্রতা এবং অল্প লাভের ইচ্ছা তোমার ব্যবসায়ী জীবনকে সফল করবে।

অনবরত চাকরির লোভে যুবকেরা সোনার শক্তিভরা জীবনকে বিড়ম্বিত করে দিচ্ছে। মিস্ত্রি, কামার, শিল্পী, দরজি, এরা কি সত্যই নিম্নস্তরের লোক? অশিক্ষিত বলেই কি সভ্য সমাজে এদের স্থান নেই? যা তুমি সামান্য বলে অবহেলা করছ, তা কতখানি জ্ঞান, চিন্তা ও সাধনার ফল তা কি ভেবে দেখেছ? শিক্ষিত ব্যক্তি যে কোনো কাজই করুক না, তার সম্মান, অর্থ দুই-ই লাভ হবে। আত্মার অফুরন্ত শক্তিকে মানুষের কৃপাপ্রার্থী হয়ে ব্যর্থ করে দিয়ো না।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'উদ্যম ও পরিশ্রম' নিবন্ধটি মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের 'উন্নত জীবন' গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদ থেকে সংগৃহীত। গ্রন্থের মূল নিবন্ধে এর নাম 'চাকরি, কাজকর্ম ও ব্যবসা : উদ্যম, চেষ্টা, পরিশ্রম।'

মূলবক্তব্য

উদ্যম ও পরিশ্রম নিবন্ধে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করেছেন যে, জীবন ধারণের জন্য চাকরি করতে হবে। কাজ করতে হবে। তবে কোনো কাজই যেন মনের স্বাধীনতাকে খর্ব না করে। চাকরি জীবনে স্বার্থবুদ্ধি বা অন্যায়ের কোনো স্পর্শ যেন না থাকে। কাজ ছোট হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু পরানুগ্রহের চক্রে যেন ব্যক্তি তার সত্তার অমর্যাদা করে আশার পতন না ঘটায়। পৃথিবীতে এমনও দৃষ্টান্ত আছে, যাঁরা এককালে ছোটখাটো কাজ করেছেন, আত্মসম্মান বজায় রেখে নিজ লক্ষ্য স্থির রেখে অবশেষে হয়েছেন পৃথিবীখ্যাত লোক। আত্মোন্নতির জন্য পরিশ্রম এবং উদ্যম অপরিহার্য, এর সঙ্গে দৃষ্টি ও মনোযোগ থাকতে হবে। সাধুতা ও সত্যের ভেতর দিয়ে যেমন সত্তার মহিমা উদ্ভাসিত হয় কাজের মাধ্যমে, তেমনি সমাজেও স্বনির্ভর যুবকের, শিক্ষিত মানুষের অফুরন্ত শক্তির প্রকাশও আমরা দেখতে পাই। দুঃখ হয়, যখন দেখা যায়, উদীয়মান যুবকের মধ্যে যে সম্ভাবনাময় সোনার মতো মূল্যবান শক্তি সংযুক্ত আছে, তখন তারাই পরানুগ্রহের মোহে দুয়ারে দুয়ারে চাকরির জন্য মাথা কুটে মরছে। অথচ তাদের কাছে, কর্মশক্তিভরা দুটি সবল হাত আছে, শিক্ষালব্ধ জ্ঞান, অভিজ্ঞতাময় মস্তিষ্ক আছে, উদ্দীপনাময় প্রাণস্ফূর্তি আছে, এই গুণাবলির সফল প্রয়োগ তাদের দেবে সার্থক জীবনের সন্ধান, আত্মনির্ভরতা তথা আত্মপ্রতিষ্ঠায় অমেয় শক্তি।

শব্দার্থ ও টীকা

ব্যক্তিত্ব- ব্যক্তি বিশেষের বৈশিষ্ট্য। **নিষ্কলঙ্ক**- নির্মল। **প্লেটো** (খ্রি:পূ: ৪২৭-৩৪৭) - শিক্ষাব্রতী ও সত্যানুসন্ধানী প্লেটো ৩৮৭ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে একাডেমি নামে এথেন্সে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং শিক্ষামূলক গবেষণায় ব্রতী হন। রিপাবলিক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। প্লেটোর মতে, ব্যক্তিত্বের মান বা জীবনের সার্থকতা কী ? তাঁর কথায় Only an examined life is worthliving অর্থাৎ পরীক্ষিত জীবনই সার্থক জীবন- আত্মজ্ঞানের দ্বারা পরিশীলিত জীবনবোধই ব্যক্তিসত্তার ধারক ও বাহক। **অসাধুতা**- প্রতারণা, অসৎকাজ। **খেলো**- মূল্যহীন, নিকৃষ্ট।

ড: জনসন- (Dr. Samual Johnson : ১৭০৯-১৭৮৪)- একজন বিশিষ্ট ইংরেজ লেখক ও ইংরেজি ভাষায় প্রথম অভিধান সংকলক। তিনি বহু প্রখ্যাত অভিধান প্রণেতা। যেমন : Dictionary, Vanity of Human Wishes, Rasselas, Prince of Abyssinia, Lives of the Poets ইত্যাদি।

আরভিং- (Washington Irving : ১৮৮৩-১৯৫৯) - একজন আমেরিকান লেখক। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় গ্রন্থে'র নাম 'রিপভ্যান উইংকল।'

স্কট- (Sir Walter Scott : ১৭৭১-১৮৩২) -ইংরেজি ভাষায় প্রখ্যাত স্কটিশ ঔপন্যাসিক ও গাথা রচয়িতা। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'আইভানহো'।

হা-হুতাশ- আক্ষেপধ্বনি। **উদ্রেক**- উদয়, সঞ্চার। **গৌরব**- গরিমা, মর্যাদা, গর্ব। **বিড়ম্বিত**- দুঃখপ্রাপ্ত। **ব্যর্থ** -নিষ্ফল।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইউরোপের জ্ঞানগুরু-

ক. শেক্সপিয়ার খ. ডাক্তার জনসন

গ. প্লেটো ঘ. ওয়াল্টার স্কট

২. 'সময়ের যারা সদ্ব্যবহার করে, তারা জিতবেই'-বলতে বোঝানো হয়েছে-

ক. সময় হলে খেলাধুলায় জয় হবেই
খ. পরীক্ষায় যথাসময়ে উত্তীর্ণ হওয়া চাই
গ. জীবনে একসময় প্রভূত অর্থলাভ হবে
ঘ. সময়কে কাজে লাগালে সাফল্য আসে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

ব্যবসার ভেতর সাধুতা রক্ষা করে কাজ করা অনেকখানি মনুষ্যত্বের দরকার। যে ব্যবসায়ী লোভ সংবরণ করে নিজের সুনামকে বাঁচিয়ে রাখে, সে কম মহত্ত্বের পরিচয় দেয় না। মিষ্ট ও সহিষ্ণু ব্যবহার, ভদ্রতা এবং অল্প লাভের ইচ্ছা তোমার ব্যবসায়ী জীবনকে সফল করবে।'

৩. একজন অসাধু ব্যবসায়ীর ব্যর্থতার কারণ-

ক. তার লাভ করার ইচ্ছা প্রবল নয়
খ. সে সুনামকে ধরে রাখতে চায়
গ. তার মনুষ্যত্ব অর্জনের চেষ্টা নেই
ঘ. সব সময় সৎ থাকতে পছন্দ করেন

৪. লোভ সংবরণ করা উত্তম কাজ, কারণ-

i. লোভ করলে পাপ হয়
ii. লোভ দুর্নাম ছড়ায়
iii. লোভ সহিষ্ণুতা বাড়ায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. i ও ii
গ. ii
ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নের উত্তর দাও :

'ডাক্তার জনসন মাত্র কয় আনা পয়সা নিয়ে লন্ডনের মতো শহরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, অথচ তিনি কারও কাছে কোনো হাত পাতেননি। এক বন্ধু তাঁকে এক সময় এক জোড়া জুতো দিয়েছিলেন। অপমানবোধ করে তিনি সে জুতো পথে ফেলে দিয়েছিলেন। উদ্যম, পরিশ্রম ও চেষ্টার সামনে সব বাধাই পানি হয়ে যায়। এ গুণ যার মধ্যে আছে, যে ব্যক্তি পরিশ্রমী, তার দুঃখ নেই।'

ক. ডাক্তার জনসন কোন ভাষার লেখক?
খ. জুতো পেয়ে জনসন অপমানিত বোধ করলেন কেন, ব্যাখ্যা কর।
গ. 'পৃথিবীর নিকৃষ্টতম কাজ কারো কাছে হাত পাতা'-তোমার মতামত ব্যক্ত কর।
ঘ. 'যে ব্যক্তি পরিশ্রমী, তার দুঃখ নেই।'-ব্যাখ্যা কর।

ইসলামের মর্মকথা

ইবরাহীম খাঁ

[লেখক পরিচিতি : ইবরাহীম খাঁ ১৮৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে টাঙ্গাইল জেলার ভুয়াপুর থানার অন্তর্গত শাবাজনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. পাস করে তিনি শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন এবং ১৯২৪ সালে আইন পাস করে ময়মনসিংহে ওকালতি শুরু করেন। ১৯২৬ সালে করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর অর্থ সাহায্যে করটিয়া সাদত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এ কলেজের অধ্যক্ষরূপে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দীর্ঘদিন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। ইবরাহীম খাঁ স্মৃতিকথা, শিক্ষা–সাহিত্য–ধর্ম–বিষয়ক প্রবন্ধ, নাটক, ভ্রমণ কাহিনী, রস রচনা, গল্প, উপন্যাস, ইতিহাস ও জীবনচরিত, শিশুসাহিত্য, পাঠ্যবই ও অনুবাদ মিলিয়ে শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। কামাল পাশা, আনোয়ার পাশা, কাফেলা, বৌ বেগম, আলু বোখারা, বাতায়ন, ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র, ইসলামের মর্মকথা ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। মুসলমান সমাজের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের পুনর্জাগরণের প্রয়াস তাঁর লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার ও একুশে পদক লাভ করেছেন। ইবরাহীম খাঁ ১৯৭৮ সালের ২৯শে মার্চ ঢাকায় ইন্তেকাল করেন।]

ধর্ম মানে যা মানুষকে ধারণ করে বা পোষণ করে। অন্য কথায়, ব্যক্তিগত বা সমাজগতভাবে যা কিছু মানুষের পক্ষে কল্যাণকর, তাই ধর্ম। সুতরাং যিনি কল্যাণপথের অভিসারী তিনি ধার্মিক। আরও এক কথা- মানুষের জন্য ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয়। যে ধর্ম পালন করতে গিয়ে মানুষের অকল্যাণ করতে হয়, তা ধর্ম নয়- ধর্মের নামে ছদ্মবেশী কুসংস্কার।

ধর্মের লক্ষণ সমবন্ধে ইসলাম বলে- ইসলাম ফেতরতের ধর্ম। 'ফেতরত' মানে স্বভাব বা প্রকৃতি। ইসলাম প্রকৃতিসঞ্জাত, স্বভাবসুন্দর ধর্ম। চিরকুমার থাকা, গুহার অন্ধকারে অনাহারে দেহত্যাগ করা মানুষের প্রকৃতিসঞ্জাত নয়। কাজেই তা ধর্ম নয়, অন্তত সাধারণের পক্ষে ধার্মিকতার আদর্শ হতে পারে না।

সুতরাং কোনো জটিল দার্শনিক বিতর্কে না গিয়ে আমরা মোটামুটি এই বলতে পারি যে, যা স্বভাবসঞ্জাত এবং মানুষের পক্ষে কল্যাণকর, তাই ধর্ম। আমরা আরও বলতে পারি, যে ধর্ম মানুষের কল্যাণকর পথ যত অধিক সুগম করে দিয়েছে, সে ধর্ম তত অধিক মহান।

ইসলামের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান বাণী- আল্লাহ এক। তাঁর কোনও শরিক নাই, মাতা-পিতা, পুত্র-কন্যা, স্ত্রী কিছুই নাই। তিনি একা এ নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও পালনকর্তা। আল্লাহ আকবর-আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং, সমস্ত স্তব-স্তুতি সমস্ত পূজা-অর্চনা, সমস্ত আনুগত্য-উপাসনা একা তাঁরই প্রাপ্য। মানুষকে মানুষ কখনও পূজা করবে না- সে মানুষ ঋষি-দরবেশ হোক, পীর-পুরোহিত হোক, আর শাহানশাহ বাদশাহ হোক। মানুষ আল্লাহর শরিক বা অংশী হিসেবে জিনপরী, দৈত্য-ফেরেশতা কারও পূজা করবে না, তা সে যত বড়ই হোক। এরই নাম ইসলামের তৌহিদ। এই তৌহিদ মানুষের মেরুদণ্ডে করেছে অগাধ শক্তির সঞ্চার। এই বিশ্বাসের দুর্জয় শক্তিতে সে এক আল্লাহ ভিন্ন দুনিয়ার আর সবার সামনে উন্নত মস্তকে দাঁড়তে পারে। কবি যে শক্তি কামনা করে বলেছেন :

> সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি
> যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
> আঁকে নাই কলঙ্ক-তিলক।

তৌহিদের অন্যতম ফল সাম্য। সবাই এক আল্লাহর সৃষ্ট। কাজেই সবাই সমান। প্রাচীন ইহুদিরা বিশ্বাস করত, দুনিয়ায় তারাই সেরা জাতি আর সবাই পাপী- ছোট লোক। প্রাচীন গ্রিকরা ভাবত, গ্রিক ছাড়া আর সব জাতি নিছক বর্বর। প্রাচীন রোমকগণও অরোমকগণকে ওইরূপ চোখেই দেখত। চীনের এক প্রাচীন নাম 'স্বর্গরাজ্য'; অর্থাৎ চীন ছাড়া আর সব দেশ

নরক বিশেষ। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে এই যে ভেদের প্রাচীর সহস্রাধিক বর্ষ থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে মানুষের জ্ঞান, পৌরুষ ও আত্মসম্মানকে নীরবে ধিক্কার দিচ্ছিল, ইসলামের পয়গম্বর হযরত মুহম্মদ (স) এসে তাকে নিদারুণভাবে ভূমিসাৎ করে দিলেন। তিনি উদারকণ্ঠে ঘোষণা করলেন : ভেদ নাই, ভেদ নাই, মানুষে মানুষে ভেদ নাই। অআরবের ওপর আরবের কোনও শ্রেষ্ঠত্ব নাই, আরবের ওপরও অআরবের কোনও শ্রেষ্ঠত্ব নাই । সব মানুষ আদি পিতা আদমের সন্তান আর আদম মাটিতে তৈরি। অতএব কারও গর্বিত হওয়ার কিছু নাই।

তৌহিদের তৃতীয় ফল, নিখিল বিশ্বের সমস্ত বস্তুর মধ্যে এক অখণ্ড ঐক্য ও সামঞ্জস্যের গভীর উপলব্ধি। আমরা এক জোড়া ইংরেজ ও কাফ্রি দেখে বলি, উহ! দুজনে কি আকাশ-পাতাল তফাত। একজন যে মোমবাতি দিয়ে আর একজন পাথর কয়লা দিয়ে তৈরি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেন, 'না, বাইরের ওই পাতলা চামড়াটুকুর নিচে যে আসল রক্তধারা, রাসায়নিক বিশ্লেষণে তাতে কোনও পার্থক্য নাই।' এমন করে দিন দিন আমাদের জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত হয়ে চলেছে, আর দিন দিন আমাদের মন বিশ্বের ঐক্য সম্বন্ধে অধিক থেকে অধিকতর সজাগ হয়ে উঠেছে। ইসলাম বলে নিখিল বিশ্ব একই আল্লাহর একই হাতে একই উদ্দেশ্যে তৈরি। বিশ্বের সমস্ত বস্তু একই সৃষ্টির মোহনমালার বিভিন্ন ফুল।

এই মহান ঐক্যের যে অভিসারী, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ তার পক্ষে হয় সহজ। নিখিল-বিশ্ব এই আল্লাহর সৃষ্টি, সুখ তাঁরই দান, দুঃখও তাঁরই দান; এ বিচিত্র সৃষ্টির মালিকানায় সুখ-দুঃখ একই ঐক্যের সুতায় গাঁথা বিভিন্ন রঙের ফুল- উভয়েরই প্রয়োজন আছে। সৃষ্টির প্রাথমিক ব্যথাকে যে বরণ না করতে পারবে, সে সৃষ্টির পরবর্তী সুখের অধিকারী হবে কেন? মুকুলের মায়া যে ত্যাগ না করতে পারবে, সে ফুল পাবে কোথায়? ঝরা ফুলের ব্যথায় যে অধীর, সে ফলের প্রত্যাশা করবে কোন মুখে? আবার ফলকে বুকে আঁকড়ে ধরে রাখবে যে চিরকাল, তার ভবিষ্যৎ ফসলের বীজ কোথায়? ইসলাম বলে, আল্লাহর দেওয়া সুখ দুঃখের জীবন-মৃত্যুর এই অমোঘ নিয়মকে মেনে নাও, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর। 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন'-তাঁরই কাছ থেকে সব আসে, আবার তাঁরই কাছে সব ফিরে যায়। এই জন্য ইসলামের অপর মানে - আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ।

ইসলাম মানুষের জন্ম-অপরাধ থেকে তার মুক্তি ঘোষণা করেছে। কালোর ঘরে জন্মেছে বলে তাকে চিরজীবন ধূলি-কালির বোঝা বয়ে আরও কালো হতে হবে, আর সাদা আরামে বসে সাবান ঘসে ঘসে তার সাদা চামড়া আরও সাদা করবে, উন্নত নাসিকা নিয়ে জন্মেছে বলে তার ঈগল চঞ্চুপ্রতিম বক্র নাসিকাগ্রের কুঞ্চনাঘাতে আশপাশে সবাইকে আহত করে চলবে, আর ও থ্যাবড়া নাক নিয়ে জন্মেছে বলে চিরকাল খাড়া নাকওয়ালার কিল ঘুসি খেয়ে খেয়ে তার থ্যাবড়া নাককে আরও থ্যাবড়া করতে হবে- এ ইসলামের অনুশাসন নয়। ইসলাম বলে, সমস্ত শিশু জন্মগ্রহণ করে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ অবস্থায়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সর্ববিধ সজ্ঞাত উপায়ে সর্বপ্রকার আত্মবিকাশের সম্পূর্ণ অধিকার প্রত্যেক শিশুর আছে।

ইসলাম বলে, প্রত্যেক শিশু সত্যধর্মে জন্মগ্রহণ করে। পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে অনেকে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে আবিষ্ট ও বিপথগামী হয়ে পড়ে। পারিপার্শ্বিকতার অন্ধ মোহ থেকে পরিত্রাণ লাভের সবচেয়ে বড় সহায়ক হল জ্ঞানচর্চা। এইজন্য ইসলামের পয়গম্বর প্রাথমিক শিক্ষাকে নরনারী উভয়ের পক্ষে বাধ্যকরী করেছেন। তিনি বলেছেন, বিদ্যার্জন পুরুষ, স্ত্রীলোক উভয়ের জন্যই ফরজ। ফরজ মানে ধর্মের দিক হতে অপরিহার্য কর্তব্য।

রাসুলুল্লাহ আবার বিশেষজ্ঞগণকে বলেছেন, 'তোমরা এজতেহাদ কর, যদি ঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হও, তবে তোমাদের জন্য দুইটি পুণ্য। আর যদি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হও, তবু তোমাদের জন্য একটি পুণ্য।' কোনো জটিল বিষয়ে উভয় পক্ষের প্রমাণ ও যুক্তি পর্যালোচনা করে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার যে কঠোর চেষ্টা, তাকে এজতেহাদ বলে। আমরা এজতেহাদকে এক কথায় গবেষণা বলতে পারি। তাহলে হযরতের কথা দাঁড়াল এই, সত্য উদ্ধারের জন্য গবেষণা কর, যদি ঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হও, তবে প্রথম বিভাগে পাস; যদি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হও, তবু দ্বিতীয় বিভাগে পাস। জ্ঞানচর্চার জন্য এমন উৎসাহ উদ্দীপক আকুল আহ্বান জগতের আর কোনও লোক-শিক্ষক করেছেন বলে আমার জানা নাই। ধর্মের ব্যাপারীর হাত থেকে ইসলাম মানুষের মুক্তি ঘোষণা করেছে। এই সেদিনও মধ্যযুগীয় কোনো কোনো ধর্ম নেতা ইউরোপের দেশে দেশে মুক্তিনামা ফেরি করে বেড়াত। কার কতখানি পাপ, তা ওজন করে সে পাপের জন্য কত টাকা জরিমানা দিতে হবে তা নির্ধারণ করে দিত এবং সেই টাকা গ্রহণ করে আল্লাহর তরফ থেকে তারা

মুক্তিনামা সম্পাদনা করত, কবরে মৃতের সঙ্গে সেই মুক্তিনামা দেওয়া হত। যুগে যুগে দেশে দেশে ধর্মে ধর্মে এমনি জাতীয় বহু উপায়ে আল্লাহর নামে মানুষ মানুষকে ফাঁকি দিয়ে এসেছে। ইসলাম বলে, আল্লাহ এবং মানুষের মধ্যে সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ নয়; সে সম্বন্ধ দরদের সম্বন্ধ, দোকানদারি সম্বন্ধ নয়। দোকানদারি মধ্যস্থ দিয়ে চলতে পারে, দরদ মধ্যস্থ দিয়ে চলে না।

প্রাচীন হীন আচার অনুষ্ঠানের পীড়ন থেকে ইসলাম মানুষের জন্য মুক্তি ঘোষণা করেছে। ইসলামের আচার অনুষ্ঠানের সংখ্যা নিতান্ত কম। যা আছে, তারও সম্বন্ধে বারবার হুঁশিয়ার করা হয়েছে। সাবধান, এ সব যেন প্রাণহীন শুষ্ক কঙ্কালে পরিণত না হয়। সম্পন্ন অবস্থার মুসলমানের জন্য কোরবানি অবশ্যকরণীয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হুঁশিয়ার করা হয়েছে ; তোমাদের কোরবানির পশুর রক্ত বা মাংস আল্লাহর কাছে পৌঁছে না; তিনি দেখেন তোমার ঈমান। নামাজ প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর জন্য অবশ্যকরণীয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হুঁশিয়ার করা হয়েছে ; কেবল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মাথা নত করলে কোনো লাভ নাই, যদি না তার পশ্চাতে থাকে উপাসনা-উন্মুখ সত্য সরল মন। সর্বপ্রকার সংস্কারের মোহমুক্ত তত্ত্বান্বেষী জ্ঞানোজ্জ্বল মন, এই-ই ইসলামের কাম্য।

আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মহত্ত্বের দ্বার ইসলাম মানুষের জন্য খুলে দিয়েছে। ইসলাম বলে, ওই যে আসমানের নীল শামিয়ানার তলে অগণিত রবি শশী গ্রহ নক্ষত্রের বাতি জ্বলে, মানুষের আজ্ঞাবহ হয়ে মানুষের সেবার জন্য ওদের সৃষ্টি। গগনচুম্বী পর্বতমালা, তরঙ্গসঙ্কুল অকূল সমুদ্র, দিগন্তব্যাপী মরুভূমি, সব মানুষেরই জন্য। মানুষের মধ্যে বিধাতা অপার সম্ভাব্যতার বীজ নিহিত রেখেছেন। জ্ঞানোজ্জ্বল সাধনা বলে সে বিপুল সম্ভাব্যতার বিকাশ সম্পাদনা করলে সমগ্র বিশ্ব এই তুচ্ছ মাটির মানুষের কাছে নতজানু হয়ে পড়ে। আদি মানব আদমকে যখন আল্লাহ সৃষ্টি করলেন, তখন ফেরেশতারা বলল, 'প্রভু, আলোর তৈরি আমরা সব, তোমার চির আজ্ঞাবহ ; আমরা থাকতে কেন তুমি এত তুচ্ছ মাটির পুতুল তৈরি করলে ?' আদম আল্লাহর নিকট থেকে শিখলেন সব বস্তুর নাম, অর্থাৎ লাভ করলেন জ্ঞান। তারপর মানুষ আর ফেরেশতাদের জ্ঞানের পরীক্ষা হল। ফেরেশতারা সে পরীক্ষায় হেরে গিয়ে আদমকে সেজদা করল। মানুষের জ্ঞানের মহিমার কাছে চির উপাসনারত ফেরেশতাকেও মস্তক নত করতে হল। মানুষের সীমাহীন সম্ভাব্যতার এই জ্ঞান মানুষকে দিয়েছে এক অত্যাশ্চর্য শক্তি, এক বিপুল আত্মমর্যাদা, আর রক্ষা করেছে তাকে দেও-দৈত্য, জিন-পরী, গ্রহ-নক্ষত্র, নদী-পর্বত প্রভৃতি অসংখ্য পূজাপ্রার্থীর পীড়ন থেকে।

ইসলাম উপাসনা মন্দিরের দুয়ার চিরমুক্ত করে দিয়েছে। সর্ব জাতির, সর্ব গোষ্ঠীর, সর্ব দেশের, সর্ব শ্রেণীর লোকের আল্লাহর মন্দিরে উপাসনার জন্য প্রবেশের সমান অধিকার। মুয়াজ্জিন যখন 'আল্লাহু আকবর' বলে সবাইকে নামাজে আহ্বান করে, তখন সাদা-কালো, পণ্ডিত-মূর্খ, বাদশাহ-ফকির একই মসজিদে একই কাতারে পাশাপাশি দাঁড়ায়।

অদৃষ্টের গোলামি থেকেই ইসলাম মানুষের মুক্তি ঘোষণা করেছে। ইসলাম জীবনের ধর্ম, সাধনার ধর্ম, কর্মের ধর্ম। ইসলামের যে সত্যিকার অনুসারী, সে এ জগতে বাঁচবে এবং প্রকৃত মানুষের মতো বাঁচবে। তার সে বাঁচার পথে শ্রেষ্ঠতম সম্বল হবে তার সাধনা, তার কর্ম।

কর্ম দ্বারা বিকশিত হবে তার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং সে ব্যক্তিত্ব নিজ শক্তি বলে গড়ে নিবে অদৃষ্ট।

পরের দাসত্বের নিগড় থেকে ইসলাম নারীর মুক্তি ঘোষণা করেছে। ইসলাম প্রচারের আগে আরবের হাটেবাজারে উট-দুম্বার মতো নারীও বিক্রীত হত। কন্যার জন্ম ছিল পিতার পক্ষে অশুভ। এই অশুভ দূর করার জন্য অনেক পিতা কন্যাকে জীবন্ত কবর দিত। এই পশুর পর্যায় হতে পরম দরদ, পরম সম্ভ্রমের সঙ্গে মহানবী (স) নারীকে টেনে তুললেন সম্মানিত মানুষের পর্যায়ে। পুরুষের মতো নারীও পেল ধর্মের অধিকার, কর্মের অধিকার, বিদ্যার্জনের অধিকার, মাতা-পিতা-স্বামী-ভাই-বোনের সম্পত্তির অধিকার, বিবাহে সম্মতি দেওয়া বা না দেওয়ার অধিকার, অবাঞ্ছিত বিবাহবন্ধন ছেদন করার অধিকার । নারীর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য এমনি করে সন্তানের বেহেশতের স্থান ইসলাম নির্দেশ করে দিল মায়ের পায়ের তলে ।

ধর্মকে ইসলাম সরল, সহজ ও প্রকৃতিসঙ্গত করে সর্বসাধারণের আয়ত্তের ভেতরে এনে দিয়েছে। ইসলামের মতে ধার্মিক হওয়ার জন্য বিজন জঙ্গলে, পর্বত গুহায় বা নির্জন মরুভূমিতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ইসলামে বৈরাগ্য নেই। কারণ, বৈরাগ্য প্রকৃতিসঙ্গত নয়।

সবল স্বাস্থ্য নিয়ে, পেটপুরে খেয়ে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা মানুষের প্রকৃতি। কাজেই ইসলামের মতে স্বাস্থ্যচর্চা ও রক্ষা ধর্মকাজ, সদুপায় রোজগার করা ধর্মকাজ, পেট ভরে খাওয়া ধর্মকাজ । ইসলাম বলে, আল্লাহর দেওয়া এই যে অফুরন্ত সম্পদ চারদিকে ছড়িয়ে আছে, মানুষ তা সংগ্রহ করুক, সঙ্গতভাবে ভোগ করুক ও বিনিময়ে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুক- এও উপাসনা। পেটে পাথর বেঁধে যখের মতো ধন আঁকড়ে বসে থাকা কিংবা আলস্য বা অপব্যয় দ্বারা দারিদ্র্য ডেকে এনে কষ্ট পাওয়া, এতে আল্লাহ তুষ্ট নন। মসজিদে বসে কেউ 'আল্লাহ আল্লাহ' বলে তসবিহ জপ করলে যেমন আল্লাহর উপাসনা হয়, সদুপায় রোজগারের জন্য বর্ষার নদীতে মাঝিরা যে 'হেঁইও হো হেঁইও হো' বলে দাঁড় বেয়ে যায়, তাতেও আল্লাহর উপাসনা হয়। যে শাহানশাহ বাদশাহ সাম্রাজ্যের রাজভোগ তুচ্ছ করে মসজিদে বসে পরম পুণ্য জ্ঞানে কুরআন নকল করে তারই বিক্রয়লব্ধ অর্থে নিজ খোরাকের ব্যবস্থা করেন, ইসলামের মতে তাঁরই পুণ্য বেশি, না যে নিরন্ন কৃষক নিজ অভুক্ত সন্তানের মুখে দুটি ভাত দেওয়ার জন্য চৈত্রের অগ্নিবর্ষী রৌদ্র মাথায় নিয়ে লাঙল ফলকের কলমে মাঠে মাঠে অনাগত শস্যের আগমনী গাথা রচনা করে, তারই পুণ্য বেশি- বলা সহজ নয়।

ইসলাম মানুষকে ধনবৈষম্যের পাপ থেকে যথাসম্ভব মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ইসলামের ওয়ারিসী আইন ধনবৈষম্যের বিরোধী। সমস্ত বৎসর সঙ্গাত খরচ বাদে যা উদ্বৃত্ত থাকে, তার শতকরা আড়াই ভাগ দরিদ্র আত্মীয়-প্রতিবেশীর মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া মুসলমানের পক্ষে পরম কর্তব্য, এতেও ধনবৈষম্যের আংশিক লাঘব হয়। এ ছাড়া, রমজানের রোজার পর অবশ্যদেয় দান, অবশ্যদেয় কোরবানি, কোরবানির পশুর চামড়ার দাম দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ, ধনীর পক্ষে অবশ্যকরণীয় হজ প্রভৃতি বিধান ধনবৈষম্যের আংশিক প্রতিষেধক। দেশের জনগণকে মেরে ধন যাতে স্বল্প সংখ্যক কুসীদজীবীর কুক্ষিগত না হয়, সে জন্য ইসলাম এই অত্যাচারমূলক সুদকে হারাম করেছে। সর্বসাধারণের মধ্যে ধন চলাচলের পথ সুগম রাখার জন্য ধনীকে যেমন ইসলাম তাকিদ করেছে, ধন অর্জনের জন্য দরিদ্রকেও তেমনি তাকিদ করেছে। ইসলামের মতে ধর্মগত পাপ হিসেবে নাস্তিক্যের নিচেই দারিদ্র্যের স্থান। দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ পাপ নয়, কিন্তু সুস্থদেহী প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে অকারণে অভাবগ্রস্ত থাকা পাপ।

ইসলাম এক নব আভিজাত্যের পত্তন করে তার দুয়ার সর্বসাধারণের জন্য মুক্ত করে দিয়েছে। পৃথিবীতে সাধারণত বংশগত, ধনগত, বুদ্ধিগত ও প্রভুত্বগত আভিজাত্য দেখা যায়। অথচ, এর একটিও মানুষের স্বেচ্ছাক্রমে আয়ত্ত নয়। ইচ্ছা করলেই বড় বংশে জন্মগ্রহণ করা চলে না; ইচ্ছা করলেই অগাধ ধনসম্পত্তির অধিকারী কেউ হতে পারে না; ইচ্ছা করলেই মনীষীর মস্তিষ্ক পাওয়া যায় না; ইচ্ছা করলেই সবাই আলেকজান্ডার হতে পারে না, অথচ ইসলাম সর্বজনীন ধর্ম। তার আভিজাত্যের দুয়ারও সবার জন্য মুক্ত থাকা আবশ্যক। তাই ইসলাম বলে, সেই সবচেয়ে বেশি অভিজাত, যে যথাসাধ্য সবচেয়ে সৎকর্মশীল। ধনী-গরিব, সবল-দুর্বল, বেশি বুদ্ধিমান, কম বুদ্ধিমান- চেষ্টা করলে এরা সবাই এই আভিজাত্যের অধিকারী হতে পারে।

পরধর্ম ও পরধর্মীয়দের প্রতি ইসলামের মনোভাব নিতান্ত উদার। ইসলাম প্রচার সম্বন্ধে ইসলামের নির্দেশ : সৌজন্য ও যুক্তির সঙ্গে অমুসলমানকে ইসলামের সৌন্দর্যের দিকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা কর। যদি তারা আকৃষ্ট না হয়, তবে বল, বেশ তোমাদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া নাই। লাইকরাহা ফিদদীন- ধর্মে জোর জুলুম নাই। উপরন্তু মুসলমানের প্রতি ইসলামের সুস্পষ্ট আদেশ: খবরদার! অমুসলমানেরও উপাস্য বস্তুকে তোমরা গাল দিও না; কারণ, তা হলে তারা স্বভাবতই তোমাদের আল্লাহকে গাল দেবে এবং তোমাদের আল্লাহকে এই শেষোক্ত গালির জন্য তোমরাই দায়ী হবে। দুর্ভিক্ষ মহামারী বা তদ্রূপ আপদে বিপদে মুসলমানের নিকট মুসলমানের যেমন দাবি, অমুসলমানেরও তেমনি দাবি। ইসলাম বলে, প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে যে পেট ভরে খায়, সে মুসলমান নয়। এখানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিবেশির কথাই বলা হয়েছে।

ইসলাম সকল ধর্মের পয়গম্বরকেই পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখে। ইসলাম বিশ্বাস করে, মানবসমাজের পথ প্রদর্শনের জন্য সর্ব দেশে, সর্ব জাতিতে যুগে যুগে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। এমন সকল মহাপুরুষই মুসলমানদের নিকট গভীর ভক্তির পাত্র। অবশ্য মুসলমানেরা রাসুলুল্লাহকে (স) শেষ প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম প্রবর্তক বলে বিশ্বাস করে। মুসলমান দৈনিক পাঁচবার নামাজের সময় ডানে ও বাঁয়ে লক্ষ করে বলে, আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আমার দক্ষিণে ও বামে (অর্থাৎ আমার সর্বদিকে দৃশ্য ও অদৃশ্য) যে যেখানে আছ তোমাদের প্রতি শান্তি ও আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক। সর্বজীবের কল্যাণ কামনা মুসলমানের দৈনিক উপাসনার এমনি অপরিহার্য অঙ্গ।

ইসলাম মানুষের কাছে আশার বাণী ঘোষণা করেছে। একদিন একটি লোক নিতান্ত ব্যাকুল হয়ে এসে মহানবীকে বলল, রাসুলুল্লাহ আমি যে একটা মহাপাপ করে ফেলেছি, আমার উপায়? স্নিগ্ধ কণ্ঠে রাসুলুল্লাহ বললেন, আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। বান্দা ভুল করবে, আর মাফের জন্য তাঁর কাছে আসবে- এতেই আল্লাহ খুশি। কী অপার স্নেহ-ক্ষমাময় প্রভু তিনি। ভুল করে মাফ চাওয়া মানুষশিশুকে কাছে পেয়েই তাঁর তৃপ্তি। আর দুর্বল সহস্র ভুলপ্রবণ মানুষের কাছে এ কী বিপুল আশ্বাস!

ইসলাম মানুষকে আরও আশার বাণী শুনিয়েছে- আল্লাহর পথে যারা আত্মোৎসর্গ করে, তাদের মৃত্যু নাই- তারা অমর। কবর সেই অমর জীবনের দুয়ার মাত্র। ইসলামের বেহেশত অক্ষয়। বেহেশতের বাণী হবে- সালাম, সালাম-শান্তি, মহা শান্তি।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

‘ইসলামের মর্মকথা’ প্রবন্ধটি ইবরাহীম খাঁ রচিত এবং ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত ‘ইসলামের মর্মকথা’ নামক প্রবন্ধ সংকলন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। মূলত প্রবন্ধটি একটি ভাষণ।

মূলবক্তব্য

প্রবন্ধটির মধ্যে লেখক প্রাঞ্জল ভাষায় ইসলাম ধর্মের প্রকৃত সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। ইসলামের একত্ববাদ মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করে। স্রষ্টার অনুগ্রহ কামনায় মুসলমানদের জন্য কোনও তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতার প্রয়োজন পড়ে না। ইসলামের সত্য ন্যায়ের পথে জীবিকার্জন, প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্যপালন, আভিজাত্যের গৌরবহীন কর্মজীবন, পরধর্মসহিষ্ণুতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধটির মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা চলে।

শব্দার্থ ও টীকা

তৌহিদ- একত্ববাদ, এক আল্লাহর বিশ্বাস। **সাম্য**-সকল মানুষ সমান, এই বোধ। **পয়গম্বর**- (ফারসি শব্দ) রাসুল, আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। **জন্ম অপরাধ**- নীচ বংশে জন্মগ্রহণকারী মানুষ চিরদিন নিচে থাকবে- এ ধরনের কুসংস্কার পোষণ করা। **এজতেহাদ** (আরবি শব্দ)- কোনো বিষয়ে সত্য নির্ণয়ের জন্য ক্রমাগত গবেষণা। **ধর্মের ব্যাপারী**- বিশেষ বিশেষ ধর্মের যাজক বা পুরোহিত, তাদের মধ্যস্থতায় পরকালে মুক্তি ঘটবে এমন বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। **মুক্তিনামা**- ধর্মযাজকের লেখা প্রশংসাপত্র, যা মৃতব্যক্তির কবরে প্রদান করা হত। পরকালের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে এই আশায় তা দেওয়া হত। **ওয়ারিসী আইন**- মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ওপর তার উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য অংশ সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ। **কুসীদজীবী**- সুদখোর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইসলামি পরিভাষায় স্বভাব বা প্রকৃতিকে কী বলে ?

ক. খাছিলত খ. আখলাক
গ. ফেতরত ঘ. আমালিয়ত

২. রসুলুল্লাহ (স) তাঁর উম্মতদের ‘এজতেহাদ’ করার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ তাতে-

ক. প্রচুর পুণ্য লাভের সম্ভাবনা আছে খ. আলোকিত হবার সম্ভাবনা আছে
গ. নির্ভুল সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা আছে ঘ. আল্লাহ পাকের ঘোষণা আছে

উদ্ধৃতিটি পড় এবং তার আলোকে ৩, ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

'ধর্ম মানে যা মানুষকে ধারণ করে বা পোষণ করে। অন্য কথায়, ব্যক্তিগত বা সমাজগতভাবে যা কিছু মানুষের পক্ষে কল্যাণকর, তাই ধর্ম। সুতরাং যিনি কল্যাণপথের অভিসারী তিনি ধার্মিক। আরও এক কথা–'মানুষের জন্য ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয়।' যে ধর্ম পালন করতে গিয়ে মানুষের অকল্যাণ করতে হয়, তা ধর্ম নয়–ধর্মের নামে ছদ্মবেশী কুসংস্কার।'

৩. উদ্ধৃতিটি একটি-

ক. গল্পের অংশ
খ. উপন্যাসের অংশ
গ. অভিভাষণের অংশ
ঘ. প্রবন্ধের অংশ

৪. উদ্ধৃতাংশে ব্যক্ত হয়েছে-

ক. প্রকৃত ধর্মের পরিচয়
খ. প্রকৃত ধার্মিকের পরিচয়
গ. ধর্মের কল্যাণকর বৈশিষ্ট্য
ঘ. অধর্মের ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্য

৫. উদ্ধৃতাংশে ধর্ম বলতে বোঝানো হয়েছে-

i. মানবকল্যাণকে
ii. মানুষের সদাচরণকে
iii. মানুষের জন্য অবশ্যকরণীয়কে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অনুচ্ছেদটি পড় এবং সে আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ইচ্ছা করলেই বড় বংশে জন্মগ্রহণ করা চলে না; ইচ্ছা করলেই অগাধ ধন-সম্পত্তির অধিকারী কেউ হতে পারে না; ইচ্ছা করলেই মনীষীর মস্তিষ্ক পাওয়া যায় না; ইচ্ছা করলেই সবাই আলেকজান্ডার হতে পারে না, অথচ ইসলাম সর্বজনীন ধর্ম। তার আভিজাত্যের দুয়ারও সবার জন্য মুক্ত থাকা আবশ্যক। তাই ইসলাম বলে, সেই সবচেয়ে বেশি অভিজাত, যে যথাসাধ্য সবচেয়ে সৎকর্মশীল। ধনী-গরিব, সবল-দুর্বল, বেশি বুদ্ধিমান-কম বুদ্ধিমান চেষ্টা করলে এরা সবাই এই আভিজাত্যের অধিকারী হতে পারে।

ক. উদ্ধৃতাংশটি কার প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে ?
খ. 'ইসলামকে 'সর্বজনীন ধর্ম' বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।
গ. 'ইসলাম একটি নিয়তিনির্ভর ধর্মবিশ্বাস।'–উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি মূল্যায়ন কর।
ঘ. 'চেষ্টা করলে এরা সবাই এই আভিজাত্যের অধিকারী হতে পারে।' –উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

মানুষ মুহম্মদ (স)
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

[লেখক পরিচিতি : মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে (২৮শে ভাদ্র ১৩০৩ সাল) সাতক্ষীরা জেলার বাঁশদহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা বঙ্গবাসী কলেজে বি.এ. ক্লাসের ছাত্র থাকাকালীন তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং এখানেই লেখাপড়ার সমাপ্তি ঘটান। এরপর তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি 'মাসিক মোহাম্মদী,' 'দৈনিক মোহাম্মদী,' 'দৈনিক সেবক,' 'সাপ্তাহিক সওগাত', 'সাপ্তাহিক খাদেম', ইংরেজি 'দি মুসলমান' ইত্যাদি পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : মহামানুষ মুহসীন, মরুভাস্কর, সৈয়দ আহমদ, স্বর্ণানন্দিনী, ছোটদের হযরত মুহম্মদ ইত্যাদি। তিনি খুব পরিচ্ছন্ন চিন্তা ও যুক্তিবাদী মন নিয়ে সবকিছুর বিচার করতেন। সহজ সরল প্রকাশভঙ্গি তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর গদ্যশৈলী ঋজু, রচনা সাবলীল। স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি ১৯৩৫ সালে কলকাতা ছেড়ে বাঁশদহে ফিরে আসেন এবং সেখানেই ১৯৫৪ সালের ৮ই নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।]

হযরতের মৃত্যুর কথা প্রচারিত হইলে মদিনায় যেন আঁধার ঘনাইয়া আসিল। কাহারও মুখে আর কথা সরে না; কেহবা পাগলের মত কান্ড শুরু করে। রাসুলুল্লাহর পীড়ার খবর শুনিবার জন্য বহুলোক জমায়েত হইয়াছে। কে একজন বলিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। বীরবাহু ওমর উলঙ্গ তরবারি হাতে লইয়া লাফাইয়া উঠিলেন, যে বলিবে হযরত মরিয়াছেন, তাহার মাথা যাইবে।

মহামতি আবুবকর শেষ পর্যন্ত হযরতের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে ছিলেন। তিনি গম্ভীরভাবে জনতার মধ্যে দাঁড়াইলেন। বলিলেন, যাহারা হযরতের পূজা করিত, তাহারা জানুক তিনি মারা গিয়াছেন ; আর যাহারা আল্লাহর উপাসক, তাহাদের জানা উচিত আল্লাহ অমর, অবিনশ্বর। আল্লাহর সুস্পষ্ট বাণী : মুহম্মদ (স) একজন রাসুল বৈ আর কিছু নন। তাঁহার পূর্বে আরও অনেক রাসুল মারা গিয়াছেন। রাসুলুল্লাহ (স) মরিতে পারেন, নিহত হইতে পারেন ; তাই বলিয়া তিনি যেই সত্য তোমাদের দিয়া গেলেন তাহাকে কি তোমরা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবে না? এই বিশ্বভুবনে ঐ দূর অন্তরীক্ষে যাহা কিছু দেখিতে পাও সবই আল্লাহর সৃষ্টি, তাঁহারই দিকে সকলের মহাযাত্রা।

হযরত আবুবকরের গম্ভীর উক্তিতে সকলেরই চৈতন্য হইল। হযরত ওমরের শিথিল অঙ্গ মাটিতে লুটাইল। তাঁহার স্মরণ হইল হযরতের বাণী : আমি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ মাত্র। তাঁহার মনে পড়িল কুরআনের আয়াত : মুহম্মদ, মৃত্যু তোমারও ভাগ্য, তাহাদেরও ভাগ্য। তাঁহার অন্তরে ধ্বনিয়া উঠিল মুসলিমের গভীর প্রত্যয়ের স্বীকারোক্তি- অমর সাক্ষ্য : মুহম্মদ (স) আল্লাহর দাস (মানুষ) ও রাসুল।

শোকের প্রথম প্রচন্ড আঘাতে আত্মবিস্মৃতির পূর্ণ সম্ভাবনার মধ্যে দাঁড়াইয়া স্থিতধী হযরত আবুবকর (রা) রাসুলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সীমারেখা সৃষ্টি করিয়া তুলিলেন। তিনি রাসুল, কিন্তু তিনি মানুষ, আমাদেরই মতো দুঃখ-বেদনা, জীবন-মৃত্যুর অধীন রক্ত-মাংসে গঠিত মানুষ- এই কথাই বৃদ্ধ হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা) মূর্ছিত মুসলিমকে বুঝাইয়া দিলেন।

তিনি মানুষের মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন মুখ্যত তাঁহার মানবীয় গুণাবলি দ্বারা। মক্কার শ্রেষ্ঠ বংশে তিনি জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু বংশগৌরব হযরতের সচেতন চিত্তে মুহূর্তের জন্যও স্থানলাভ করে নাই।

জন্মদুঃখী হইয়া তিনি সংসারে আসিয়াছিলেন। এই দুঃখের বেদনা তাঁহার দেহসৌন্দর্য ও চরিত্র-মাধুরীর সহিত মিলিয়া তাঁহাকে নরনারীর একান্ত প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। আবাল্য তিনি ছিলেন আল-আমিন- বিশ্বস্ত, প্রিয়ভাষী, সত্যবাদী। তাঁহার অসাধারণ যোগ্যতা, বুদ্ধি, বিচারশক্তি, বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়া মানুষ অবাক হইয়া যাইত। এই সকল গুণ বিবি খাদিজাকে আকর্ষণ করিয়াছিল।

বস্তুত হযরতের রূপলাবণ্য ছিল অপূর্ব, অসাধারণ। মক্কা হইতে মদিনায় হিযরতের পথে এক পরহিতব্রতী দম্পতির কুটিরে তিনি আশ্রয় নেন। রাহী-পথিকদের সেবা করাই ছিল তাহাদের ব্রত। হযরত যখন আসিলেন, কুটিরস্বামী আবু

মা'বদ মেষপাল চরাইতে গিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী উম্মে মা'বদ ছাগীদুগ্ধ দিয়া হযরতের তৃষ্ণা দূর করিলেন। গৃহপতি ফিরিলে এই নারী স্বামীর কাছে নব অতিথির রূপ বর্ণনা করেন, সুন্দর, সুদর্শন পুরুষ তিনি। তাঁহার শীর্ষে সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশপাশ, বয়ানে অপূর্ব কান্তশ্রী। তাঁহার আয়তকৃষ্ণ দুটি নয়ন, কাজল রেখার মতো যুক্ত ভ্রূযুগল, তাঁহার সুউচ্চ গ্রীবা, কালো কালো দুটি চোখের ঢলঢল চাহনি মনপ্রাণ কাড়িয়া নেয়। গুরুগম্ভীর তাঁহার নীরবতা, মধুবর্ষী তাঁহার মুখের ভাষণ, বিনীত নম্র তাঁহার প্রকৃতি। তিনি দীর্ঘ নন, খর্ব নন, কৃশ নন। এক অপূর্ব পুলকদীপ্তি তাঁহার চোখেমুখে, বলিষ্ঠ পৌরুষের ব্যঞ্জনা তাঁহার অঙ্গে। বড় সুন্দর, বড় মনোহর সেই অপরূপ রূপের অধিকারী।

সত্যই হযরত বড় সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। তাঁহার চেহারা মানুষের চিত্ত আকর্ষণে যতটুকু সহায়তা করে, তাহার সবটুকু তিনি পাইয়াছিলেন। সত্যের নিবিড় সাধনায় তাঁহার চরিত্র মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল। কাছে আসিলেই মানুষ তাঁহার আপনজন হইয়া পড়িত। অকুতোভয় বিশ্বাসে তিনি অজেয় হইয়াছিলেন। শত্রুর নিষ্ঠুরতম নির্যাতন তাঁহার অন্তরের লৌহকপাটে আহত হইয়া ফিরিয়া যাইত। কিন্তু সত্যে তিনি বজ্রের মতো কঠিন, পর্বতের মতো অটল হইলেও করুণায় তিনি ছিলেন কুসুমকোমল। বৈরীর অত্যাচারে বারবার তিনি জর্জরিত হইয়াছিলেন, শত্রুর লোস্ট্রাঘাতে-অরাতির হিংস্র আক্রমণে বরাঙ্গের বসন তাঁহার বহুবার রক্তরঙিন হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি পাপী মানুষকে তিনি ভালোবাসিয়াছিলেন, অভিশাপ দেওয়ার চিন্তাও তাঁহার অন্তরে উদিত হয় নাই। মক্কার পথে প্রান্তরে পৌত্তলিকের প্রস্তরঘায়ে তিনি আহত হইয়াছেন, ব্যঙ্গাবিদ্রুপে বারবার তিনি উপহাসিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার অন্তর ভেদিয়া একটি মাত্র প্রার্থনার বাণী জাগিয়াছে : এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা কর।

তায়েফে সত্য প্রচার করিতে গিয়া তাঁহাকে কী ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, আমরা দেখিয়াছি। পথ চলিতে শত্রুর প্রস্তরঘায়ে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন; তখন তাহারাই আবার তাঁহাকে তুলিয়া দিতেছিল। তিনি পুনর্বার চলা শুরু করিলে দ্বিগুণ তেজে পাথরবৃষ্টি করিতেছিল। রক্তে রক্তে তাঁহার সমস্ত বসন ভিজিয়া গিয়াছে, দেহ নিঃসৃত রুধিরধারা পাদুকায় প্রবেশ করিয়া জমিয়া শক্ত হইয়াছে, মৃত্যুর আবছায়া তাঁহার চৈতন্যকে সমাচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, তথাপি অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তাঁহার বিন্দুমাত্র অভিযোগ নাই। রমণীর রূপ, গৃহস্থের ধনসম্পদ, নেতৃত্বের মর্যাদা, রাজার সিংহাসন সব কিছুকে তুচ্ছ করিয়া সেই সত্যকে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্বল জ্ঞানে আশ্রয় করিয়াছিলেন ; তাঁহাকে উপহাসিত, অবহেলিত, অস্বীকৃত দেখিয়াও ক্রোধ, ঘৃণা বা বিরক্তির একটি শব্দও তাঁহার মুখে উচ্চারিত হয় নাই। অভিসম্পাত করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি বলিলেন : না না, তাহা কখনই সম্ভব নয়। এই পৃথিবীতে আমি ইসলামের বাহন, সত্যের প্রচারক। মানুষের দ্বারে দ্বারে সত্যের বাণী বহন করা আমার কাজ। আজ যাহারা সত্যকে অস্বীকার করিতেছে, তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছে, হয়তো কাল তাহারা-তাহাদের অনাগত বংশধরেরা ইসলাম কবুল করিবে। আপনার আঘাত জর্জরিত দেহের বেদনায় তিনি কাতর। সত্যকে ব্যাহত দেখিয়া মনের ব্যথা তাঁহার সেই কাতরতাকে ছাপাইয়া উঠিল। তিনি ঊর্ধ্বদিকে বাহু প্রসারণ করিয়া বলিলেন : তোমার পতাকা যদি দিয়াছ প্রভু, হীন আমি, তুচ্ছ আমি, নির্বল আমি, তাহা বহন করিবার শক্তি আমায় দাও। বিপদাবরণ তুমি, অশরণের শরণ তুমি, তোমার সত্য মানুষের দ্বারে পৌঁছাইয়া তাহাকে উন্নীত করিলেন যাঁহারা -তাঁহাদের পংক্তিতে আমায় স্থান দাও।

মক্কাবাসীরা হযরতের নবিত্ব লাভের শুরু হইতেই তাঁহার প্রতি কী নির্মম অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়াছিল, আমরা দেখিয়াছি। যখন তাহাদের নির্যাতন সহনাতীত হইল, যখন দেখা গেল, কোরেশরা সত্যকে গ্রহণ করিবে না, হযরত মদিনায় চলিয়া গেলেন। পথে তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য, তাঁহার ও হযরত আবুবকরের ছিন্ন মুণ্ড আনিবার জন্য বিপুল পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া, শত শত ঘাতক ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের মতো হিংস্র ঘাতক পাঠানো হইল। বদর, ওহোদ ও আহযাব (বা খন্দক) যুদ্ধে মক্কার বাসিন্দা এবং তাহাদের মিত্রজাতিরা সম্মিলিত হইয়া ইসলামের ও মুসলিমের চিহ্নটুকু পর্যন্ত ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণ করিল। খয়বরের যুদ্ধে হযরতের পরাজয়ের মিথ্যা সংবাদ শুনিয়া হযরতের মৃত্যু সম্ভাবনায় আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িল। হুদায়বিয়া সন্ধিতে হযরতের শান্তিপ্রিয়তার সুযোগ লইয়া

মুসলিমের স্কন্ধে ঘোর অপমানের শর্ত চাপাইয়া দেওয়ার পরও তাহাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে চাহিল এবং তারপর হযরত যেই দিন বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করিলেন, সেই দিনও তাঁহার সহিত যুদ্ধকামনা করিয়া খালিদের সহিত হাঙ্গামা বাঁধাইয়া দিল। এইভাবে শেষ পর্যন্ত যাহারা পদে পদে আনিয়া দিল লাঞ্ছনা, অপমান, অত্যাচার, নির্যাতন, প্রত্যেক সুযোগে যাহারা হানিল বৈরিতার বিষাক্ত বাণ; হযরত তাঁহাদের সহিত কী ব্যবহার করিলেন ? জয়ীর আসনে বসিয়া ন্যায়ের তুলাদণ্ড হাতে লইয়া বলিলেন : ভাইসব, তোমাদের সম্বন্ধে আমার আর কোনো অভিযোগ নাই, আজ তোমরা সবাই স্বাধীন, সবাই মুক্ত। মানুষের প্রতি প্রেমপুণ্যে উদ্ভাসিত এই সুমহান প্রতিশোধ সম্ভব করিয়াছিল হযরতের বিরাট মনুষ্যত্ব।

শুধু প্রেম-করুণায় নয়, মানুষ হিসাবে আপনার তুচ্ছতাবোধ আপনার ক্ষুদ্রতার অনুভূতি তাঁহার মহিমাগৌরবকে মুহূর্তের জন্যও ছাপাইয়া উঠিতে পারে নাই। মক্কাবিজয়ের পর হযরত সাফা পর্বতের পার্শ্বে বসিয়া সত্যান্বেষী মানুষকে দীক্ষা দান করিতেছেন, এমন সময় একটি লোক তাঁহার কাছে আসিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। হযরত স্মিতমুখে তাহাকে বলিলেন, কেন তুমি ভয় পাইতেছ? ভয়ের কিছুই এখানে নাই। আমি রাজা নই, সম্রাট নই, মানুষের প্রভু নই। আমি এমন এক নারীর সন্তান, সাধারণ শুষ্ক মাংসই ছিল যাঁহার নিত্যকার আহার্য।

মহামহিমার মাঝখানে আপনার সামান্যতম এই অনুভূতিই হযরতের চরিত্রকে শেষ পর্যন্ত সুন্দর ও স্বচ্ছ রাখিয়াছিল। মানুষ ত্রুটির অধীন, হযরতও মানুষ, সুতরাং তাঁহারও ত্রুটি হইতে পারে এই যুক্তির বলে নয়, বরং তাঁহার অনাবিল চরিত্রের স্বচ্ছ সহজ প্রকাশ মর্যাদাহানির আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া, লোকচক্ষে সম্ভাবিত হেয়তার ভয় অবহেলায় দূর করিয়া তিনি অকুতোভয়ে আত্মদোষ উদঘাটন করিয়াছেন। একদিন তিনি মক্কার সম্ভ্রান্ত লোকদের কাছে সত্য প্রচারে ব্রতী। মজলিসের এক প্রান্তে বসিয়া একটি অন্ধ । সম্ভবত সে হযরতের দুই একটি কথা শুনিতে পায় নাই। বক্তৃতার মাঝখানে একটি প্রশ্ন করিয়া সে হযরতকে থামাইল। বাধা পাইয়া হযরতের মুখে ঈষৎ বিরক্তির আভাস ফুটিয়া উঠিল, তাঁহার ললাট সামান্য কুঞ্চিত হইল।

ব্যাপারটি এমন কিছুই গুরুতর নয়। বক্তৃতায় বাধা হইলে বিরক্তি অতি স্বাভাবিক। আবার দুঃখী দুর্বল লোকদের হযরত বড় আদর করিতেন, কাহারও ইহা অজ্ঞাত নয়। সুতরাং তিনি অন্ধকে ঘৃণা করিয়াছেন, কাঙাল বলিয়া তাহাকে হেলা করিয়াছেন, এই কথা কাহারও মনে আসে নাই। কিন্তু তাঁহার এই তুচ্ছতম ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত আসিল কুরআনের একটি বাণীতে। তিনি বিনা দ্বিধায়, বিনা সঙ্কোচে তাহা সকলের কাছে প্রচার করিলেন।

মানুষ হিসাবে যে ক্ষুদ্রতাবোধ, মানুষের সহজ দৈন্যের যে নির্মল অনুভূতি হযরতকে আপনার দোষত্রুটি সাধারণের চক্ষে এমন নির্বিকারভাবে ধরাইয়া দিতে প্ররোচিত করিয়াছিল, তাহাই আবার তাঁহার মহিমান্বিত জীবনে ইচ্ছা–স্বীকৃত দারিদ্র্যের মাঝখানে প্রদীপ হইয়া জ্বলিয়াছিল। অনাত্মীয় পরিপার্শ্বের মধ্যেও নিবিড় নির্বিচার ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্বীকৃতি ও আনুগত্য তিনি বড় অল্প পান নাই। শত শত, বরং সহস্র সহস্র মুসলিম তাঁহার ব্যক্তিগত পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিতে সর্বদা শুধু ইচ্ছুক নয়, সমুৎসুক ছিল। কিন্তু হযরত আপনাকে দশজন মানুষের মধ্যে একজন গণনা করিলেন, সকলের সঙ্গী সহচররূপে সহোদর ভাইয়ের মতাদর্শ প্রয়াসী নেতার কর্তব্য পালন করিলেন। সত্যের জন্য অত্যাচার নির্যাতন সহিলেন, দুঃখে-শোকে অশ্রুনীরে তিতিয়া আল্লাহর নামে সান্ত্বনা মানিলেন, দেশের রাজা-মানুষের মনের রাজা হইয়া স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যের কণ্টক মুকুট মাথায় পরিলেন। তাই তাঁহার গৃহে সকল সময় অন্ন জুটিত না, নিশার অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালিবার মতো তৈলটুকুও সময় সময় মিলিত না। এমনি নিঃস্ব কাঙালের বেশে মহানবী মৃত্যু রহস্যের দেশে চলিয়া গেলেন।

স্বামীর মহাপ্রয়াণে বিয়োগবিধুরা আয়েশার বক্ষ ভেদিয়া শোকের মাতম উঠিল, মানুষের মঙ্গল সাধনায় যিনি অতন্দ্র রজনী যাপন করিলেন, সেই সত্যাশ্রয়ী আজ চলিয়া গেলেন। নিঃস্বতাকে সম্বল করিয়া যিনি বিশ্বমানবের জন্য আপনাকে বিলাইয়া দিলেন, তিনি আজ চলিয়া গেলেন। সাধনার পথে শত্রুর আঘাতকে যিনি অম্লান বদনে সহিলেন, সেই ধার্মিক আজ চলিয়া গেলেন। পাপ-অন্যায় যাহাকে স্পর্শ করে নাই, সেই প্রিয়নবী আজ চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। হায়, সেই দয়ার নবী, মানুষের মঙ্গল বহিয়া আনিবার অপরাধে প্রস্তরঘায়ে যাঁহার দাঁত ভাঙিয়াছিল, প্রশস্ত ললাট রুধিরাক্ত

হইয়াছিল, আর সেই আহত জর্জরিত মুমূর্ষু দশাতেও যিনি শত্রুকে প্রেমভরে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, তিনি আজ জীবন-নদীর ওপারে চলিয়া গেলেন। দুই বেলা পূর্ণোদর আহারও যাঁহার ভাগ্যে হয় নাই, ত্যাগ ও তিতিক্ষার মূর্ত প্রকাশ মহানবী আজ চলিয়া গেলেন। বিবি আয়েশার মর্মছেঁড়া এই বিলাপ সমস্ত মানুষের, সমগ্র বিশ্বের। শুধু সত্য সাধনায় নয়, শুধু উর্ধ্ব লোকচারী মহাব্রতীর তত্ত্বানুসন্ধানে নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারে হযরত মোস্তফা ইতিহাসের একটি অত্যন্ত অসাধারণ চরিত্র। ত্যাগ, প্রেম, সাধুতা, সৌজন্য, ক্ষমা, তিতিক্ষা, সাহস, শৌর্য, অনুগ্রহ, আত্মবিশ্বাস, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সমদর্শন—চরিত্র সৌন্দর্যের এতগুলি দিকের সমাহার ধুলোমাটির পৃথিবীতে বড় সুলভ নয়। তাই মানুষের একজন হইয়াও তিনি দুর্লভ, আমাদের অতি আপনজন হইয়াও তিনি অনুকরণীয়, বরণীয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'মানুষ মুহম্মদ (স)' প্রবন্ধটি মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচিত 'মরু ভাস্কর' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

মূলবক্তব্য

হযরত মুহম্মদ (স)-এর মানবীয় গুণাবলি এ প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। হযরত ছিলেন মানুষের নবী। তাই মানুষের পক্ষে যা আচরণীয় তিনি তারই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তিনি বিপুল ঐশ্বর্য, ক্ষমতা ও মানুষের অগাধ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার মধ্যে থেকেই একজন সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করে গেছেন। ক্ষমতা ও মহত্ত্ব, প্রেম ও দয়া তাঁর অজস্র চারিত্রিক গুণের মধ্যে প্রধান। তাঁর সারাজীবন মানব জাতির কল্যাণের জন্য নিয়োজিত ছিল। মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসেবে তিনি তাঁর জীবন রূপায়িত করে তুলেছিলেন। তাঁর সাধনা, ত্যাগ, কল্যাণচিন্তা ছিল বিশ্বের সমগ্র মানুষের জন্য অনুকরণীয়। হযরতের মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীগণের মধ্যে যে বেদনা ও হতাশা দেখা দিয়েছিল তা সংবরণ করার জন্য হযরত আবুবকর (রা) মহানবী (স)-এর জীবনের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে প্রচণ্ড শোককে শান্ত করেন। মানুষ হিসেবে হযরতের বৈশিষ্ট্যের আলোচনাই এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

শব্দার্থ ও টীকা

বীরবাহু- শক্তিধারী। **স্থিতধী-** স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন। **ধী-** বুদ্ধি। **রাসুল-** আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। **পরহিতব্রতী-** পরের উপকারে নিয়োজিত। **বয়ান-** মুখনিঃসৃত বাণী। **গ্রীবা-** ঘাড়। **অকুতোভয়-** নির্ভয়। **নির্যাতন** - অত্যাচার, জুলুম। **কুসুমকোমল-** ফুলের মতো নরম। **লোষ্ট্রাঘাত-** ঢিলের আঘাত। **বৈরী-** শত্রু। **অরাতি-** শত্রু। **পৌত্তলিক-** মূর্তিপূজক। **তিতিয়া-**ভিজে। **সমাচ্ছন্ন-** অভিভূত। **পূর্ণোদর-** ভরপেট।

বীরবাহু ওমর- ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) ছিলেন একজন তেজস্বী বীরযোদ্ধা। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কোরেশ বংশোদ্ভূত তরুণ বীর ওমর মহানবীকে হত্যা করার সংকল্প নিয়ে যখন যাচ্ছিলেন তখন তাঁর ভগ্নীর কণ্ঠে পবিত্র কুরআনের বাণী শুনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হযরত ওমর (রা) ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা, ন্যায়পরায়ণ শাসক ও মহানবীর বিশ্বাসভাজন সাহাবা।

রুধিরাক্ত- রক্তাক্ত, রক্তরঞ্জিত। **রাহী-** পথিক, মুসাফির। **পুলকদীপ্তি-** আনন্দের উদ্ভাস। **অনুরুদ্ধ-** অনুরোধ করা হয়েছে এমন।

মহামতি আবুবকর- ইসলামের প্রথম খলিফা এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রথম পুরুষ ব্যক্তি। তিনি ছিলেন মহানবীর হিযরতকালীন সঙ্গী এবং সারাজীবনের বিশ্বস্ত সহচর। তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ, আদর্শবাদী ও ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ।

মক্কা- সৌদি আরবের অন্যতম প্রধান নগরী। এখানে আল্লাহর ঘর কাবা শরিফ বিদ্যমান। এই নগরীতে রাসুলুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন।

মদিনা- সৌদি আরবে অবস্থিত মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় সম্মানিত নগরী। এখানে হযরত মুহম্মদ (স) এবং হযরত আবু বকরের (রা) মাজার রয়েছে।

হিজরত-শাব্দিক অর্থ পরিত্যাগ। এখানে মক্কা ত্যাগ করে মদিনা যাত্রা বোঝানো হয়েছে। এই সময় থেকে হিজরি সাল গণনার শুরু।

তায়েফ-সৌদি আরবের দক্ষিণাঞ্চলের একটি উর্বর প্রদেশ।

বদর, ওহোদ, আহযাব, খয়বর-হযরতের জীবনকালে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে এইসব স্থানে মুসলমানদের যুদ্ধ হয়েছিল।

হুদায়বিয়া- একটি যুদ্ধক্ষেত্র, এই স্থানে বিধর্মীদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ (স)-এর একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এ সন্ধি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং রাসুলুল্লাহর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

খালিদ- হযরতের জীবিতকালে ইসলামের প্রখ্যাত বীর যোদ্ধা এবং সেনাপতি।

সাফা- সাফা ও মারওয়া দুটি ছোট পাহাড় কাবার নিকটে অবস্থিত। হযরত ইবরাহিম (আ)-এর স্ত্রী বিবি হাজেরা শিশুপুত্র ইসমাইলের পিপাসা নিবারণের জন্য পানির সন্ধানে এই দুই পাহাড়ের মধ্যে ছোটাছুটি করেছিলেন। সেই স্মৃতি রক্ষার্থে আজও হজব্রতীরা সাফা-মারওয়ায় দৌড়ে থাকেন।

আয়েশা (রা)- হযরত আবুবকরের কন্যা, রাসুলুল্লাহর (স) অন্যতম সহধর্মিণী, বিদুষী রমণী ছিলেন। হযরতের ইন্তেকালের পর তিনি বহু হাদিস উদ্ধৃত করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১, ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

হযরত মুহম্মদ (স.) ছিলেন মানুষের নবী। তাই মানুষের পক্ষে যে সকল আচরণ শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক, তারই আদর্শ তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। সত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মানুষের কাছে উপহাসিত ও অবহেলিত হয়েও ক্রোধ ও ঘৃণার একটি শব্দও তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়নি। তাঁর অন্তর ভেদ করে প্রার্থনার বাণী জেগে উঠেছিল– 'এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা কর।'

১. অনুচ্ছেদটিতে হযরত মুহম্মদ (স.)– এর শ্রেষ্ঠত্বের কোন গুণটির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে?

ক. সত্যনিষ্ঠা   খ. ক্ষমাশীলতা
গ. মানবিকতা   ঘ. সহনশীলতা

২. সত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হযরত মুহম্মদ (স.) কাদের কাছে উপহাসিত হয়েছিলেন?

ক. ক্যাথলিকদের   খ. পৌত্তলিকদের
গ. ইহুদিদের   ঘ. অগ্নি উপাসকদের

৩. ‘এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা কর’ — উক্তিটির মধ্য দিয়ে হযরত মুহম্মদ (স.)– এর চরিত্রের কোন দিক ফুটে উঠেছে?

i. ক্ষমাশীলতা

ii. উদারতা

iii. সহনশীলতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. i ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

মানব সভ্যতার ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহম্মদ (স.)। উদার মানবিকতার আদর্শ ও অখণ্ড সত্যদৃষ্টির আলোকে পৃথিবীর মানুষের সামনে তিনি ন্যায় ও সাম্যের ধ্রুবচিত্র তুলে ধরেছেন। নবুয়ত লাভের পর থেকেই মক্কার পৌত্তলিকদের নির্মম অত্যাচার সহ্য করে তিনি সত্য প্রচারে ছিলেন অবিচল এবং অটল। বদর, ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ থেকে শুরু করে নানা অবস্থায় হযরতকে রক্তাক্ত করে তুলেছিল শত্রুরা। অথচ হযরত মুহম্মদ (স.)-এর অন্তর ভেদ করে প্রার্থনার বাণী জেগে উঠেছে– ‘এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা কর।’

ক. পৌত্তলিক কারা?

খ. হযরত মুহম্মদ (স.) প্রবর্তিত ন্যায় ও সাম্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

গ. অনুচ্ছেদে হযরত মুহম্মদ (স.)-এর যে জীবনাদর্শের পরিচয় আছে, আমাদের সমাজে তার প্রতিফলন আলোচনা কর।

ঘ. ‘এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা কর।’ – উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

কবি ও বৈজ্ঞানিক

কাজী মোতাহার হোসেন

[লেখক পরিচিতি : কাজী মোতাহার হোসেন ৩০শে জুলাই ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার বাগমারা গ্রামে। সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, সংগীতজ্ঞ ও দাবাড়ু হিসেবে তিনি খ্যাতিমান ছিলেন। তিনি কৃতিত্বপূর্ণ শিক্ষাজীবনের অধিকারী ছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর, ১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত গণিতে স্নাতকোত্তর এবং ১৯50 সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত ও পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং পরে গণিত, তথ্য গণিত বা সংখ্যাতত্ত্বের প্রফেসর, পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউটের পরিচালক, জাতীয় অধ্যাপক প্রভৃতি মর্যাদাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' সংগঠন ও 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার ও স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন। সঞ্চরণ, নজরুল কাব্য পরিচিতি, গণিত শাস্ত্রের ইতিহাস, আলোক বিজ্ঞান, নির্বাচিত প্রবন্ধ ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি ১৯৮১ সালের ৯ই অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।]

কবি ও বৈজ্ঞানিক দুজনই সাধক, দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। এ দুয়ের সাধনা যেমন বিভিন্ন, দৃষ্টি ও সৃষ্টিও তেমনি পৃথক।

কবির দৃষ্টিতে তিনি কেবল বস্তু বা ঘটনা দেখেন না; এ সবের ভেতর দিয়ে কী যেন এক অস্পষ্ট আভাস বা ইঙ্গিত দেখতে পান। সে ইঙ্গিত অনেক সময় সাধারণ মানুষের মনের কল্পনাকেও আলোড়িত করে তোলে এবং কল্পনায় উদ্বুদ্ধও করে। সে কল্পনার ছায়ায় পৃথিবীর চিত্র বেশ স্নিগ্ধ মনোহর উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে, তখন পৃথিবীটা আর আমাদের নিত্যগোচর পৃথিবী থাকে না- কল্পনার স্বর্গে পরিণত হয়। সেই স্বর্গরাজ্য কল্পনাকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে, কিন্তু কবির কাছে তা কিছু কম বাস্তব নয়, আর সাধারণ লোকের মনে যে আনন্দের সৃষ্টি করে সেটাও কিছু তুচ্ছ ব্যাপার নয়। জড়পিণ্ড সংসারটা প্রাণের স্পন্দনে সচকিত হয়ে ওঠে, প্রত্যেক তুচ্ছ ঘটনা অর্থবহ হয়ে ওঠে। তাতে করে কবির সহানুভূতি ও আত্মীয়তার পরিধি শতগুণ বেড়ে যায়।

কবির সত্য শুধু বর্তমানের নয়—তা অতীতের সুখস্মৃতি উদ্দীপন করে, আর ভবিষ্যতের অপ্রাপ্ত মোহনীয় যুগের আগমনী জানায়। এই আগমনী সুরের রেশ ধরে ধরে জগৎ ক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। এভাবে কবি যুগে যুগে জগৎকে পঙ্কিলতা থেকে বাঁচিয়ে, সুমার্জিত করে, নৈতিক ও মানসিক চেতনার সঞ্চার করে মহাকল্যাণ সাধন করেছেন।

দার্শনিকও নতুন নতুন ভাবের বন্যা এনে জগৎকে ভাবের দিক দিয়ে আরও নিবিড় করে দেখতে শিখাচ্ছেন। কিন্তু তিনি অনেকটা কবিপ্রকৃতির হলেও কবির সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এই যে, তিনি কবির মতো অত বিপুল ও চিত্তাকর্ষকভাবে লোককে বোঝাতে পারেন না। দার্শনিক সাধারণ লোকের মনের মানুষ বা চিন্তার মানুষ, আর কবি যেন তাঁর ঠিক হৃদয়ের মানুষটি। তাই দার্শনিকের চেয়ে কবির বাণী আরও প্রত্যক্ষভাবে লোকের চিত্ত অধিকার করে।

ওদিকে বৈজ্ঞানিক সচরাচর দৃশ্যমান জগতের প্রত্যেক বস্তু ও ঘটনাকেই বিশেষভাবে পরখ করে দেখতে চান। তাঁর কাছে ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয়াদির প্রাধান্য নাই। ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত কোনো জিনিস নাই, বৈজ্ঞানিক কোনোদিন এমন কথা বলেন না- কিন্তু তার সম্ভাব্যতা স্বীকার করলেও, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর চেয়ে ও বিষয়ে চুপ থাকা বা উপেক্ষা করাকেই বেশি বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেন। তিনি কাজের লোক, যা সামনে আসছে তারই রহস্য নিয়ে ব্যস্ত, মাথা খাটিয়ে রহস্য সৃষ্টি করে আর আপদ বাড়ানো শ্রেয় জ্ঞান করেন না। কিন্তু তাই বলে, নতুন রহস্য যখন সত্যি সত্যিই আসে, বৈজ্ঞানিক সে সময় কস্মিনকালেও উদাসীন থাকেন না। নতুন নতুন রহস্য নির্ণয় করেই তো বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করে চলেছেন। বৈজ্ঞানিক হাজার হাজার সমস্যার সমাধান করতে অপারগ, একথা তিনি ভালো রকমেই জানেন। এ জন্য তাঁর মনে গর্বের ভাব কখনও আসে না।

বৈজ্ঞানিক জানেন, তিনি অনেক কিছু করেছেন, সংসারের জ্ঞানভাণ্ডারে অনেক সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট নন- তিনি যে অনন্ত কোটি রহস্যের উদ্দেশ পান নাই এবং যে সমস্ত উপস্থিত রহস্যের স্বরূপ নির্ণয় করতে

পারেন নাই, তার জন্য অত্যন্ত বিনীত ও নম্রভাবে সাধনা করে যাচ্ছেন। তিনি নিজের মনে নিজেই সংকুচিত ; এর পরও যদি কেউ বলেন, 'অমুক সাধারণ ব্যাপারটাই যখন সৃষ্টির আদিকাল থেকে এ পর্যন্ত কোনো বৈজ্ঞানিক মীমাংসা করতে পারলেন না, তখন আর বিজ্ঞানের মূল্য কী?' তা হলে বোধ হয় অনেকখানি অন্যায় ও অবিচার করা হবে।

বৈজ্ঞানিক বস্তু বা ঘটনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করেন, তাতে ছিন্নভিন্ন করে অশ্রদ্ধার সঙ্গে ফেলে দেবার জন্য নয়। তার ভেতরকার সত্যটি আবিষ্কার করে জগতের অন্যান্য সত্যের সঙ্গে তাকে শ্রেণীবন্ধ করে যথার্থভাবে গাঁথবার জন্যই। এর জন্য বৈজ্ঞানিকের নির্দয়, পাষাণ প্রভৃতি অনেক আখ্যা মিলেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যদি কখনও নিষ্ঠুরও হন, তবু সে সত্য সুন্দরের জন্য-সে রকম নিষ্ঠুরতার তুলনা বিশ্বস্রষ্টার জাগতিক নিয়মে অনবরতই দেখতে পাচ্ছি।

কবি দেখতে চান জগৎ ব্যাপারের অতীত সৌন্দর্য, আর বৈজ্ঞানিক দেখতে চান তার অন্তর্নিহিত সত্য। কবির সৌন্দর্য যেমন সত্য, বৈজ্ঞানিকের সত্যও তেমনি সুন্দর। কবির কল্পনাতুলিকার স্পর্শে মানুষ অতীন্দ্রিয় লোকে উঠে গিয়ে আত্মভোলা হয়ে যায়, আর বৈজ্ঞানিকের পরিমাপরজ্জু তার কল্পনার ফানুস টেনে ধরে বলে আবার তার স্থায়ী আত্মানুভূতি ফিরে আসে। কবি স্থূল সংসারটাকে অনেকখানি উপেক্ষা করে কল্পলোকের অমৃতের লোভে আকাশে বিচরণ করেন। তার সে বিচরণ নিরর্থক হয় না- তিনি সত্যি সত্যিই কিছু না কিছু অমৃত বা সুধা পান করে জগৎবাসীর জন্য কিছু নিয়ে আসেন। আবার বৈজ্ঞানিক, পৃথিবীর স্থায়ী প্রাপ্তিকে সর্বদা মুঠোর ভেতর রেখে, নিশ্চিতকে না ছেড়ে, ঐরূপ নিশ্চিত আর সত্য সুধার সন্ধানে ফেরেন। এখানে তিনিও কল্পনাপ্রিয় দার্শনিকের মতো। কিন্তু এর কল্পনা প্রধানত মস্তিষ্কের ওপর নির্ভর করে না- বৈজ্ঞানিকের কল্পনা যেন শরীরী; তাঁর অন্তর বাইরের সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে জড়জগতের সমস্ত উপাদান দিয়ে তিনি তাঁর কল্পসুন্দরীর মন যোগাচ্ছেন। তার ফলে তিনি সুন্দরী প্রকৃতির কাছ থেকে অতি সঙ্গোপনে যে গোপন রহস্যবাণী শুনতে পাচ্ছেন, তা সোনার থালায় সাজিয়ে জগজ্জনের সামনে ধরছেন।

জগৎ এ জন্য কবি ও বৈজ্ঞানিক দুজনের নিকটই কৃতজ্ঞ। বৈজ্ঞানিক না থাকলে কবির কল্পনা খেয়াল হয়ে ধোঁয়ার মতো শূন্যে মিলিয়ে যেত, আর কবিচিত্ত না থাকলে, বৈজ্ঞানিকের সাধনা পৃথিবীর ধুলোমাটির মধ্যে মাথা কুটে মরত।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'কবি ও বৈজ্ঞানিক' প্রবন্ধটি কাজী মোতাহার হোসেন রচিত 'সঞ্চরণ' গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

মূলবক্তব্য

আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন যে, আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী পথের পথিক কবি আর বৈজ্ঞানিক। তাঁদের উভয়ের সাধনক্ষেত্রের ঐক্য এবং কোথায় তাঁদের যথার্থ পার্থক্য সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। কবি কল্পনা জগতে আর বৈজ্ঞানিক বাস্তব জগতে বিচরণ করেন। কিন্তু তাঁরা উভয়েই সাধক, দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। কবি বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যের খোঁজ করেন, আর বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান করেন। উভয়ের সাধনার ফলেই মানুষের জীবন আনন্দময় ও সুখকর হয়ে ওঠে। তাই এ জগৎ কবি ও বৈজ্ঞানিক দুজনের কাছেই কৃতজ্ঞ।

শব্দার্থ ও টীকা

সাধক- যিনি সাধনা করেন। **দ্রষ্টা**- যিনি দেখেন। **স্রষ্টা**- যিনি সৃষ্টি করেন। **নিত্যগোচর**- যা সব সময় চোখের সামনে আছে। **জড়পিন্ড**- প্রাণহীন বস্তু। **পরিধি**- সীমানা। **পঙ্কিলতা**- মলিনতা। **চিত্তাকর্ষক**- মনোমুগ্ধকর। **দৃশ্যমান**- যা দেখা যাচ্ছে। **ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত** - ইন্দ্রিয় দিয়ে জানার বাইরে অর্থাৎ যা দেখাশোনা, ধরাছোঁয়া ও গন্ধ লাভের বাইরে। **কস্মিনকালেও** - কোনো কালেও। **অপারগ**- অসমর্থ। **অনেকখানি অন্যায় ও অবিচার করা হয়**- বৈজ্ঞানিক সকল রহস্যের সমাধান দেবেন এমন নয়। রহস্যের সন্ধানে তাঁর সাধনার শেষ নেই। বৈজ্ঞানিকের সাধনার ফলেই নিত্যনতুন আবিষ্কার দেখা যায়। তবে সবকিছুর এখনই সমাধান দিতে হবে এমন আশা করা অযৌক্তিক। **পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে**- খুঁটিনাটিভাবে। **অন্তর্নিহিত**- ভেতরের। **অতীন্দ্রিয়**- যা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ধরা যায় না। **সঙ্গোপনে**- সম্পূর্ণ গোপন। **নির্মাল্য**- দেবতাকে নিবেদিত মালা।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'কবি ও বৈজ্ঞানিক' কোন ধরনের রচনা

ক. গল্প　　খ. প্রবন্ধ

গ. রম্যরচনা　　ঘ. উপাখ্যান

নিচের অংশটুকু পড় এবং ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

বৈজ্ঞানিক জানেন, তিনি অনেক কিছু করছেন, সংসারের জ্ঞানভাণ্ডারে অনেক সম্পদ দান করেছেন। কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট নন। তিনি যে অনতত একটি রহস্যের উদ্দেশ পান নাই এবং যে সমস্ত উপস্থিত রহস্যের স্বরূপ নির্ণয় করতে পারেন নাই, তার জন্য অত্যন্ত বিনীত ও নম্রভাবে সাধনা করে যাচ্ছেন।

২. বৈজ্ঞানিকের প্রধান কাজ

i. বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করা

ii. জ্ঞান নিয়ে গবেষণা করা

iii. বিজ্ঞান বিষয়ক কবিতা লেখা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. i ও ii　　ঘ. i, ii ও iii

৩. বৈজ্ঞানিক সংসারের ভাণ্ডারে অনেক কিছু দান করেছেন–কীভাবে?

i. আবিস্কার করে

ii. গবেষণা করে

iii. জ্ঞানদান করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. i ও ii　　ঘ. iii

৪. কবি ও বৈজ্ঞানিকের মধ্যে মিল কোন দিক থেকে? উভয়েই–

ক. লেখক　　খ. গবেষক

গ. সাধক　　ঘ. চিত্তাকর্ষক

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সোহেল ও রানা দুই বন্ধু। উভয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র–সোহেল সাহিত্যের আর রানা বিজ্ঞানের। সোহেল আকাশ নিয়ে কবিতা লেখে আর গান গায়–নীল আকাশের নিচে আমি রাস্তায় চলেছি একা। সে মুহূর্তে রানা ভাবে আকাশ নীল কেন, এর রহস্য কী? সে সোহেলকে প্রশ্ন করে, তোর গানটি চমৎকার, কিন্তু তুই কি ভেবেছিস আকাশের রহস্য কী? এর জন্য তো তুই আছিস–রানা উত্তর দেয়।

ক. বৈজ্ঞানিক কে?

খ. কবি ও বৈজ্ঞানিকের মাঝে কী সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়–বর্ণনা কর।

গ. আকাশের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য রানাকে কী করতে হবে–যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

ঘ. কবি ও বৈজ্ঞানিকের অবদান সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যক্ত কর।

রিলিফ ওয়ার্ক

আবুল মনসুর আহমদ

[লেখক পরিচিতি : আবুল মনসুর আহমদ ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার ধানীখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আইন পরীক্ষায় পাশ করে তিনি ময়মনসিংহ জজকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। পরে তিনি সাংবাদিকতা বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং কলকাতার 'দৈনিক ইত্তেহাদ' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। সাংবাদিকতাই তাঁকে সাহিত্যচর্চায় উদ্বুদ্ধ করে। কেবল সাংবাদিকতা ও সাহিত্য নয়, কৃষক–প্রজা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি রাজনীতির জগতেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। রাজনীতির অঙ্গনে যে দুর্নীতি ও অনাচার ঘটে থাকে, তিনি তা নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপাতক রচনা লিখেছেন। সামাজিক অসঙ্গতি থেকে উদ্ভূত কপটাচার তাঁর ব্যঙ্গের চাবুক থেকে রেহাই পায় নি। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই আয়না, ফুড কনফারেন্স, গালিভারের সফরনামা ও আসমানী পর্দা। এ ছাড়া, তাঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' ও 'আতকথা' জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ১৯৭৯ সালের ১৮ই মার্চ ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।]

বন্যায় সারাদেশ ভাসিয়া গিয়াছে। গ্রামকে গ্রাম ধুধু করিতেছে। বিস্তীর্ণ জলরাশির কোথাও কোথাও চাল ও বাঁশের ঝাড়ের ডগা গলা জাগাইয়া লোকালয়ের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে।

এই বিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যে মৃত্তিকার গৌরব ঘোষণা করিতেছে শুধু উঁচু রেলসড়ক। এই রেলসড়কই হইয়াছে বন্যাবিতাড়িত পল্লীবাসীর একমাত্র আশ্রয়স্থল। যারা রেলসড়কের মাটিতে জায়গা পায় নাই তারা কলাগাছের ভেলা তৈরি করিয়া সপরিবারে সেই ভেলায় ভাসিতেছে।

দুপাশের দু-দশ খানা গ্রামের সমস্ত লোক আসিয়া এই সড়কের ওপর আশ্রয় লইয়াছে। রেলসড়কে তিল ধারণের স্থান নাই। মানুষ, পশু, গরু, মহিষ, ভেড়া গা ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া সড়কের ওপর ভিড় করিয়া নৈসর্গিক বিপদের সাম্যসাধন-ক্ষমতা ঘোষণা করিতেছে।

বন্যাপীড়িত দেশবাসীর দুঃখ দেশহিতৈষী পরহিতব্রতী নেতৃবৃন্দের হৃদয় হুঙ্কার ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। কর্মীগণের চোখের দু পাতা আর কিছুতেই একত্র হইতে চাহিতেছে না। সংবাদপত্র সম্পাদকের কলমের ডগা ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতেছে।

দিকে দিকে রিলিফ কমিটি স্থাপিত হইতেছে। রিলিফ কমিটির রসিদ বই ছাপাইতে গিয়া কম্পোজিটরগণের ঘুম নষ্ট, আর প্রতিবেশীর ঘুম নষ্ট প্রেসের আওয়াজে। রিলিফ কমিটির কর্মীরা গলায় হারমোনিয়াম ঝুলাইয়া দলে দলে মর্মান্তিক গান গাহিয়া চাঁদা তুলিতেছে। সে গানের মর্মান্তিকতায় গৃহলক্ষ্মীরা দোতলার বারান্দা হইতে হাতের বালা খুলিয়া কর্মীর প্রসারিত ঝোলায় ছুড়িয়া মারিতেছেন। কর্মীরা সমস্বরে দাত্রীদের জয়ধ্বনি করিতেছে।

হামিদ চিরকালটা কেবল সংবাদপত্রের বন্যা দুর্ভিক্ষের বিবরণ পাঠ করিয়া কাটাইয়াছে। স্বচক্ষে সে কোনোদিন তা দেখে নাই। এবার স্বচক্ষে এই নৈসর্গিক বিপদের চেহারা দেখিয়া, আর খানিকটা বা কর্মীদের গানের মর্মান্তিকতায় আকৃষ্ট হইয়া হৃদয় তাহার একেবারে গলিয়া গেল।

সেদিন সে অফিসে বেতন পাইয়াছিল। পকেটে এক মাসের বেতন লইয়া গৃহে ফিরিতেছিল। মন তাহার কিছুতেই মানিতেছিল না। চাঁদা আদায়কারীদের দলপতির হাতে সে তিনখানা দশ টাকার নোট গুঁজিয়া দিল। দলপতি বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সে নাম বলিল। তিনি ধন্যবাদের জয়ধ্বনি করিবার ইশারা করিলেন। হামিদের নাম সংবলিত জয়ধ্বনি তিন বার উচ্চারিত হইল। হামিদ নিজের নাম শুনিয়া লজ্জায় দ্রুতগতিতে বাসায় চলিয়া আসিল।

পরদিন সকাল না হইতেই বাড়ির বাহিরে মোটরের আওয়াজ শুনিয়া হামিদ বাহিরে আসিল। দেখিল স্থানীয় বারের শ্রেষ্ঠ উকিল কয়েকজন সাঙ্গোপাঙ্গসহ হামিদের কুটিরদ্বারে দাঁড়াইয়া। হামিদ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। বসিবার জন্য ভাঙা

চেয়ার টানাটানি আরম্ভ করিল। তাহারা বাধা দিয়া বলিলেন, 'ভদ্রতার কোনো প্রয়োজন নাই। দুঃখ উৎপীড়িত মহামানবের পক্ষ হইতে আপনি রিলিফ কমিটির ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। এত বড় একটা অন্তঃকরণ লইয়া আপনি আর লুকাইয়া থাকিতে পারিবেন না। আপনি রিলিফ কমিটির একজন সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। কমিটির মিটিং-এ আপনি উপস্থিত থাকিলে আমরা গৌরববোধ করিব।

বিকালে অফিসে বসিয়া হামিদ রিলিফ কমিটির সভায় নিমন্ত্রণ পাইল। জনসেবার মহৎকার্যে সে জীবনে কোনোদিন যায় নাই। দেশ ও জনসেবকদিগকে চিরকাল দূর হইতে সে সারা অন্তঃকরণ দিয়া ভক্তি করিয়া আসিয়াছে। আজ জীবনে প্রথম নিজেকে জনসেবকদের পবিত্র দলের একজন হইতে দেখিয়া একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া গেল।

বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত লোক এড়াইয়া অতি সাবধানে সন্তর্পণে একরকম গা ঢাকা দিয়া হামিদ সভায় গেল। জেলার খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দ ও দেশকর্মীগণের মধ্যে সে লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল। সভায় যাহাদিগকে সে উপস্থিত দেখিল, প্রত্যহ ইহাদের নাম পাঠ করিয়া শ্রদ্ধায় কতবার ইহাদের উদ্দেশ্যে মাথা নোয়াইয়াছে। ইহাদের সঙ্গে এক সভায় দেশসেবার আলোচনায় যোগদান করিবে হামিদ? নিজেকে সে কিছুতেই অতখানি বড় করিয়া ভাবিতে পারিল না।

হামিদকে সভাগৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই সভাপতি মহাশয় নানাপ্রকার অতিশয়োক্তি সহকারে সমবেত নেতৃবৃন্দের কাছে হামিদের পরিচয় দিলেন। হামিদ মাথা নিচু করিয়া বসিয়া রহিল।

সভায় অনেক আলোচনা হইল। বাকবিতণ্ডা হইল। মর্মস্পর্শী ভাষায় বন্যাপীড়িতদের দুরবস্থা বর্ণিত হইল।

সভাশেষে সকলে তাহাকে কংগ্রাচুলেট করিতে লাগিলেন। অতি কষ্টে সে কংগ্রাচুলেশনের কারণ জানিল যে, কয়েকটি কেন্দ্র পরিদর্শনের ভার তাহার ওপর দেওয়া হইয়াছে।

আর্ত মানবতার সেবাকার্যের জন্য ছুটি চাওয়ামাত্র অফিসের বড় কর্তা হামিদের ছুটি মঞ্জুর করিলেন। জীবনে প্রথমে আর্ত মানবতার সেবাকার্যের জন্য পল্লী অঞ্চলের বন্যাপীড়িত ও দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দেশবাসীর মধ্যে হামিদ ঝাঁপাইয়া পড়িল।

আর্ত জনসেবায় অনভ্যস্ত সে। প্রথম কয়েকদিন সেবাকার্যের পদ্ধতির সঙ্গে সে নিজেকে কিছুতেই মানাইয়া চলিতে পারিল না। সেবাকার্যকে সে যতটা কষ্টকর, সুতরাং স্বর্গীয় মনে করিত, ততটা কোথাও দেখিল না বলিয়া প্রথম প্রথম তার মনটা একটুখানি কেমন কেমন করিতে লাগিল। মোটরলঞ্চে করিয়া জলে ভাসমান ভেলায় বাস করা অভুক্ত কঙ্কালসার কৃষকগণকে দু-চার সের চাউল দিয়া আসিয়া রাত্রিবেলা তাম্বুর মধ্যে রাশি রাশি কম্বল বিছানো খাটিয়ার ওপর শয়ন করিয়া অঘোরে নিদ্রা যাইতে হামিদের প্রথম প্রথম ভালো লাগিল না। সে নিজেকে মানাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল; পারিলও কতকটা। সে দেখিল রিলিফ ফান্ডের টাকার চৌদ্দ আনা কর্মীদের ভরণ-পোষণে ব্যয় হইতেছে। বাকি দুই আনায় মাত্র সেবাকার্য চলিতেছে। তবু সেবাকার্যে আনাড়ি সে, ইহার প্রতিবাদে সাহসী হইল না। কারণ হয়তো বা এমন না হইলে সেবাকার্যই চলে না।

হামিদ একদিন একটি কেন্দ্র পরিদর্শন করিতে গিয়াছে। দেখিল রিলিফ কমিটির তাম্বুর সামনে কাতার করিয়া শ দুই অর্ধনগ্ন স্ত্রী পুরুষ ছেলে বুড়ো বালক বালিকা টিকিট হাতে করিয়া বসিয়া আছে। রিলিফ অফিসারের নিয়ম কড়া। সাহায্যপ্রার্থীর সকলকেই উপস্থিত হইতে হইবে এবং টিকিট দেখাইয়া সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। মেয়েদের কোলে অশান্ত শিশুগুলি ক্ষুধার তাড়নায় হাত-পা ছড়াছড়ি করিতেছে।

হামিদের গা কাঁটা দিয়া উঠিল। কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মীকে সে বলিল, 'ইহাদের বসাইয়া রাখিয়াছেন কেন ? বিদায় করিয়া দিন না !'

হামিদের স্বরে একটু বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল। কেন্দ্রকর্তা হামিদের বিরক্তিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিলেন, 'ইহাদের গণনা শেষ হয় নাই। কই হে নগেন, এদের রেজিস্টারিটা বাহির কর তো।'

নাম ডাক শেষ হইলে উহাদের টিকিট চেক শুরু হইল। একজন কর্মী কাতারের এক মাথা হইতে লাল-নীল পেন্সিল দিয়া টিকিটে দাগ দিয়া যাইতে লাগিল। আরেকজন তার পিছে পিছে পেট বুঝিয়া এক ছটাক হইতে দুই ছটাক করিয়া চাউল

বিতরণ করিয়া যাইতে লাগিল। অধিকাংশ সাহায্যার্থী আগ্রহভরে কাপড়ের আঁচল পাতিয়া নীরবে ভিক্ষা করিতে লাগিল। মাত্র দুই একটা বেয়াড়া লোক এতে কী হবে বাবু বলিয়া গোলমাল করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু কর্মীদের ধমক ও চোখ রাঙানিতে তাহারা চুপ করিয়া বিড়বিড় করিয়া কী বকিতে থাকিল।

প্রায় অর্ধেক লোককে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে, এমন সময় তাম্বুর সামনে একখানা নৌকা ভিড়িল।

দুইজন ভদ্রলোক নৌকা হইতে নামিলেন। কেন্দ্রকর্তা 'আসুন চক্রবর্তী মশাই, আসুন চৌধুরী সাহেব' বলিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া হামিদের নিকট আনিলেন এবং লোহার চেয়ারে বসিতে বলিলেন।

তারপর তিনি হামিদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'ইনস্পেক্টর সাব, এরা দুইজন রঘুনাথপুরের যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও শমসের আলী চৌধুরী। আহা! বন্যায় ভদ্রলোকদের যা অবস্থা হইয়াছে, তা আর বলিবার নয়। গোলার ধান-চাল সব বন্যায় ভাসাইয়া নিয়াছে। কই হে শরৎ, বাবুদের চাল-ডালটা নৌকায় পৌঁছাইয়া দাও তো।'

এতক্ষণ সমবেত কৃষকগণের মধ্যে যাহারা চাউল বিতরণ করিতেছিল, তাহারা সকলেই বিতরণকার্য অর্ধসমাপ্ত রাখিয়া ত্রস্তব্যস্তে চাউল-ডাল মাপিয়া দুই বস্তা চাউল, এক ডালি ডাল, এক ডালি লবণ-মরিচাদি দিয়া ভদ্রলোক দুইজনকে বিদায় করিল।

হামিদ কঠোর ভাষায় কেন্দ্রকর্তাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এদের দুইজনকে কতজনের খোরাক দিলেন?'

কেন্দ্রকর্তা উৎসাহভরে বলিলেন, 'এদের বিরাট ফ্যামেলি। এতক্ষণ তবে আর বলিলাম কী আপনার কাছে? জোতজমি বাড়িতে দালানকোঠা-'

বাধা দিয়া হামিদ বলিল, 'কই ইহাদের তো টিকিট চেক করিলেন না?'

কেন্দ্রকর্তা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'বলেন কী? ইহাদের মতো লোক কি আর ফাঁকি দিয়া অতিরিক্ত চাউল লইতে পারে?'

হামিদ রাগ সামলাইতে পারিল না। ঈষৎ ব্যঙ্গাস্বরে বলিল, 'এই সমস্ত অভুক্ত কৃষক কি তবে ফাঁকি দিয়া অতিরিক্ত চাউল নেয়?'

কেন্দ্রকর্তা অভিজ্ঞ মাতব্বরের স্বর হানিয়া বলিলেন, 'আপনি রাখেন না এদের বদমায়েশির খবর। ইহারা-'

হঠাৎ গোলমালে তাহাদের কথোপকথনে বাধা পড়িল।

একটা বুড়ো লোক ও মধ্যবয়সী স্ত্রীলোককে কর্মীরা টানাটানি করিয়া তাহাদের দিকে আনিবার চেষ্টা করিতেছিল। স্ত্রীলোকটার কাপড় তিন চারটা ন্যাংটা ছেলেমেয়ে পিছন হইতে টানিতেছিল এবং চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছিল।

ব্যাপার কী দেখিবার জন্য হামিদ আসন হইতে উঠিতেই কেন্দ্রকর্তা তার জামার কোণ ধরিয়া বলিলেন, 'আপনি বসুন না, এখানেই ওদের লইয়া আসিবে।'

হামিদ গিয়া দেখিল বুড়োটাকে কর্মীরা দু-এক ঘা চড়-চাপড় মারিতেছে এবং মেয়েলোকটাকে গলায় কাপড় লাগাইয়া টানাটানি করিতেছে।

নগেন্দ্র নামক কর্মীটি তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, 'মি: ইনস্পেক্টর, ইহারা অতিশয় বদমায়েশ লোক। ইহারা টিকিটের পেন্সিলের দাগ মুছিয়া ফেলিয়া দুই বার চাউল লইয়াছে।'

কেন্দ্রকর্তা বিজয় গৌরবে হামিদের দিকে চাহিয়া হাসিলেন এবং অপরাধীর দিকে চাহিয়া মেঘগর্জনে আদেশ করিলেন, 'এই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ আগামী দুই দিন তোমাদিগকে কোনো সাহায্য দেওয়া হইবে না। যাও।'

পরদিন সকালে সমস্ত সাহায্যপ্রার্থী যথারীতি কাতার করিয়া জমা হইল। কাতারের মধ্যে গতকালকার দণ্ডিতা অপরাধীদ্বয়কেও দেখা গেল।

কেন্দ্রকর্তার আদেশে উহাদিগকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইল। হামিদের সুপারিশের উত্তরে কেন্দ্রকর্তা বলিলেন যে, তিনি কোনো ক্রমেই ডিসিপ্লিন ভাঙিতে প্রস্তুত নহেন। দণ্ডিত অপরাধীদ্বয় ক্ষুধার্ত পুত্রকন্যাসহ চোখের পানি মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

তৃতীয় দিনও অপরাধীদ্বয় আসিয়া কাতারের মধ্যে লুকাইয়া রহিল। কিন্তু তাহাদের নির্বোধ ছেলেমেয়ের জন্য অধিক্ষণ লুকাইয়া থাকিতে পারিল না, ধরা পড়িল। কর্মীরা তাহাদিগকে কিল ঘুষি দিয়া বাহির করিয়া দিল।

সেদিনকার বিতরণ বন্ধ হইয়া গেল। সমবেত সাহায্যপ্রার্থীরা অনেক অনুনয় বিনয় করিল। কিন্তু কোনো ফল হইল না। কেন্দ্রকর্তা হামিদের অনুরোধেও তাঁহার সিদ্ধান্ত বদলাইতে রাজি হইলেন না। অবশেষে জনতার গলায় প্রতিবাদের ভাষা ফুটিয়া উঠিল। 'ভদ্রলোকদের খাতির করা হয়, গরিবের সামান্য অপরাধ মাফ করা হয় না।' ইত্যাদি কথা জনতার মধ্য হইতে শোনা যাইতে লাগিল। কেন্দ্রকর্তার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেল। জোরে চিৎকার করিয়া তিনি চাউলের বস্তা তাম্বুতে তুলিবার আদেশ দিলেন। হামিদকে কিছু বলিবার সুযোগ না দিয়া তিনি তাহাকে একরূপ জোর করিয়া তাম্বুর মধ্যে লইয়া গেলেন। কী কর্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া হামিদও অগত্যা কেন্দ্রকর্তার সঙ্গে সঙ্গে তাম্বুতে প্রবেশ করিয়া খাটিয়ায় শুইয়া পড়িল এবং আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

মনটা তাহার অত্যন্ত খারাপ ছিল। হামিদ তাম্বুর বাহির হইয়া পল্লীতে প্রবেশ করিল। এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া সন্ধ্যায় তাম্বুতে ফিরিয়া দেখিল, কর্মীরা আন্ডা, রুটি ও চা লইয়া মাতিয়া গিয়াছে। হামিদ নিঃশব্দে নিজের বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমাইয়া পড়িল।

হঠাৎ ভীষণ কোলাহলে হামিদের ঘুম ভাঙিয়া গেল। 'চোর' 'ডাকাত' ইত্যাদি চেঁচামেচি ও কান্নাকাটি তার কানে গেল। সে ধড়মড় করিয়া লাফাইয়া উঠিল। প্রায় সকলের কাছে রিলিফ কমিটির টাকায় কেনা এক একটা টর্চ লাইট। তার আলো ফেলিয়া তাম্বু ও তাহার চতুর্দিক আলোকিত করিয়া ফেলা হইল। দেখা গেল দশ পনের জন অর্ধনগ্ন লোক এক-এক বস্তা চাউল মাথায় লইয়া যথাশক্তি দ্রুতগতিতে এদিক ওদিক পালাইতেছে।

কর্মীরা ছিল ড্রিলকরা ভলান্টিয়ার। তাহাদের অনেকে আবার ডনগীর, কুস্তিগীর ও যুযুৎসুবিদ। পক্ষান্তরে পাড়াগাঁয়ের এই চোরেরা ছিল অনেক দিনের ক্ষুধিত, সুতরাং দুর্বল। তারপর চাউলের বস্তা তাহাদের মাথায় ছিল। কাজেই অল্পক্ষণেই তাহাদের অনেকেই ধরা পড়িল।

রাত্রেই থানায় খবর দেওয়া হইল। দারোগা সাহেব এক পাল পুলিশসহ অকুস্থলে হাজির হইলেন। ধৃত আসামীদিগকে আচ্ছা করিয়া সাপমারা মার দিলেন। মারের চোটে পলায়িত চোরদেরও নাম বাহির হইল।

সূর্যোদয়ের পূর্বেই মধুপুর গ্রামের শতাধিক ছেলেবুড়োকে হাতকড়া পরা অবস্থায় রিলিফ কমিটির তাম্বুর সম্মুখে জমা করা হইল। দারোগা সাহেব সাড়ম্বরে সকলের জবানবন্দি গ্রহণ করিলেন। জবানবন্দি শেষ করিয়া এক পাল অভুক্ত অর্ধনগ্ন নরকংকালকে ভেড়ার পালের মতো খেদাইয়া থানার দিকে লইয়া গেলেন।

রিলিফ কার্যের ন্যায় পবিত্র ধর্মকর্মে বাধাদানকারী এই সমস্ত নরপিশাচের বিচার দেখিবার জন্য অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি, রিলিফ কমিটির সমস্ত মাতব্বর সদস্য ও শতাধিক ভলান্টিয়ার আদালত প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন। হাকিমের রায় হওয়া মাত্র তাহারা সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। জয় রিলিফ কমিটির জয়।

সমবেত দর্শকমণ্ডলীর প্রায় সকলেই ভদ্রলোক। কাজেই এইসব নরপিশাচের নীচতায় সকলেই ছি ছি করিতে লাগিল। দণ্ডিত নরপিশাচেরা পুলিশের ব্যাটনের মুখে অধোবদনে জেলে চলিয়া গেল।

সেই দিনই হামিদ রিলিফ কমিটির সদস্য পদে ইস্তফা দিয়া অফিসের কাজে যোগদান করিল।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'রিলিফ ওয়ার্ক' রম্য গল্পটি আবুল মনসুর আহমদের 'ফুড কনফারেন্স' গ্রন্থ' থেকে সংকলিত।

মূলবক্তব্য

রিলিফ ওয়ার্ক বলতে দুস্থ জনগণের কল্যাণে নিবেদিত সাহায্য ও ত্রাণকার্যকে বোঝানো হয়। দুস্থ মানবতার সেবার নামে কিছু কিছু রাজনীতিক ও সমাজকর্মী যে হীন ও কপটাচারে লিপ্ত থাকে, তার প্রতি তীব্র কষাঘাত করা হয়েছে এ গল্পে।

বন্যাপীড়িত দেশবাসীর দুঃখে নেতৃবৃন্দের হৃদয় বিগলিত। তারা রিলিফ কমিটি খুলে চাঁদা তুলে দেশবাসীর সেবার মহান ব্রত নিয়েছে। কিন্তু ত্রাণসামগ্রী লাভের নামে ভোগান্তিই সার হল দুঃখী মানুষের। ত্রাণসামগ্রীর সিংহভাগ নেতা ও ত্রাণকর্মীদের স্বার্থেই ব্যয় হয়। তা ছাড়া চুরির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে শাস্তি পেল দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামের নিরীহ মানুষ।

শব্দার্থ ও টীকা

লোকালয়- মানুষের বাসস্থান, গ্রাম। **নৈসর্গিক-** প্রাকৃতিক। **রিলিফ কমিটি-** ত্রাণ কমিটি। **কম্পোজিটার** (Compositor)- যারা ছাপাখানায় হরফ সাজায়। **মর্মান্তিক-** হৃদয় বিদারক। **দাত্রী-** দানকারিণী। **বার (Bar)-** আইনজীবীদের কর্মস্থল। **ম্রিয়মাণ-** ম্লান, মুহ্যমান। **অতিশয়োক্তি-** অতিরঞ্জিত কথা। **কংগ্রাচুলেট (Congratulate)-** অভিনন্দন। **আর্ত-** পীড়িত। **ফান্ড-** তহবিল। **বেয়াড়া-** দুর্বিনীত। **চেক (Check)-** পরীক্ষা। **ড্রিল (Drill)-** শরীরচর্চা অনুশীলন। **ভলান্টিয়ার (Volunteer)-** স্বেচ্ছাসেবক। **যুযুৎসু-** এক প্রকার জাপানি শারীরিক কসরৎ। **অকুস্থল -** ঘটনার স্থল। **জবানবন্দি -** পুলিশ ও বিচারকের নিকট প্রদত্ত বিবৃতি।

মৃত্তিকার গৌরব- বন্যাকবলিত গ্রাম। বিস্তীর্ণ জলরাশি লোকালয়কে ভাসিয়ে নিয়েছে। উঁচু রেলসড়কটিই গ্রামবাসীর একমাত্র আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে। লেখক এই রেলসড়কটিকেই মৃত্তিকার গৌরব বলেছেন। কারণ বন্যায় সারা গ্রামে কেবল এই রেলসড়কটিই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

সাম্যসাধন-ক্ষমতা- প্রায় দশটি গ্রামের লোক রেলসড়কের ওপর আশ্রয় নিয়েছে। মানুষের পাশাপাশি আশ্রয় হয়েছে গৃহপালিত পশুরও। বন্যার ফলে মানুষ আর পশুতে এই সমতাবিধান সম্ভব হয়েছে।

কম্পোজিটারগণের ঘুম নষ্ট, আর প্রতিবেশীর ঘুম নষ্ট প্রেসের আওয়াজে -বন্যাপীড়িত দুস্থ মানুষের দুঃখ মোচনের উদ্দেশ্যে সর্বত্র রিলিফ কমিটি স্থাপিত হয়েছে। রিলিফ কমিটির চাঁদা সংগ্রহের জন্য প্রয়োজন রসিদ বই। রসিদ বই ছাপানোর কাজে প্রেসগুলোর ব্যস্ততার শেষ নেই। অন্যদিকে, প্রেসের শব্দে প্রতিবেশীদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে। বন্যার্তদের জন্য সমাজের কৃত্রিম দরদের প্রতি শ্লেষোক্তি।

রাশি রাশি কম্বল বিছানো খাটিয়া- দুঃখী মানুষের মধ্যে সাহায্য হিসেবে বণ্টনের জন্য কম্বল সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু সে কম্বল দুঃখীদের ভাগ্যে জুটছে না, কর্মীদের স্বার্থেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

সাপমারা মার- প্রচণ্ড পিটুনি। সাপকে যেমন নির্দয়ভাবে পেটানো হয়, ঠিক তেমনিভাবে পেটানো হয়েছিল পাড়াগাঁয়ের ক্ষুধিত কঙ্কালসার মানুষদের।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। রেল সড়কের ওপর আশ্রয় নেয়-

ক. সিডর আক্রান্ত জনগণ
খ. বন্যাপীড়িত গ্রামের জনগণ
গ. বন্যাপীড়িত শহরের জনগণ
ঘ. জলোচ্ছ্বাস কবলিত জনগণ

নিচের অংশটুকু পড়ে ২, ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

হামিদ এক মাসের বেতন লইয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন। তাহার মন কিছুতেই মানিতেছিল না। চাঁদা আদায়কারীদের দলপতির হাতে সে তিনখানা দশ টাকার নোট গুঁজিয়া দিলেন। দলপতি বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সে নাম বলিল। তিনি ধন্যবাদের জয়ধ্বনি করিবার ইশারা করিলেন।

২. চাঁদা আদায় করেছিল–

ক. ফুটবল খেলার জন্য
খ. ক্রিকেট খেলার জন্য
গ. বন্যাদুর্গতদের সাহায্যের জন্য
ঘ. সিডর আক্রান্তদের সাহায্যের জন্য

৩. হামিদের মন কিছুতেই মানিতেছিল না-

i. বন্যাদুর্গতদের দুরবস্থার কথা ভাবিয়া
ii. বাদ্যযন্ত্রের মধুর সুরে আপ্লুত হইয়া
iii. চাঁদা আদায়কারীদের গান শুনিয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. ii ও iii

৪. হামিদের চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে হামিদের–

ক. সংগীতপ্রীতি
খ. সুনামপ্রীতি
গ. মানবতাবোধ
ঘ. সামাজিকতা

সৃজনশীল প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ভয়ংকর সিডরে আক্রান্ত দক্ষিণাঞ্চলের জনগণ সহায়সম্বলহীন হয়ে পড়েছে। শরণখোলার চেয়ারম্যান বাকুমিয়া তাঁর সদস্যদের নিয়ে রিলিফ টিম গঠন করেন। সরকারের সকল সাহায্য তাঁর মাধ্যমে এলাকায় বিতরণ হয়। ক্ষতিগ্রস্ত লোক যৎসামান্য সাহায্য পেলেও রিলিফ কমিটির লোকজন ও ভলান্টিয়ারগণের আনন্দ অপরিসীম। চারিদিকে হাহাকার সত্ত্বেও ত্রাণসামগ্রী বিতরণে অনিয়মসাধনে এরা নির্লজ্জ।

ক. জনগণ সহায়সম্বলহীন হয়ে পড়েছে কেন ?
খ. রিলিফ টিমের কাজের পরিধি বর্ণনা কর।
গ. বন্যাদুর্গতদের সাহায্যের জন্য জনগণ কীভাবে প্রকৃত ভূমিকা পালন করতে পারে।
ঘ. 'চারিদিকে হাহাকার সত্ত্বেও ত্রাণসামগ্রী বিতরণে এরা নির্লজ্জ।' –কথাটি বিশ্লেষণ কর।

৩। 'রিলিফ ওয়ার্ক' গল্পে রিলিফ ফান্ডের টাকার চৌদ্দ আনা কাদের জন্য ব্যয় করা হয়েছ?

ক. বন্যার্ত লোকের জন্য গ. রিলিফ অফিসের জন্য
খ. রিলিফ ওয়ার্ক কর্মীদের জন্য ঘ. গ্রামের দরিদ্র লোকদের জন্য

৪। 'রিলিফ ওয়ার্ক' গল্পে হামিদ চরিত্রকে কীভাবে দেখানো হয়েছে?

ক. দুর্নীতির সঙ্গে আপোষকারী হিসেবে
খ. একজন মানবদরদী আদর্শ ও মহান ব্যক্তি হিসেবে
গ. একজন হৃদয়বান মানুষের ক্ষীণ প্রতিবাদী কণ্ঠ হিসেবে
ঘ. একজন সরল মানুষ, যে কপটাচারীদের কাছে পরাস্ত হয়।

৫। 'রিলিফ' শব্দটি কোন ধরনের?

ক. দেশি খ. বিদেশি
গ. তৎসম ঘ. তদ্ভব

দুরন্ত পথিক

কাজী নজরুল ইসলাম

[লেখক পরিচিতি : কাজী নজরুল ইসলাম ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ সালে (২৫শে মে ১৮৯৯) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় তিনি লেটো গানের দলে যোগ দেন। পরে বর্ধমানে ও ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার দরিরামপুর হাই স্কুলে লেখাপড়া করেন। ১৯১৪ সালে তিনি সেনাবাহিনীর বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে করাচি যান। সেখানেই তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনা ঘটে। তাঁর লেখায় তিনি সামাজিক অবিচার ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। এজন্য তাঁকে 'বিদ্রোহী কবি' বলা হয়। বাংলা সাহিত্য জগতে তাঁর আবির্ভাব এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে। কবিতা, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি সাহিত্যের সকল শাখায় তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি গজল, খেয়াল ও রাগপ্রধান গান রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। আরবি-ফারসি শব্দের সার্থক ব্যবহার তাঁর কবিতাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে কবি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর অসুস্থ কবিকে ঢাকায় আনা হয় এবং পরে তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। তাঁকে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদায় ভূষিত করা হয় । তাঁর রচিত কাব্যগুলোর মধ্যে অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, ছায়ানট, প্রলয়শিখা, চক্রবাক, সিন্ধুহিন্দোল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলিমালা, মৃত্যুক্ষুধা, কুহেলিকা ইত্যাদি তাঁর রচিত গল্প ও উপন্যাস। যুগবাণী, দুর্দিনের যাত্রী ও রাজবন্দীর জবানবন্দী তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ। ২৯শে আগস্ট ১৯৭৬ সালে কবি ঢাকায় পি.জি. হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদসংলগ্ন প্রাঙ্গণে তাঁকে পরিপূর্ণ সামরিক মর্যাদায় সমাহিত করা হয়।]

সে চলিতেছিল দুর্গম কাঁটাভরা পথ দিয়া। পথ চলিতে চলিতে সে একবার পিছনে ফিরিয়া দেখিল, লক্ষ আঁখির অনিমিখ দৃষ্টি তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সে দৃষ্টিতে আশা-উন্মাদনার যে ভাস্বর জ্যোতি ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল, তাহাই ঐ দুরন্ত পথিকের বক্ষ এক মাদকতাভরা গৌরবে ভরপুর করিয়া দিল। সে প্রাণভরা তৃপ্তির হাসি হাসিয়া বলিল- 'হাঁ ভাই! তোমাদের এমন শক্তিভরা দৃষ্টি পেলে কোথায়?' অযুত আঁখির নিযুত দীপ্ত চাউনি বলিয়া উঠিল- 'ওগো সাহসী পথিক, এ দৃষ্টি পেয়েছি তোমারই ওই চলার পথ চেয়ে।' উহারই মধ্যে এক-রেখা ম্লানিমার মতো সে কাহার স্নেহ-করুণ চাহনি বাণীতে ফুটিয়া উঠিল- 'হায়, এ দুর্গম পথে তরুণ পথিকের মৃত্যু অনিবার্য!' অমনি লক্ষ কণ্ঠে লক্ষ হুংকার গর্জন করিয়া উঠিল-'চোপরাও ভীরু, এইতো মানবাত্মার সত্য শাশ্বত পথ।' একলা পথিক দু চোখ পুরিয়া এই কল্যাণ-দৃষ্টির শক্তি-অমিয় পান করিয়া লইল। তাহার সুপ্ত যতকিছু অন্তরের সত্য, এক অঙ্গুলি-পরশে সারা বীণায় ঝঞ্ঝার মতো সাগ্রহ সাড়া দিয়া উঠিল- 'আগে চল!' বনের সবুজ তাহার অবুঝ তারুণ্য দিয়া পথিকের প্রাণ ভরিয়া দিয়া বলিল- 'এই তোমার যৌবনের রাজটিকা পরিয়ে দিলাম; তুমি চির-যৌবনময় চির-অমর হলে!' পথের আকাশ অবনত হইয়া তাহার শির চুম্বন করিয়া গেল। দূরের দিগ্বলয় তাহাকে মুক্তির সীমারেখার আবছায়া দেখাইতে লাগিল। স্বাধীন দেশের তোরণদ্বার পারাইয়া মুক্তি-বাঁশির অগ্নিসুর হরিণের মতো তাহাকে মুগ্ধ মাতাল করিয়া ডাক দিতেছিল। বাঁশির টানে মুক্তির দিগ্বলয় লক্ষ করিয়া সে ছুটিতে লাগিল। -ওগো কোথায় তোমার সিংহদ্বার? দ্বার খোল, দ্বার খোল- আলো দেখাও, পথ দেখাও! ..... মুক্ত বিশ্বের কল্যাণমন্ত্র তাহাকে ঘিরিয়া বলিল- 'এখন অনেক দেরি, পথ চল!' পথিক চমকিয়া উঠিয়া বলিল-'ওগো আমি যে তোমাকে চাই!' সে অচিন সাথী বলিয়া উঠিল- 'আমাকে পেতে হলে ঐ সামনের বুলন্দ দরওয়াজা পার হতে হয়!' দুরন্ত পথিক তাহার চলার দুর্বার বেগের গতি আনিয়া বলিল, 'হাঁ ভাই, তাই আমার লক্ষ্য।' অনেক দূরে বনের ফাঁকে মুক্ত গগন একবার চমকাইয়া গেল। পিছন হইতে নিযুত তরুণ কণ্ঠের বিপুল বাণী শোর করিয়া উঠিল-'আমাদেরও লক্ষ্য ঐ, চল ভাই, আগে চল। তোমারই পায়ে চলার পথ ধরে আমরা চলেছি।' পথিক বুকভরা গৌরবের তৃপ্তি তাহার কণ্ঠে ফুটাইয়া হাঁকিয়া উঠিল- 'এ পথে যে মরণের ভয় আছে।' বিক্ষুব্ধ তরুণ কণ্ঠে প্রদীপ্ত বাণী বাজিয়া উঠিল- 'কুছ পরওয়া নেই। ও তো মরণ নয়, জীবনের আরম্ভ।'

অনেক পিছনে পাঁজরভাঙা বৃদ্ধেরা ভয়ে কাঁপিয়া মরিতেছিল। তাহাদের স্কন্ধদেশে চড়িয়া একজন মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিতেছিল- 'এই দেখ মরণ।' একটু দূরে কয়লার ধুঁয়া ভরা আগুন জ্বালাইয়া বৃদ্ধদের দৃষ্টিহীন চক্ষু প্রতারিত করার

চেষ্টা হইতেছিল। হাসি চাপিতে চাপিতে একজন ইহাদিগকে ঐ পুতি-ধূমময় আগুনের দিকে খেদাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিতেছিল–'ঐ তো সামনে তোমাদের নির্বাণকুন্ড; এ বৃদ্ধ বয়সে কেন বন্ধুর পথে ছুটতে গিয়ে প্রাণ হারাবে? ওই দুরন্ত পথিকদল মরল বলে!' বৃদ্ধের দল দুই হাত উপরে উঠাইয়া বলিল- 'হাঁ হুযুর, আলবত!' তাহাদের আশেপাশে কাহার দুষ্টকণ্ঠ বারেবারে সতর্ক করিতেছিল- 'ওরে ভিক্ষুকের দল, ভিক্ষায়ং নৈব চ নৈব চ! তোদের এরা ঐ নির্বাণকুন্ডে পুড়িয়ে তিল তিল করে মারবে!' তাদের রাখাল হাসি চাপিয়া বলিয়া উঠিল- 'না, ওদের কথা শুনো না। ওদের পথ ভীতিসংকুল আর অনেক দূরে, তাও আবার দুঃখকষ্ট- কাঁটাপাথরভরা। তোমাদের মুক্তি ঐ সামনে।'

দুরন্ত পথিক চলিয়াছিল, সেই মুক্ত দেশের উদ্বোধন বাঁশির সুর ধরিয়া।..... এইবার তাহার পথের বিভীষিকা জুলুম আরম্ভ করিল। পথিক দেখিল, ঐ পথ বাহিয়া যাওয়ার এক-আধটি অস্ফুট পদচিহ্ন এখনও যেন জাগিয়া রহিয়াছে। পথের বিভীষিকা তাহাদেরই মাথার খুলি এই নূতন পথিকের সামনে ফেলিয়া দিয়া বলল, এই দেখ এদের পরিণাম! সেই খুলি মাথায় করিয়া নূতন পথিক আর্তনাদ করিয়া উঠিল, আহ, এরাই তো আমায় ডাক দিয়েছে। আমি এমনি পরিণাম চাই। আমার মৃত্যুতেই তো আমার শেষ নয়. আমার পশ্চাতে ঐ যে তরুণ যাত্রীর দল, ওদের মাঝেই আমি বেঁচে থাকব। বিভীষিকা বলিল, 'তুমি কে?' পথিক হাসিয়া বলিল, 'আমি চিরন্তন মুক্তিকামী। এই যাদের খুলি পড়ে রয়েছে, তারা কেউ মরেনি। আমার মাঝেই তারা নূতন শক্তি, নূতন জীবন, নূতন আলোক নিয়ে এসেছে। এ মুক্তদল অমর!' বিভীষিকা কাঁপিয়া উঠিল, 'আমায় চেন না? আমি শৃঙ্খল। তুমি যাই বল, তোমাকে হত্যা করাই আমার ব্রত। মুক্তিকে বন্ধন দেওয়াই আমার লক্ষ্য। তোমাকে মরতে হবে।' দুরন্ত পথিক বুক বাড়াইয়া বলিল, 'মারো, বাঁধো, কিন্তু আমাকে তো বাঁধতে পারবে না; আমার তো মৃত্যু নেই। আমি যে আবার আসব।' বিভীষিকা পথ আগুলিয়া বলিল, 'আমার যতক্ষণ শক্তি আছে, ততক্ষণ তুমি যতবারই আস তোমাকে বধ করব। শক্তি থাকে আমায় মারো, নতুবা আমার মার সহ্য করতে হবে।'

অনেক দূরে মুক্ত দেশের অলিন্দে এই পথের বিগত পথিক-সব জ্যোতির্ময় দেহ লইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিল। পথিক বলিল, 'কিন্তু এই জীবন দেওয়াটাই কি জীবনের সার্থকতা?' মুক্তি-বাতায়ন হইতে মুক্ত আত্মাদের স্নিগ্ধ আর্দ্র কণ্ঠ কহিয়া উঠিল– 'হাঁ ভাই! তোমাদের মৃত্যুতে আর অমনি সহস্র প্রাণের উদ্বোধনই তোমার মরণের সার্থকতা। নিজে মরিয়া অন্যকে জাগানোতেই তোমার মৃত্যু চির-জাগ্রত অমর।' নবীন পথিক তাহার তরুণ বিশাল বক্ষ উন্মোচন করিয়া অগ্রে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, 'তবে চালাও খঞ্জর!'

পিছন হইতে তরুণ যাত্রীদল দুরন্ত পথিকের প্রাণ-শূন্য দেহ মাথায় তুলিয়া লইয়া কাঁদিয়া উঠিল– 'তুমি আবার এসো!' অনেক দূরে দিগ্বলয়ের কোলে কাহাদের ঐকতান-সংগীত ধ্বনিয়া উঠিতে লাগিল–

'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী'
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি!'

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'দুরন্ত পথিক' কাজী নজরুল ইসলামের 'রিক্তের বেদন' গ্রন্থ থেকে গৃহীত। এটি একটি কথিকাবিশেষ।

মূলবক্তব্য

দুরন্ত পথিক দুর্বার তারুণ্যের প্রতীক। সে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত মুক্তি সৈনিক। মৃত্যুভয়কে তুচ্ছজ্ঞান করে সে বিপদসংকুল দুর্গম পথে এগিয়ে চলে। মৃত্যুর মাঝেই সে অটল অবিচল। তার কাছে জীবন দেওয়াটাই জীবনের সার্থকতা। বস্তুত স্বাধীনতাকামী তারুণ্যশক্তির ধ্বংস নেই, আগামী দিনের নবীন যাত্রীদলের মধ্যে এ শক্তি বেঁচে থাকে। এ শক্তি চিরন্তন মুক্তিকামী।

শব্দার্থ ও টীকা

ভাস্বর জ্যোতি- উজ্জ্বল আলো। **মাদকতা**- নেশা। এখানে তারুণ্যের দুর্জয় শক্তিকে বোঝানো হয়েছে। তারুণ্যের এ শক্তি হেলায় বাধাবিপত্তিকে তুচ্ছ করে। **অযুত**- দশ হাজার, অসংখ্য। **দিগ্বলয়**- দিগন্ত। যেখানে আকাশ পৃথিবীর সঙ্গে মিশেছে বলে মনে হয়। **শাশ্বত**- যা চিরকাল টিকে থাকে। **উদ্বোধন**- সূচনা, আরম্ভ। **বিভীষিকা**- ভীষণ ভয়, ভয়ংকর দৃশ্য। **অলিন্দ**- বারান্দা। **খঞ্জর**- এক ধরনের ছোরা, যার দুদিকেই ধার রয়েছে।

অযুত আঁখির নিযুত দীপ্ত চাউনি- মুক্তিকামী দুরন্ত পথিক দুর্গম পথে অগ্রসরমান। আর্তমানবতার মুক্তিই তার কাম্য। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে সে স্বাধীনতা সূর্যকে ছিনিয়ে আনবে। লক্ষ-কোটি পরাধীন মানুষ তাঁর পথ চেয়ে রয়েছে। উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে তারা স্বপ্ন দেখে- তরুণেরা একদিন তাদের আকাঙ্ক্ষিত মুক্তির বার্তা বয়ে আনবে।

'কুছ পরওয়া নেই, ও তো মরণ নয়, জীবনেরই আরম্ভ'- মুক্তি-পাগল তরুণ দলের দৃঢ় সংকল্প। এই সংকল্প বলেই পথের সহস্র বাধাকে তারা সহজেই তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে। তারা জানে, মুক্তির পথ বন্ধুর পথ। সে পথে পদে পদে মৃত্যু ওঁৎ পেতে আছে। কিন্তু মৃত্যুর বিভীষিকা তরুণ দলের যাত্রাকে রুদ্ধ করতে পারে না। করুণ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে তাদের কোনো দ্বিধা নেই। তারা এ সত্যে বিশ্বাসী যে, মৃত্যুর মাঝেই নব জীবনের সূচনা ঘটে। দুরন্ত পথিক চিরন্তন মুক্তিকামী। আগামী দিনের নতুন যাত্রীদের মধ্যে তারা বেঁচে থাকবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের অংশটুক পড়ে ১, ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

দুরন্ত পথিক তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে লক্ষ মানুষের অন্তরের স্বপ্ন দেখে। গতিময় চলার পথে উত্তরসূরির দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনে তাঁর চিরতারুণ্য গৌরবদীপ্ত হয়ে ওঠে। মুক্তির পথের পূর্বসূরিরা তাকে মরণের মাঝে আহ্বান জানায়; পথিক উপলব্ধি করে একটি প্রাণের মৃত্যুতে সহস্র প্রাণের উদ্বোধনই মরণের সুমহান সার্থকতা।

১. দুরন্ত পথিক কে?

ক. মুক্তির সৈনিক খ. দুর্বার শক্তি
গ. মুক্তির দূত ঘ. নবীন পথিক

২. দুরন্ত পথিকের মৃত্যু সার্থকতা লাভ করে কীভাবে?

i. তারুণ্যের গৌরবে
ii. পূর্বসূরিদের আহ্বানে
iii. অনুসারীদের জাগরণে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. iii

৩. 'মুক্তির স্বপ্ন'-সফলতা লাভ করে কীভাবে?

ক. অবিশ্রান্ত চলার গতিতে খ. প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকায়
গ. দুরন্ত পথিকের মৃত্যুতে ঘ. সম্মিলিত শক্তির উত্থানে

৪. 'আমি এমনই মৃত্যু চাই'– উক্তিটির প্রকৃত অর্থ –

i. পূর্বসূরিদের মতো মরণ

ii. মুক্তির লক্ষ্যে আত্মত্যাগ

iii. অমরত্ব লাভের জন্য মরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. iii

৫. দুরন্ত পথিক প্রবন্ধে 'রাখাল' বলা হয়েছে –

ক. কাপুরুষদের খ. বিরুদ্ধ শক্তিকে

গ. বৃদ্ধদের দলনেতাকে ঘ. প্রতিবন্ধকতাকে

৬। 'ভিক্ষায়ং নৈব চ নৈব চ' অর্থ কী?

ক. ভিক্ষা কোরো না কোরো না

খ. ভিক্ষায় নিষেধ নেই নিষেধ নেই

গ. ভিক্ষা কখনই না কখনই না

ঘ. ভিক্ষা চাই না ভিক্ষা চাই না

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বিভীষিকা বলিল, 'তুমি কে?' পথিক জাগিয়া বলিল, 'আমি চিরন্তন মুক্তিকামী। এই যাদের খুলি পড়ে রয়েছে, তারা কেউ মরে নি। আমার মাঝেই তারা নূতন শক্তি, নূতন জীবন, নূতন আলোক নিয়ে এসেছে। এ মুক্তদল অমর।' বিভীষিকা কাঁপিয়া উঠিল, 'আমায় চেন না? আমি শৃঙ্খল। তুমি যাই বল, তোমাকে হত্যা করাই আমার ব্রত। মুক্তিকে বন্ধন দেওয়াই আমার লক্ষ্য। তোমাকে মরতে হবে।' দুরন্ত পথিক বুক বাড়াইয়া বলিল, 'মারো, বাঁধো, কিন্তু আমাকে তো বাঁধতে পারবে না; আমার তো মৃত্যু নেই । আমি যে আবার আসব।'

ক. বিভীষিকা কে?

খ. 'এ মুক্তদল অমর'-উক্তিটির মাধ্যমে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. অনুচ্ছেদটির আলোকে মুক্তিকামী মানুষের পরিচয় দাও।

ঘ. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত 'বিভীষিকা' ও 'দুরন্ত পথিক'-এর মধ্যে যে সংঘাতের সম্পর্ক তার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

বাংলা নববর্ষ

মুহম্মদ এনামুল হক

[লেখক পরিচিতি : মুহম্মদ এনামুল হক ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার বখতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৩৫ সালে History of Sufism in Bengal বিষয়ে গবেষণার জন্য তিনি পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি বি.টি. ডিগ্রিও অর্জন করেছিলেন। প্রধান শিক্ষক হিসেবে বেসরকারি স্কুলে চাকরি শুরু করে তিনি বিভিন্ন সরকারি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক, সরকারি কলেজে বাংলার অধ্যাপক, বিভিন্ন সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ, বাংলা একাডেমীর পরিচালক, বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য, ঢাকা জাদুঘরের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ইত্যাদি বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রেসিডেন্ট পুরস্কার, বাংলা একাডেমী পুরস্কার ও একুশে পদক লাভ করেন। মুহম্মদ এনামুল হক প্রধানত গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ' : চট্টগ্রামী বাংলার রহস্যভেদ, আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য (আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের সঙ্গে যৌথভাবে), বঙ্গে সুফী প্রভাব, বাংলা ভাষার সংস্কার, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ব্যাকরণ মঞ্জুরী, মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, মনীষা-মঞ্জুষা, বুলগেরিয়া ভ্রমণ ইত্যাদি। এ ছাড়া তাঁর কিছু সম্পাদিত গ্রন্থ ও কিছু ইংরেজি গ্রন্থ' রয়েছে। মুহম্মদ এনামুল হক ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।]

আজ বাংলা নতুন বছরের প্রথম দিন। দিনটিকে আমরা সচরাচর 'নববর্ষ' নামে চিহ্নিত করে থাকি। কারণ, নববর্ষ আমাদের কাছে ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

পৃথিবীর সর্বত্র 'নববর্ষ' একটি ট্রেডিশন, একটা ঐতিহ্য। এটি আবার এমন এক 'ঐতিহ্য' যার বয়সের কোনো গাছপাথর নেই। গোড়ার কোনো সুনির্দিষ্ট বছরের সাথেও এর কোনো যোগ ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না ; অথচ যে কোনো বছরের প্রথম দিনটি 'নববর্ষ' নামে পরিচিত হয়ে আসছে। এর মানে এই নয় যে, দিনটিই নতুন বছর। বরং এর মানে হচ্ছে, নতুন বছরের আগমন উপলক্ষে অনুষ্ঠিতব্য উৎসবের প্রথম দিন। প্রকৃতপক্ষে, নববর্ষ একটা নির্দিষ্ট উৎসবের দিন।

আবার, পৃথিবীর সব নতুন বছরও এক সময়ে আরম্ভ হয় না। এতদসত্ত্বেও নববর্ষের নামের সাথে কতকগুলো ব্যক্তিগত, আর কতকগুলো সমষ্টিগত অনুষ্ঠান চিরকাল অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। এগুলোর কোনো কোনোটি ধর্মের রঙে রঙিন, কোনো কোনোটি মর্মের রঙে রঙিন এবং কোনো কোনোটি ধর্ম ও মর্ম উভয় রঙে রঙিন। এগুলোতে রঙের ছোপ কখন কীভাবে লাগল, তার আঁচ পাওয়া তেমন কোনো কঠিন কাজ নয়, তার জন্য মানব সভ্যতার ইতিহাস যথেস্ট বলে গণ্য হওয়া উচিত।

যতগুলো 'অব্দ' বা বৎসর পৃথিবীময় চালু ছিল বা আজও চালু আছে, তার সবগুলোই নির্দিষ্ট কালিক সীমারেখায় চিহ্নিত। অথচ, নববর্ষের অনুষ্ঠানগুলোর অনেকটিতে কালিক সীমারেখা চিহ্নিত করা যায় না। এগুলো যেন কালাতীত। তা হলে বুঝতে হয়, পৃথিবীতে পরিচিত বছরগুলোর আগে থেকেই এ অনুষ্ঠানগুলো প্রতিপালিত হত এবং বছর গোনা শুরু হয়েছে এমন কতগুলো অজ্ঞাতকুলশীল অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই।

'নববর্ষে' আমরা অতীত বৎসরের তিরোধান এবং সমাগত বৎসরের আবির্ভাবের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে যাই। যে বছর প্রকৃতির রঙ্গামঞ্চ থেকে বিদায় নিল, একদিকে তার সুখ-দুঃখের বহু স্মৃতিমাখা চিত্র বিলীয়মান এবং অন্যদিকে যে বছর প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হল তার ভাবী, অথচ অনিশ্চিত সম্ভাবনা সুনিশ্চিতরূপে বিদ্যমান। মানুষের মনোরাজ্যের এই অবস্থাটি অনুভব করা যায়, বর্ণনা করা যায় না।

প্রকৃতির রাজ্যে এক ঋতুর বিদায় ও অন্য ঋতুর আগমনে যে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, তা প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে ফুটে ওঠে। এ দেশের নয়, পৃথিবীর সব পশু-পক্ষী প্রকৃতির পরিবর্তিত প্রভাব থেকে রেহাই পায় না।

মানুষগুলোর শরীর ও মনে ছোঁয়া লাগে। আর, তারা নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে থাকে। এ অনুষ্ঠানগুলোর ঢং আর রং সর্বত্র এক নয়। যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষের ধ্যান-ধারণা অনুসারে এগুলো ভোল পালটিয়েছে বটে, তবে এ ভোলের আড়ালে তার যে আসল রূপ, তা বের করে নেওয়া এমন কোনো শক্ত কাজ নয়।

'বাংলা নববর্ষে'র রূপ তার আচরিত অনুষ্ঠানগুলোতেই ধরা পড়ে। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীর যে কোনো জাতীয় উৎসবের রূপ তার প্রতিপালিত অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। বাংলা নববর্ষের জন্য এ কোনো বিশিষ্ট ব্যবস্থা নয়। 'পয়লা বৈশাখ' বাঙালির স্বতঃস্ফূর্ত চিত্তচাঞ্চল্যের বহুমুখী অভিব্যক্তিই বড়-ছোট নানা অনুষ্ঠানে রূপ গ্রহণ করে থাকে। তাই পয়লা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ-কে বুঝতে হলে এই দিনে প্রতিপালিত অনুষ্ঠানগুলোর একটি মোটামুটি হিসাব নিকাশ করে তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রবৃত্ত হতে হবে। এ অনুষ্ঠানগুলোকে মোট দু ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- সর্বজনীন অনুষ্ঠান ও স্থানীয় অনুষ্ঠান।

বাংলা নববর্ষের যে সমস্ত অনুষ্ঠান 'স্থান' ও 'পাত্র' সাপেক্ষ নয়, সেগুলোকে 'সর্বজনীন অনুষ্ঠান' নামে চিহ্নিত করা যায়। এ সমস্ত অনুষ্ঠান বাংলায় কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নয় ; শুধু হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষ এগুলো পালন করে না। এগুলো এখনও সম্পূর্ণ না হলেও বেশ ব্যাপকভিত্তিক অনুষ্ঠান। এককালে এগুলো যে সর্বজনীন ও সর্বব্যাপক ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পয়লা বৈশাখে বাংলার জনসমষ্টি অতীতের সুখ-দুঃখ ভুলে গিয়ে নতুনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ওঠে। তারা জানে, এ নতুন অনিশ্চিতের সুনিশ্চিত সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। তাই মন সাড়া দেয়, চঞ্চল হয়, নতুনকে গ্রহণ করার প্রস্তুতি নেয়। তারা সেদিন প্রাত্যহিক কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে ঘরবাড়ি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে, আটপৌরে জামা কাপড় ছেড়ে, ধোপ দোরস্ত পোশাক পরিচ্ছদ পরে, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের সাথে দেখা করে পানাহারে মেতে যায় ; বটের তলায় জড়ো হয়ে গান গায়, হাতে তালি বাজায়, মুখে বাঁশি ফুঁকে, মাঠে-ঘাটে খেলায় বসে পড়ে, পুকুরে সাঁতার কাটে, ডুব দেয় ও নদ-নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সব কিছু মিলে দেশটা যেন হয়ে উঠে উৎসবমুখর।

চৈত্রের শেষ ও বৈশাখের প্রথম থেকেই গ্রীষ্মের দাবদাহ শুরু হয়। এ সময় আকাশ থেকে আগুন ঝরে ; পশুপক্ষী গাছের ছায়ায় ঝিমুতে থাকে; মানুষের হাতে হাতে তালের পাখা শোভা পায়। বাংলার সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলের মানুষগুলো ডাবের জলে তৃষ্ণা মেটায় ; ডাবের শাঁসে অমৃতের স্বাদ গ্রহণ করে। দেশ জুড়ে চাতক 'দে জল দে জল' বলে চেঁচাতে থাকে আর উত্তরবঙ্গের পাড়ায় পাড়ায় সাঁঝের বেলায় 'আল্লা মেঘ দে, পানি দে' বলে যুবক যুবতী, বালক বালিকা সমস্বরে হাহাকার তোলে। মেঘের কাছ থেকে জল ভিক্ষা করা বাংলা নববর্ষের আর একটা সর্বজনীন অনুষ্ঠান।

বাংলা চিরদিনই কৃষিপ্রধান দেশ। শিল্পের ছোঁয়াচ লাগলেও, এদেশ এখনও শিল্পায়িত হতে অনেক দেরি। আবার এর কৃষি এখনও স্বনির্ভর নয়, বরং তার প্রায় সবটাই বৃষ্টিনির্ভর। বৃষ্টির জন্য চাই মেঘ। মেঘ না হলে বৃষ্টি হয় না ; বৃষ্টি না হলে মাঠে লাঙল দেওয়া যায় না; লাঙল দেওয়া না গেলে মাঠে শস্য বোনাও একরূপ অসম্ভব। চাষবাসের সব কাজ বৈশাখ মাস থেকেই শুরু করতে হয়। এই রেওয়াজ এত প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী যে, আজও চাষীদের মধ্যে অনেকেই চৈত্র মাসে বৃষ্টি হলেও বৈশাখ মাসের আগে মাঠে চাষ দেয় না। তারা মনে করে, চৈত্র মাসে শস্য বুনলে সে শস্য ফলে না। এ লৌকিক ধারণার সত্যতা যাচাই সম্ভব হয়নি।

বাংলা নববর্ষের সর্বজনীন অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে বার্ষিক মেলার আয়োজনও একটি। বাংলাদেশের নানা স্থানে সারা বৈশাখ মাস ধরে, বিশেষ করে পয়লা বৈশাখে বড় ছোট নানা মেলা বসে। স্থানীয় লোকেরাই এসব মেলার আয়োজন করে থাকে। মেলাগুলোর স্থায়িত্বকাল এক থেকে সাত দিন। উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলার নেকমর্দানে এখনও পয়লা বৈশাখে যে মেলা বসে, তা হচ্ছে উত্তরবঙ্গের সবচাইতে বড় মেলা। এ মেলা এক সপ্তাহকাল স্থায়ী হয়। এতে উত্তরবঙ্গের হেন বস্তু নেই, যা পাওয়া যায় না। জনসাধারণের আনন্দ দানের উপযোগী আয়োজন এ মেলায় কম থাকে না। তন্মধ্যে নাচ, গান, নাগরদোলা প্রভৃতিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা নববর্ষের 'পুণ্যাহ' নামক আরও একটি অনুষ্ঠান সর্বজনীন। পুণ্যাহ শব্দের মৌলিক অর্থ : 'পুণ্য কাজ অনুষ্ঠানের পক্ষে জ্যোতিষ-শাস্ত্রানুমোদিত প্রশস্ত দিন।' কিন্তু বাংলায় এর অর্থ দাড়িয়ে গেছে জমিদার কর্তৃক প্রজাদের কাছ থেকে

নতুন বছরে খাজনা আদায় করার প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানসূচক দিন। এই সেদিন পর্যন্ত জমিদার ও বড় বড় তালুকদারের কাছারিতে পুণ্যাহ অনুষ্ঠিত হত। যদিও অধিকাংশ পুণ্যাহ পয়লা বৈশাখে উদযাপিত হত, বেশ কিছু সংখ্যক পুণ্যাহ সারা মাস ধরে পূর্ব নির্ধারিত দিনে অনুষ্ঠিত হত। সেদিন অধিকাংশ প্রজা ভালো কাপড়-চোপড় পরে জমিদার তালুকদার বাড়িতে খাজনা দিতে আসতেন। প্রজারা নতুন বছরের অথবা অতীত বছরের খাজনা আংশিক বা পুরোপুরি পরিশোধ করতেন। কোথাও কোথাও জমিদার তালুকদারেরা পান-সুপারি দিতেন, আর কোথাও কোথাও মিষ্টিমুখও করাতেন। ঐ দিন জমিদার-প্রজার সম্বন্ধের দূরত্ব খুব কমে আসত। তাঁরা পরস্পর মিলিত হতেন, পরস্পরের সুখ-দুঃখের খবর নিতেন, এমন কি পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতেন। দেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে এ হিসেবেই এগুলো স্থানীয়।

'হালখাতার' অনুষ্ঠান পয়লা বৈশাখের আর একটি সর্বজনীন আচরণীয় রীতি। আমাদের দেশের সব শ্রেণীর ব্যবসায়ীর, অর্থাৎ দেশীয় ধরনের যারা ব্যবসায়ের হিসাব রাখেন তাঁদের মধ্যেই এই অনুষ্ঠানটির প্রচলন এখনও বর্তমান। তবে, অর্থনৈতিক কারণে এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রভাবে পয়লা বৈশাখের এই অনুষ্ঠানটির জাঁকজমক এখন বেশ কিছুটা কমে গেছে। কিন্তু 'হালখাতা' এখনও যথারীতি খোলা হয়। এখনও ব্যবসায়ীদের বিপণিগুলো পয়লা বৈশাখে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে পতাকা, লতা পাতা প্রভৃতি দিয়ে সাজানো হয়। এখনও এই দিনে ব্যবসায় কেন্দ্রগুলোতে বেচাকেনার চেয়ে আলাপ আলোচনার ও সামাজিকতার পরিচয় পাওয়া যায় বেশি।

'হালখাতা' নতুন বাংলা বছরের হিসাব পাকাপাকিভাবে টুকে রাখার জন্য ব্যবসায়ীদের নতুন খাতা খোলার এক আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ। এতে তাঁদের কাজ কারবারের লেনদেন, বাকি বকেয়া, উসুল-আদায় সবকিছুর হিসাব নিকাশ লিখে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। নানা কাজ কারবারে তাঁদের সাথে যাঁরা সারা বছর জড়িত থাকেন অর্থাৎ যাঁরা তাঁদের নিয়মিত গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক ও শুভার্থী, তাঁদের পত্রযোগে অথবা লোক মারফত দাওয়াত দিয়ে দোকানে একত্র করে সাধ্যমত জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। এ আপ্যায়ন একান্ত সৌজন্যমূলক হলেও এ সুযোগে অনেকে তাঁদের বাকি বকেয়াও শোধ করে দেন, যেন হালখাতায় বাকির ঘরে তাঁদের নাম স্থান না পায়। নেহাত অসমর্থ না হলে কেউ বাকির ঘরে নাম তুলতে চান না। তাঁদের কাছে এটা একটা অপমানজনক ব্যাপার। এ দিক থেকে লক্ষ করলে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় যে, 'হালখাতা' অনুষ্ঠান 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠানেরই ওপিঠ। উভয় অনুষ্ঠানের সামাজিকতা, লৌকিকতা, সম্প্রীতি ও সৌজন্যের দিকও লক্ষণীয়। যতই রকমারি ও ভিন্ন প্রকৃতির হোক, নববর্ষের উৎসব এ অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটা অতি সাধারণ ব্যাপার লক্ষ করা যায়। পৃথিবীব্যাপী নরনারী নববর্ষে অনুভব করে যে, জীবন ধারণের একটা কালচক্র সম্পূর্ণ আবর্তিত এবং আর একটা কালচক্র সবে আবর্তনোদ্যত। এই দুই আবর্তনের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে সবাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নববর্ষের উৎসবে যোগ দিয়ে থাকে। তাদের এ উৎসবের অনুষ্ঠানগুলোতে আশা, নিরাশা, আনন্দ, উল্লাস অথবা ধর্ম প্রাধান্য লাভ করে।

আজও পৃথিবীতে ঋতুর পরিবর্তন ঘটে। আজও পৃথিবী বিভিন্ন ঋতুতে তার রূপ ঘটায়। আজও মানুষের দেহ মনে তার ছোঁয়া লাগে। আজও মানুষ ভিন্ন ভিন্ন সময় বিশ্বময় 'নববর্ষ' উদযাপন করে।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধটি মুহম্মদ এনামুল হক রচিত 'মনীষা মঞ্জুষা ' (৩য় খন্ড) থেকে সংকলিত হয়েছে। প্রবন্ধটির মূল নাম 'বাংলা নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ।' প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত আকারে সংকলিত হয়েছে।

মূলবক্তব্য

'নববর্ষ' আমাদের জাতীয় জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসবের দিন। নববর্ষের দিনটি বিগত বছরের বিদায় এবং নতুন বছরের আগমন নির্দেশ করে। নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নববর্ষের প্রথম দিনটিতে

মানুষ অতীতের সুখ-দুঃখ ভুলে গিয়ে নতুনের আহ্বানে সাড়া দেয় । নতুনকে গ্রহণ করার জন্য উদ্দীপ্ত হয়। তখন নানারকম আনন্দ উৎসবে লোকজন মগ্ন হয়। নববর্ষ উপলক্ষে গ্রামে গঞ্জে শহরে মেলার আয়োজন হয়। 'পুণ্যাহ' ছিল জমিদারির নববর্ষের অনুষ্ঠান। ব্যবসায়ীরা নববর্ষে হালখাতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। নববর্ষের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের আশা, নিরাশা, আনন্দ, উল্লাস অথবা ধর্ম প্রাধান্য লাভ করে। সারা বিশ্বে ভিন্ন ভিন্ন সময় নববর্ষ উদযাপিত হয়ে থাকে।

শব্দার্থ ও টীকা

ট্রেডিশন- ঐতিহ্য, দীর্ঘদিন ধরে চলে এসেছে এমন রীতি। **অজ্ঞাতকুলশীল**- যার পরিচয় জানা নেই। **তিরোধান**- অদৃশ্য হওয়া। **প্রাত্যহিক**- প্রতিদিনের। **আটপৌরে**- সব সময় পরার উপযোগী। **রেওয়াজ**- রীতি। **টুকে রাখা**- খাতায় লিখে রাখা। **রকমারি**- বৈচিত্র্যপূর্ণ। **কালচক্র**- এক একটি বছর যেন জীবনের একটি চক্র বা বৃত্ত।

এক বছর শেষ হলে অন্য বছরের শুরু- নববর্ষের দিনটির মাধ্যমে জীবনে নতুন বছরের যাত্রা। অতীতকে পেছনে ফেলে নতুন বছর আসে নববর্ষের দিনটির মাধ্যমে, তাই নববর্ষের দিনটি মানব জীবনে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

বিশ্বময় নববর্ষ- সারা পৃথিবীতে মানুষ নববর্ষ উদযাপন করে, তবে তা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। সকল জাতির বছর শুরুর সময়ের ভিন্নতার জন্য নববর্ষ উদযাপনেও ভিন্নতা দেখা যায়।
গাছপাথর- এমন প্রাচীন যে ঠিক-ঠিকানা জানা দুরূহ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন দুটি অনুষ্ঠানে সামাজিকতা, লৌকিকতা, সম্প্রীতি ও সৌজন্যের দিক লক্ষণীয়?
   ক. হালখাতা ও মেলা
   খ. হালখাতা ও পুণ্যাহ
   গ. পুণ্যাহ ও মেঘের কাছ থেকে জলভিক্ষা
   ঘ. মেলা ও মেঘের কাছ থেকে জলভিক্ষা

২. নববর্ষ আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি একটি–
   ক. ঐতিহ্য খ. উৎসবের দিন
   গ. নতুন দিন ঘ. ত্যাগের দিন

৩. নববর্ষের দিনে আমাদের কোন ভবিষ্যৎ সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ?
   ক. সমৃদ্ধ খ. প্রতাপশালী
   গ. উৎসবমুখর ঘ. সংগ্রামমুখর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪, ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'পৃথিবীব্যাপী নরনারী নববর্ষে অনুভব করে যে, জীবন ধারণের একটি কালচক্র সম্পূর্ণ আবর্তিত এবং আর একটা কালচক্র সবে আবর্তনোদ্যত। এই দুই আবর্তনের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে সবাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নববর্ষের উৎসবে যোগ দিয়ে থাকে। তাদের এ উৎসবের অনুষ্ঠানগুলোতে আশা, নিরাশা, আনন্দ, উল্লাস অথবা ধর্ম প্রাধান্য লাভ করে।'

৪. উদ্ধৃতাংশে 'আবর্তনের সন্ধিস্থল' বলতে কোনটিকে বোঝানো হয়েছে?
   ক. বাংলা নববর্ষ খ. ইংরেজি নববর্ষ
   গ. বছরের শেষ দিন ঘ. বছরের প্রথম দিন

৫. 'একটি কালচক্র সম্পূর্ণ আবর্তিত'— এই অংশে কোন সময়ের কথা বলা হয়েছে?
   ক. নতুন বছর   খ. পুরাতন বছর
   গ. বিবর্তিত বছর   ঘ. অনাগত বছর

৬. মেঘের কাছে জল ভিক্ষা চাওয়া কোন ধরনের অনুষ্ঠান?
   ক. লৌকিক   খ. ধর্মীয়
   গ. সামাজিক   ঘ. গোষ্ঠীগত

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের উদ্দীপকটির আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

বাংলা নববর্ষ

ক. কোন দিনকে কেন্দ্র করে নববর্ষ উদ্‌যাপন করা হয়?
খ. 'নববর্ষে উদ্‌যাপিত অনুষ্ঠানগুলো সর্বজনীন।'— উদ্দীপকটির আলোকে এর যথার্থতা ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকে বাংলা নববর্ষের গুরুত্বের যে দিকগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে তার সঙ্গে তোমার দেখা কোনো মেলার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য তুলে ধর।
ঘ. উদ্ধৃত ছকের আলোকে বাংলা নববর্ষের 'স্বরূপ' অংশটি বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের অনুচ্ছেদটির আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

সাধারণত কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করে লেখক কোনো বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে আত্মসচেতন নাতিদীর্ঘ সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করেন তাকে প্রবন্ধ বলে। আবেগের যুক্তি বা জ্ঞানবুদ্ধি প্রবন্ধের প্রাণ। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ আমাদের বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণতর, দৃষ্টিকে সমুজ্জ্বল ও জ্ঞানের পরিধিকে প্রশস্ত করে তোলে। মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক জীবনের তথ্য সংগ্রহ করেই প্রবন্ধকার তাঁর প্রবন্ধের ডালি সাজিয়ে তোলেন। এমন একটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রবন্ধ ড. মুহম্মদ এনামুল হকের 'বাংলা নববর্ষ'।

ক. 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধটি লেখকের কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
খ. অনুচ্ছেদটির আলোকে প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত কর।
গ. অনুচ্ছেদের আলোকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধটিকে তুমি কি বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ মনে কর? তোমার মতামতের পক্ষে যুক্তি দেখাও।
ঘ. 'মানুষের জীবনের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেই প্রবন্ধকার তাঁর প্রবন্ধের ডালি সাজিয়ে তোলেন।'— 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

রেখাচিত্র
আবুল ফজল

[লেখক পরিচিতি : আবুল ফজল ১লা জুলাই ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার কেঁওচিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়া শেষ করে তিনি প্রথমে স্কুলে শিক্ষকতা করেন, পরে সরকারি কলেজে দীর্ঘদিন বাংলা বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং রাষ্ট্রপতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে আবুল ফজল প্রথমে উপন্যাস লিখে প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেও তিনি মূলত একজন চিন্তাশীল ও সমাজমনস্ক প্রবন্ধকার। তাঁর প্রবন্ধে সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র সম্পর্কে গভীর ও স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : জীবনপথের যাত্রী, রাঙা প্রভাত, চৌচির, মাটির পৃথিবী, আয়েশা, আবুল ফজলের শ্রেষ্ঠ গল্প, সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন, সমাজ সাহিত্য রাষ্ট্র, শুভবুদ্ধি, সমকালীন চিন্তা, রেখাচিত্র, সফরনামা, দুর্দিনের দিনলিপি ইত্যাদি। আবুল ফজল ১৯৮৩ সালের ৪ঠা মে মৃত্যুবরণ করেন।]

আমাদের গ্রাম একেবারে অজ পাড়াগাঁ শহর থেকে বহুযোজন দূরে। আমার ছোটবেলা কেটেছে ঐ পাড়াগাঁয়ে। প্রকৃতির আপন হাতে দেওয়া ঐশ্বর্য ছাড়া ঐখানে দেখার আর কিছুই ছিল না। আজও যে তার বিশেষ ব্যতিক্রম হয়েছে তা নয়। তবে কোনো কোনো বাড়িতে সাবেকি পান্তা ভাতের বদলে আধুনিক সভ্যতার নিত্যসঙ্গী চায়ের চল হয়েছে সকালের নাশ্‌তা আর মেহমানদারির অঙ্গ হিসেবে। আমরা চা চেখে দেখার সুযোগ পেয়েছি কিছুটা সেয়ানা হয়ে, যখন লেখাপড়ার জন্য শহরে এসেছি তখন। প্রথম প্রথম চা খেলে আমাদের মাথা ধরত, ভালো ঘুম হত না রাত্রে। এখন চা না খেলে মাথা ধরে, ঘুমেরও হয় ব্যাঘাত। অভ্যাস ও কালের পরিবর্তনের এমনি মহিমা।

ধনী ও অবস্থাপন্ন পরিবার বলতে যা বোঝায় তেমন পরিবার আমাদের গ্রামে একটাও নেই। সবাই গরিব চাষি। যৎসামান্য চাষের জমি ছাড়া জীবিকার দ্বিতীয় কোনো পথ খুঁজতে কাকেও দেখিনি। এমন কি সারা গ্রামে একটা টিনের ঘরও ছিল না। আমার শৈশবে আমাদের বাড়িটা একবার পুড়ে গিয়েছিল- নতুন করে ঘর করার সময়, বাবাই প্রথম গ্রামে টিন আমদানি করেন। পাড়ার একমাত্র মসজিদটির তত্ত্বাবধানের ভার বংশানুক্রমে আমাদের ওপর। শুনেছি পিতামহই মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন- সেই থেকে এ ভার তাঁর বংশধরদের ওপর এসে পড়েছে। বাবা টিন এনে প্রথমে দিলেন মসজিদে ও পরে নিজের ঘরে। কাঠের কড়ি বরগার ফ্রেমে গেঁথে মসজিদের টিন লাগিয়েছিলেন বটে কিন্তু নিজের ঘরে তা পারেননি। নতুন কেনা টিনগুলো বাঁশের চালের ওপর বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। মসজিদ এবং ঘরের এক অংশ মাটির দেয়াল তুলে দীর্ঘস্থায়ী করার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। কিন্তু ১৯৫১ সনের বন্যায় সে ঘর, মসজিদ ও আমার তৈয়ারি দীর্ঘ দেউড়ি বা বাইর বাড়ি সব ধসে পড়েছিল। বন্যা নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি মসজিদ তুলে দিই, কিন্তু ভিটায় ঘর তুলিনি অনেক দিন। বড় কারণ, প্রয়োজন ছিল না। সম্প্রতি (১৯৬০-৬১) একটি ছোট্ট মাটির ঘর তোলা হয়েছে- কোনো সময় গিয়ে এক আধ রাত থাকা যাবে এ উদ্দেশ্যে। কাজেই আমি যে ঘরে জন্মেছিলাম সে ঘরের আজ আর কোনো চিহ্নই নেই।

আমাদের বাড়িটা ছিল মস্ত বড় এক পুকুর পাড়ে–পুকুরটার পাড়ের ওপর জলের ধারেই ছিল আমাদের শোবার ঘরটা। এটা আসলে ছিল নাকি দেউড়ি ঘর। পিতামহ ছিলেন আলেম, ছেলে পড়াতেন আর নিজের পরিবার নিয়ে থাকতেন ওখানে। বাঁটোয়ারার সময় ভাইরা তাঁকে মূল ভিটার কোনো অংশ দেয় নি। এভাবে পুকুর পাড়ের দেউড়ি ঘরই হয়ে গেছে তাঁর বংশধরদের স্থায়ী বাসস্থান।

বর্ষাকালে পুকুরের পানি বাড়তে বাড়তে প্রায় ঘরের বেড়ার কাছে এসে পৌঁছত। অনেকদিন প্রায়ই লাফিয়ে পড়ত ব্যাঙের বাচ্চা সোজা আমাদের ভাতের বাসনের ওপর। তখন শুরু হত রীতিমতো হইচই- যে যা হাতের কাছে পেতাম চেলা কাঠ, খড়ম, চটি, লাঠিসোটা তাই নিয়ে শুরু হত ব্যাঙ মারার প্রতিযোগিতা। মা হয়তো তাক করে ব্যাঙটাকে একটা ধামাচাপা দিয়ে আমাদের সাধের অভিযানকে মাঝপথে খতম করে দিয়ে ফের আমাদের বসিয়ে দিতেন দক্ষিণ হাতের কাজে। অবশ্য তার আগে তিনি আমাদের সকলের বাসন থেকে কিছু কিছু ভাত তুলে ফেলে দিতেন। এটা ছিল নেহাৎ

মনকে চোখ ঠারানো। কারণ ব্যাঙটা লাফ দিয়ে কার বাসনে কোথায় যে পড়েছিল তা আমরা যেমন লক্ষ করিনি, তিনিও তা করেননি। তিনি ছিলেন তখন আমাদের পাতে পাতে সালুন বণ্টনে ব্যস্ত।

আমাদের পাড়ার চারদিকে প্রায় খোলা বিল। বর্ষাকালে এসব বিল থাকে প্রায় পানিতে ডোবা। বন্যা হলে তো কথাই নেই। বড় বড় বন্যার সময় আমাদের উঠানেও এক হাঁটু পানি হতে দেখেছি। সে পানিতে এ বাড়ি ও বাড়ি হেঁটে বেড়ানো ছিল আমাদের এক শখ।

শরৎকালে কিন্তু এ বিলের যা শোভা তা যে শুধু চোখ জুড়িয়ে দেয় তা নয়, মনকেও ভুলিয়ে রাখে। যেদিকে দু'চোখ যায় শুধু দেখা যায় সবুজ, সবুজ–একেবারে সবুজের মেলা। উপরের আকাশটুকু বাদ দিলে নিচে সবুজ ছাড়া আর যে কোনো রং আছে তা বোঝাই যায় না। বর্ষার স্বল্পায়ু রাত্রি তখন ধীরে ধীরে দীর্ঘ হতে থাকে, ঘুমানো যায় দু চোখ ভরে। মুসলমান পাড়ায় আযানের আগেই শোনা যায় মোরগের দরাজ গলার আওয়াজ, যাকে আমরা বলি বাঁক। এখন যেমন তখনও আমার অভ্যাস ছিল সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়া। কাজেই মোরগের বাঁকের সঙ্গে সঙ্গে ঘুম যেত ছুটে। তখন কিন্তু বাইরে রীতিমতো আঁধার, তাই জেগে ঘুমানোর পালা চলত আরও বেশ কিছুক্ষণ। তখন বেড়ার ঘরে জানালা দেওয়াকে মনে করা হত চটি জুতোয় ফিতা লাগানো। তাই বাইরে ফর্সা হয়েছে কিনা দেখার একমাত্র উপায় বেড়ার ফাঁক। সে ফাঁকে আলোর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই উঠে পড়তাম বিছানা ছেড়ে।

উঠেই ছুটে যেতাম পুকুর পাড়ে, সন্ধ্যাবেলা ব্যাঙ গেঁথে যেসব বড়শি বসিয়েছি দু চার হাত তফাৎ তাতে মাছ ধরেছে কিনা দেখতে। কখনও কখনও পেয়ে যেতাম দু চারটা শোল কি বোয়ালের বাচ্চা। তারপর ছুটতাম বিলে, সোজা ধানখেতে। তখন ধানের গোড়ায় পানি কমতে শুরু করেছে। নির্বংশ হওয়ার আশঙ্কায় মৎস্যকুল হয়েছে দিশেহারা। ওপরের জমি থেকে পানি শির শির করে বয়ে চলেছে নিচের জমিতে, ব্যাকুল মাছেরাও সে স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে নিচের দিকে দিয়েছে পাড়ি, বোধ করি প্রাণ বাঁচানোর শেষ চেষ্টায়। আগের দিন বেলা ডোবার সঙ্গে সঙ্গে, আলের মাঝখানে পানি চলাচলের পথ করে আমরা পাড়ার ছেলের দল বসিয়ে দিয়েছি 'চাই'- বাঁশের শলা আর বেতের সাহায্যে তৈরি সরু-গলা মাছধরার এক রকম ফাঁদ। এতে ঢোকা যায়। কিন্তু বের হওয়া যায় না। এবার ছুটে গিয়েছি সে চাঁই তুলতে। দেখা যায় বেলে, চিংড়ি, লাটা, পুঁটি ইত্যাদি হরেক রকমের মাছে 'চাইয়ের তলাটা প্রায় ভর্তি। তবে কাঁকড়াও অবশ্য বাদ নেই। মাঝে মাঝে মৎস্যভুক ঢোঁড়া সাপও যে ঢুকে না পড়ে তা নয়। চাইটা এনে উঠোনের ওপর ওপুড় করে ঢালা হয়। মা-চাচিরা কুড়িয়ে নেন মাছগুলো। দুচারটে কাঁকড়া রোজই থাকে- তার দু একটার ঠ্যাংয়ে সুতো বেঁধে এবার আমরা শুরু করি খেলা - দৌড় লাগাই একটার সঙ্গে আর একটার। এ সময় হঠাৎ মাঝে মাঝে আবির্ভাব ঘটত হলদে পাখির- আমাদের গ্রামদেশের সবচেয়ে সুন্দর পাখি। দেখলেই আমরা ছেলের দল চেঁচিয়ে উঠতাম-আইজ গরবা আইব, আইজ গরবা আইব। 'গরবা' মানে মেহমান। এখন মেহমান দস্তুর মতো আতঙ্কের ব্যাপার, তখন তা ছিল খুশির। প্রায় উৎসবের সামিল। বিশেষ করে ছোটদের কাছে।

কারণ, তখনকার দিনে কোনো মেহমান খালি হাতে আসতেন না, আর তাদের উপলক্ষ করে নাশ্‌তা তৈরি আর মুরগি জবাই ছিল বাঁধা। মুরগি পোলাও হত পালা পরব আর গরবার জন্যই। হঠাৎ কোনো কোনোদিন সকাল বেলায় দেখতাম কোথা থেকে এক জোড়া হলদে পাখি এসে বসে পড়েছে পুকুর পাড়ের আম কি কাঁঠাল গাছে অথবা আমাদের উঠানের সজনা গাছের ডালে। ছোটকালে আমাদের মনে এ এক অদ্ভুত বিশ্বাস ছিল যে, হলদে পাখি হচ্ছে মেহমানের অগ্রদূত। এ বিষয়ে মেয়েদের বিশ্বাস আমাদের চেয়েও শক্ত। হলদে পাখি দেখলেই আমরা ভেতরে ছুটে গিয়ে মাকে এ সুসংবাদ শুনিয়ে আসতাম। আর তখন থেকে উৎসুক চোখে পথের দিকে চেয়ে থাকতাম বাতাসা বা পিঠের পাতিল হাতে কখন দেখা দেবেন মহামান্য মেহমান সাহেব তারই প্রতীক্ষায়। সত্য সত্যই কোনো কোনোদিন নির্ঘাত এসে যেতেন কেউ না কেউ। তখন আমাদের খুশি দেখে কে ! মেয়েদের বাপের বাড়ি কি আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার-যাকে গ্রামে বলা হয় 'নায়র', তারও মৌসুম এটা। চাষবাসের কাজ সেরে কৃষকদের যেমন জুটেছে এখন অফুরন্ত অবসর, তেমনি মেয়েরাও কাজের চাপ থেকে পেয়েছে রেহাই- দেহের সঙ্গে মনও হয়েছে হালকা। তাই এ সময় তারা যান নায়র করতে। চাষী পরিবারে পালকির রেওয়াজ নেই। দূরত্ব অনুসারে শেষ রাত্রে স্বামী বা দেবরকে সঙ্গে নিয়ে পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে তারা হেঁটেই রওয়ানা হন। ভোর হতে হতেই কর্দমাক্ত পায়ে বাপের বাড়ির দুয়ারে এসে পৌছেন। পাশের বাড়িতে

নায়রী এলেও আমাদের খুশির অন্ত থাকত না। কারণ, নায়রীও খালি হাতে আসতেন না। আর যে বাড়িতেই আসুন তার আনা নাশ্‌তা বিলানো হত আশেপাশের সব ঘরেই।

ঋতু পরিবর্তনটা শহরে তেমন নজরে পড়ে না, কিন্তু গ্রাম দেশে তা ভুলে থাকা সম্ভব নয়। ছেলে-বুড়ো সবাই প্রকৃতির পরিবর্তনটা বুঝতে পারে। কারণ, প্রকৃতির সঙ্গে গ্রামের সম্পর্ক নিবিড়। হেমন্তে আকাশ নির্মেঘ, আবহাওয়া এবং পথঘাট শুকনো। বিলময় সোনালি ধান। দিনের বেলা ধান কাটার ধুম। সন্ধ্যার পর চলে মাড়াইয়ের কাজ। সকালে উড়ানোর পালা। এ সময় দেখা দেয় মুড়ি-মোয়ার ফেরিওয়ালা, পান-সুপারি বিক্রেতা, শুঁটকিওয়ালী, ডুমনি, কাচ-চুড়িওয়ালা ইত্যাদি। কাজ করতে করতেই মেয়েরা তখন হয়ে ওঠে মুখর। চোখে মুখে দেখা দেয় হাসির ঝিলিক। ধান দিয়ে কেনে এটা ওটা।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'রেখাচিত্র' রচনাটি আবুল ফজল রচিত 'রেখাচিত্র' নামক গ্রন্থ থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। 'রেখাচিত্র' লেখকের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ।

মূলবক্তব্য

আবুল ফজলের এই আত্মজীবনীমূলক রচনাটির মধ্যে বাংলাদেশের গ্রামের একটি অনবদ্য চিত্র ফুটে উঠেছে। লেখকের বাল্যজীবন কাটে পাড়া গাঁয়ে- চট্টগ্রামের পল্লীতে। প্রকৃতির উদারতায় মায়াময় পরিবেশে তাঁর বাল্যজীবন হয়ে উঠেছিল পরম উপভোগ্য। তৎকালীন গ্রামীণ জীবনের সহজ সরল জীবন যাপন প্রণালী, মানুষের সরলতা ও উদারতা, মানুষের মধ্যে বিরাজমান সম্প্রীতি ইত্যাদির চিত্র সহজ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে এ লেখায়। বর্ষার বন্যায় পল্লীর বাস্তব রূপ এখানে বিধৃত হয়েছে। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন ও জীবিকায় যে রূপান্তর ঘটে তাও লেখকের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। গ্রামীণ জীবনের আলেখ্য বর্ণনাই এখানে লেখকের প্রধান লক্ষ্য।

শব্দার্থ ও টীকা

ঐশ্বর্য- সম্পদ। **সেয়ানা**- বড়। **অবস্থাপন্ন**- ধনী। **খতম**- শেষ। **দরাজ**- উঁচু। **নির্বংশ হওয়া**- মরে যাওয়া। **চাঁই**- মাছ ধরার জন্য বাঁশের তৈরি খাঁচা বিশেষ। **মৎস্যভুক**- মাছ খায় এমন। **গরবা [চট্টগ্রামের আঞ্চলিক শব্দ]**- অতিথি, মেহমান। **দস্তুর**- রীতি। আতঙ্ক - ভয়। **অগ্রদূত**- আগাম সংবাদ বাহক। **উৎসুক**- আগ্রহী। **নির্ঘাত** - নিশ্চিত। **অফুরন্ত**- যার শেষ নেই। **নায়র**- আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া। **কর্দমাক্ত**- কাদায় ভেজা। **নির্মেঘ**- মেঘহীন। **সালুন**- ঝোল। **ফর্সা**- আলোকিত।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'প্রকৃতির আপন হাতে দেওয়া ঐশ্বর্য ছাড়া ঐখানে দেখার আর কিছুই ছিল না।' এখানে 'প্রকৃতির আপন হাতে দেওয়া ঐশ্বর্য' কথাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. মনোলোভা অবারিত সৌন্দর্যসুষমা
খ. অযত্নে গড়ে ওঠা শ্যামলের বিচিত্র শোভা
গ. প্রকৃতি ও মানুষের অপূর্ব মিতালি
ঘ. সমৃদ্ধ জনজীবন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

২। 'বাবা টিন এনে প্রথমে দিলেন মসজিদে ও পরে নিজের ঘরে। এখানে বাবার কীরূপ মানসিকতার পরিচয় মেলে ?

i. ধর্মপরায়ণতা
ii. মানবিকতা
iii. সামাজিকতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. i ও ii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

ঋতুর পরিবর্তনটা শহরে তেমন নজরে পড়ে না, কিন্তু গ্রামদেশে তা ভুলে থাকা সম্ভব নয়। ছেলে বুড়ো সবাই প্রকৃতির পরিবর্তনটা বুঝতে পারে।

৩। 'আকাশ নির্মেঘ, আবহাওয়া এবং পথঘাট শুকনো'–কোন সময়ের প্রকৃতিতে এমন রূপটি ধরা পড়ে ?

ক. বর্ষায়
খ. শরতে
গ. হেমন্তে
ঘ. শীতে

৪। গ্রামীণ জনপদে সকলেই ঋতু পরিবর্তনের ধারাটি বুঝে উঠতে পারে। কোন যুক্তিতে কথাটি সমর্থন করছ?–এটা

i. দৈনন্দিন জীবন ধারায় আভাসিত হয়
ii. নব নব রূপে আবির্ভূত হয়
iii. ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিচিত্র রং ছড়ায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

অনুচ্ছেদটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও :

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অভ্যাস ও রুচিবোধের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। এককালে পল্লীর মায়াময় প্রকৃতিতে জীবন হয়ে উঠত উপভোগ্য। তৎকালীন গ্রামীণ আবহে যাপিত জীবনপ্রণালিতে মানুষের সরলতা, উদারতা ও সম্প্রীতির যে বন্ধন ছিল, তার অনেকটাই এখন পল্লীজীবনে অনুপস্থিত। এককালে গ্রামের বাড়িতে মেহমান এলে আনন্দের সীমা থাকত না। হলদে পাখির উপস্থিতি ছিল মেহমান আসার পূর্বাভাস। বর্ষার অখণ্ড অবসরে বধূরা বাপের বাড়িতে নায়র যেত। গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতিতে এসব রীতি রেওয়াজ বর্তমানে চরমভাবে ভাটা পড়েছে।

ক. কোনটিকে মেহমান আসার অগ্রদূত বলা হয়।
খ. গ্রামীণ জীবনে বর্ষা কীভাবে অখণ্ড অবসর এনে দেয় ?
গ. কালের পরিবর্তনে রুচি ও জীবনবোধেরও ব্যাপক পরিবর্তন হয়। যুক্তিসহ প্রমাণ কর।
ঘ. অনুচ্ছেদের আলোকে তৎকালীন গ্রামীণ জীবনধারার পরিচয় দাও।

শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

[লেখক পরিচিতি : মোতাহের হোসেন চৌধুরী ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নোয়াখালি জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৩ সালে বাংলায় এম.এ. পাশ করেন। কর্মজীবনে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। একজন সংস্কৃতিবান ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে তিনি খ্যাত ছিলেন। ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'শিখা' পত্রিকার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তাঁর লেখায় মননশীলতা ও চিন্তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর গদ্যে প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব লক্ষণীয়। মূলত গদ্যকার হলেও তিনি বেশ কিছু কবিতাও রচনা করেন। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ সংস্কৃতি কথা বাংলা সাহিত্যের মননশীল প্রবন্ধ ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তাঁর মৃত্যুর পর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। 'সভ্যতা' ও 'সুখ' তাঁর দুটি অনুবাদগ্রন্থ। ১৯৫৬ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন।]

মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জীবসত্তা সেই ঘরের নিচের তলা, আর মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব ওপরের তলা। জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে উঠবার মই হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাই আমাদের মানবসত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য জীবসত্তার ঘরেও সে কাজ করে; ক্ষুৎপিপাসার ব্যাপারটি মানবিক করে তোলা তার অন্যতম কাজ। কিন্তু তার আসল কাজ হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অন্য কথায়, শিক্ষার যেমন প্রয়োজনের দিক আছে, তেমনি অপ্রয়োজনীয় দিকও আছে। আর অপ্রয়োজনের দিকই তার শ্রেষ্ঠ দিক। সে শেখায় কী করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়, কী করে মনের মালিক হয়ে অনুভূতি ও কল্পনার রস আস্বাদন করা যায়।

শিক্ষার এ দিকটা যে বড় হয়ে ওঠে না, তার কারণ ভুল শিক্ষা ও নিচের তলায় বিশৃঙ্খলা জীবসত্তার ঘরটি এমন বিশৃঙ্খল হয়ে আছে যে, হতভাগ্য মানুষকে সব সময়ই সে সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়। ওপরের তলার কথা সে মনেই আনতে পারে না। অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি। ধনী-দরিদ্র সকলেরই অন্তরে সেই একই ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে : চাই, চাই, আরও চাই। তাই অন্নচিন্তা তথা অর্থচিন্তা থেকে মানুষ মুক্তি না পেলে, অর্থসাধনাই জীবনসাধনা নয়-একথা মানুষকে ভালো করে বোঝাতে না পারলে মানবজীবনে শিক্ষা সোনা ফলাতে পারবে না। ফলে শিক্ষার সুফল হবে ব্যক্তিগত, এখানে সেখানে দু একটি মানুষ শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যটি উপলব্ধি করতে পারবে, কিন্তু বেশির ভাগ লোকই যে তিমিরে সে তিমিরে থেকে যাবে।

তাই অন্নচিন্তার নিগড় থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার যে চেষ্টা চলেছে তা অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন না থাকলে সে চেষ্টাও মানুষকে বেশি দূর নিয়ে যেতে পারবে বলে মনে হয় না। কারারুদ্ধ আহারতৃপ্ত মানুষের মূল্য কতটুকু? প্রচুর অন্নবস্ত্র পেলে আলো হাওয়ার স্বাদবঞ্চিত মানুষ কারাগারকেই স্বর্গতুল্য মনে করে। কিন্তু তাই বলে যে তা সত্যসত্যই স্বর্গ হয়ে যাবে, তা নয়। বাইরের আলো হাওয়ার স্বাদ পাওয়া মানুষ প্রচুর অন্নবস্ত্র পেলেও কারাগারকে কারাগারই মনে করবে, এবং কী করে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তাই হবে তার একমাত্র চিন্তা। আকাশ-বাতাসের ডাকে যে পক্ষী আকুল, সে কি খাঁচায় বন্দি হবে সহজে দানাপানি পাওয়ার লোভে? অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়, এই বোধটি মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচয়।

চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির স্বাধীনতা, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা যেখানে নেই, সেখানে মুক্তি নেই। মানুষের অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে এই মুক্তির দিকে লক্ষ রেখে। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর মানুষটিকে তৃপ্ত রাখতে না পারলে আত্মার অমৃত উপলব্ধি করা যায় না বলেই ক্ষুৎপিপাসার তৃপ্তির প্রয়োজন। একটা বড় লক্ষ্যর দিকে দৃষ্টি রেখেই অন্নবস্ত্রের সমাধান করা ভালো, নইলে আমাদের বেশি দূর নিয়ে যাবে না।

তাই মুক্তির জন্য দুটি উপায় অবলম্বন করতে হবে। একটি অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা, আরেকটি শিক্ষাদীক্ষার দ্বারা মানুষকে মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়ানোর সাধনা। এ উভয়বিধ চেষ্টার ফলেই মানবজীবনের উন্নয়ন সম্ভব। শুধু অন্নবস্ত্রের সমস্যাকে বড় করে তুললে সুফল পাওয়া যাবে না। আবার শুধু শিক্ষার ওপর নির্ভর করলে সুদীর্ঘ সময়ের দরকার। মনুষ্যত্বের স্বাদ না পেলে অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়েও মানুষ যেখানে আছে সেখানেই পড়ে থাকতে পারে; আবার শিক্ষাদীক্ষার মারফতে মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলেও অন্নবস্ত্রের দুশ্চিন্তায় মনুষ্যত্বের সাধনা ব্যর্থ হওয়া অসম্ভব নয়।

কোনো ভারী জিনিসকে ওপরে তুলতে হলে তাকে নিচের থেকে ঠেলতে হয়, আবার ওপর থেকে টানতেও হয় ; শুধু নিচের থেকে ঠেললে তাকে আশানুরূপ ওপরে ওঠানো যায় না। মানব উন্নয়নের ব্যাপারে শিক্ষা সেই ওপর থেকে টানা, আর সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা নিচের থেকে ঠেলা। অনেকে মিলে খুব জোরে ওপরের থেকে টানলে নিচের ঠেলা ছাড়াও কোনো জিনিস ওপরে ওঠানো যায়- কিন্তু শুধু নিচের ঠেলায় বেশিদূর ওঠানো যায় না। তেমনি আপ্রাণ প্রচেষ্টার ফলে শিক্ষার দ্বারাই জীবনের উন্নয়ন সম্ভব, কিন্তু শুধু সমাজ ব্যবস্থার সুশৃঙ্খলতার দ্বারা তা সম্ভব নয়। শিক্ষাদীক্ষার ফলে সত্যিকার মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলে অন্নবস্ত্রের সমাধান সহজেই হতে পারে। কেননা, অন্নবস্ত্রের অব্যবস্থার মূলে লোভ, আর শিক্ষাদীক্ষার ফলে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে, 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু' কথাটা বুলিমাত্র নয়, সত্য। লোভের ফলে যে মানুষের আত্মিক মৃত্যু ঘটে, অনুভূতির জগতে সে ফতুর হয়ে পড়ে, শিক্ষা মানুষকে সে-কথা জানিয়ে দেয় বলে মানুষ লোভের ফাঁদে ধরা দিতে ভয় পায়। ছোট জিনিসের মোহে বড় জিনিস হারাতে যে দুঃখ বোধ করে না, সে আর যাই হোক, শিক্ষিত নয়। শিক্ষা তার বাইরের ব্যাপার, অন্তরের ব্যাপার হয়ে ওঠে নি। লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়। শিক্ষার আসল কাজ জ্ঞান পরিবেশন নয়, মূল্যবোধ সৃষ্টি; জ্ঞান পরিবেশন মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায় হিসেবেই আসে। তাই যেখানে মূল্যবোধের মূল্য পাওয়া হয় না, সেখানে শিক্ষা নেই।

শিক্ষার মারফতে মূল্যবোধ তথা মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়; তথাপি অন্নবস্ত্রের সুব্যবস্থাও প্রয়োজনীয়। তা না হলে জীবনের উন্নয়নে অনেক বিলম্ব ঘটবে। মনুষ্যত্বের তাগিদে মানুষকে উন্নত করে তোলার চেষ্টা ভালো; কিন্তু প্রাণিত্বের বাঁধন থেকে মুক্তি না পেলে মনুষ্যত্বের আহ্বান মানুষের মর্মে গিয়ে পৌঁছতে দেরি হয় বলে অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান একান্ত প্রয়োজন। পায়ের কাঁটার দিকে বারবার নজর দিতে হলে হাঁটার আনন্দ উপভোগ করা যায় না, তেমনি অন্নবস্ত্রের চিন্তায় হামেশা বিব্রত হতে হলে মুক্তির আনন্দ উপভোগ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই দু দিক থেকেই কাজ চলা দরকার। একদিকে অন্নবস্ত্রের চিন্তার বেড়ি উন্মোচন, অপরদিকে মনুষ্যত্বের আহ্বান, উভয়ই প্রয়োজনীয়। নইলে বেড়িমুক্ত হয়েও মানুষ ওপরে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করবে না, অথবা মনুষ্যত্বের আহ্বান সত্ত্বেও ওপরে যাওয়ার স্বাধীনতার অভাব বোধ করবে, পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো উড়বার আকাঙ্ক্ষায় পাখা ঝাপটাবে, কিন্তু উড়তে পারবে না।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধটি মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি কথা' গ্রন্থের 'মনুষ্যত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধের অংশবিশেষ।

মূলবক্তব্য

মানুষের দুটি সত্তা- একটি তার জীবসত্তা, অপরটি মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব। জীবসত্তার প্রয়োজনে অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্তি এবং শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে। শিক্ষার ফলে মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলে অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে ওঠে। শিক্ষার আসল কাজ মূল্যবোধ সৃষ্টি, জ্ঞান দান নয়; জ্ঞান মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায়মাত্র।

শব্দার্থ ও টীকা

নিগড়- শিকল, বেড়ি। **তিমির**- অন্ধকার। **ক্ষুৎপিপাসা**- ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। **ফতুর**- নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত। **লেফাফাদুরস্তি** - বাইরের দিক থেকে ত্রুটিহীনতা কিন্তু ভিতরে প্রতারণা। **বেড়ি**- শিকল, শৃঙ্খল। **হামেশা**- সবসময়, সর্বক্ষণ। **উন্মোচন**- উন্মুক্ত করা। **পিঞ্জরবদ্ধ**- খাঁচায় বন্দি। **জীবসত্তা**-জীবের অস্তিত্ব। জীবসত্তাকে টিকিয়ে রাখতে হলে অন্নবস্ত্র চাই।

মানবসত্তা-মানুষের অস্তিত্ব। মানবসত্তা বলতে লেখক মনুষ্যত্বকে বুঝিয়েছেন। শিক্ষার মাধ্যমে এই মনুষ্যত্ব অর্জন করা যায়। **অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি**- লেখকের মতে আমরা জীবসত্তাকে টিকিয়ে রাখতে অধিক মনোযোগী। ফলে অর্থচিন্তা আমাদের সারাক্ষণ ব্যস্ত রাখে। অর্থচিন্তায় ব্যস্ত মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জনে সক্ষম নয়।

কারারুদ্ধ আহারতৃপ্ত মানুষের মূল্য কতটুকু?- খাওয়া-পরার সমস্যা মিটে গেলেই জীবনের উন্নয়ন সম্ভব হয় না। এ জন্য প্রয়োজন চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির স্বাধীনতা ও আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা। শিক্ষার মাধ্যমেই এ স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধান করতে হবে কোন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে?

ক. চিন্তার স্বাধীনতা খ. আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা
গ. মানব-মুক্তি ঘ. অর্থনৈতিক মুক্তি

২. শিক্ষার সঙ্গে কোন বিষয়টি সবচেয়ে বেশি পরিপূরক?

ক. মূল্যবোধ অর্জন খ. কর্মক্ষেত্র নির্বাচন
গ. লেফাফাদুরস্তি ঘ. স্বাধীনতা লাভ।

৩. মনুষ্যত্ব লাভ করার উপায় কী?

i. শিক্ষা গ্রহণ ii. লেফাফাদুরস্তি
iii. অন্নবস্ত্রের সমাধান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii, খ. i ও iii,
গ. ii ও iii ঘ. i

৪. শিক্ষার সুফল ব্যক্তিগত হয়ে পড়বে কখন?

ক. অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্ত না হলে
খ. ভুল শিক্ষা গ্রহণ করলে
গ. সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা না থাকলে
ঘ. অর্থ-সাধনাকে জীবন-সাধনা ভাবলে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং এর আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
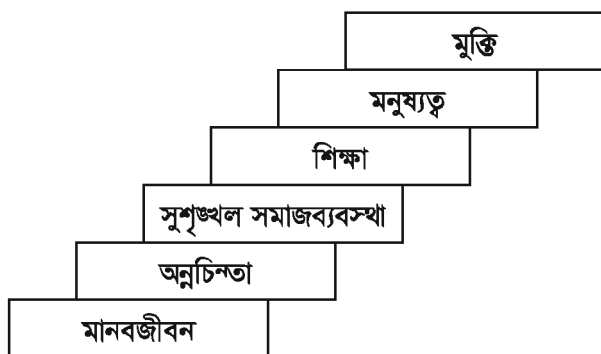
ক. মানব জীবনে সর্বপ্রথম প্রয়োজন কোনটি?
খ. উদ্দীপকের আলোকে মনুষ্যত্বে উত্তরণের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।
গ. সভ্য ও আধুনিক সমাজ গঠনে উদ্দীপকের ক্রমবিন্যস্ত ধাপগুলো কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে?– উপস্থাপন কর।
ঘ. 'মুক্তি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? মুক্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

রসগোল্লা

সৈয়দ মুজতবা আলী

[লেখক পরিচিতি : সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯০৪ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর আসামের কাছাড় জেলার করিমগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বভারতী থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর কিছুকাল তিনি আলীগড়ে অধ্যয়ন করেন। ১৯২৭ সালে তিনি আফগানিস্তানের শিক্ষা বিভাগের অধীনে কাবুল কৃষিবিজ্ঞান কলেজে ইংরেজি ও জার্মান ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কাবুল প্রবাসের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে তাঁর দেশে বিদেশে গ্রন্থে। ১৯৩২ সালে তিনি জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রিতে ভূষিত হন। তিনি কায়রোর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়াশুনা করেন। তিনি বিশ্বভারতী ও দক্ষিণ ভারতের বরোদা কলেজে বেশ কিছুকাল অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। সৈয়দ মুজতবা আলী ছিলেন বহুভাষাবিদ পণ্ডিত ও রসজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁর রচনাবলির মধ্যে : দেশে বিদেশে, চাচা কাহিনী, পঞ্চতন্ত্র, ময়ূরকণ্ঠী, ধূপছায়া, শবনম, অবিশ্বাস্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধির দীপ্তি ও হাস্যরস তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ১৯৭৪ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।]

আমার এক বন্ধু প্রায়ই ইউরোপ-আমেরিকায় যান। এতই বেশি যাওয়া আসা করেন যে তাঁর সঙ্গে কোথাও দেখা হলে বলবার উপায় নেই, তিনি বিদেশে যাচ্ছেন না ফিরে আসছেন।

ঝান্ডুদা ব্যবসায়ী লোক। তিনি নেমেছেন ইতালির ভেনিস বন্দরে জাহাজ থেকে। চুঙ্গিঘরের যাবতীয় প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে শেষটায় লিখেছেন, এক টিন ভ্যাকুয়াম প্যাক্ড মিষ্টান্ন। মূল্য দশ টাকা।

ঝান্ডুদার বাক্স-পেঁটরায় এত সব জাত-বেজাত হোটেলের লেবেল লাগানো থাকত যে, অগা চুঙ্গিওলাও বুঝতে পারত এগুলোর মালিক বাস্তুভিটার তোয়াক্কা করে না- তার জীবন কাটে হোটেলে হোটেলে। আজকের চুঙ্গিওলা কিন্তু সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে আরম্ভ করলে, প্রথম ভাগের ছেলে যে-রকম বানান ভুল করে করে বই পড়ে। লোকটার চেহারাও বদখত। টিঙটিঙে রোগা, গাল দুটো ভাঙা।

চুঙ্গিওলা শুধালে, ওই টিনটার ভেতর কী?

- সুইটস।

- ওটা খুলুন।

- সে কী করে হয়? ওটা আমি নিয়ে যাব লন্ডনে। খুললে বরবাদ হয়ে যাবে যে! চুঙ্গিওলা যেভাবে ঝান্ডুদার দিকে তাকালেন তাতে যা টিন খোলার হুকুম হল, পাঁচশ ঢেঁটরা পিটিয়ে কোনো বাদশাও ওরকম হুকুমজারি করতে পারতেন না।

ঝান্ডুদা মরিয়া হয়ে কাতর নয়নে বললেন, 'ব্রাদার, এ টিনটা আমি নিয়ে যাচ্ছি আমার এক বন্ধুর মেয়ের জন্য লন্ডনে, এটা খুললে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

এবার চুঙ্গিওলা যেভাবে তাকালে, তাতে আমি হাজার ট্যাঁটরার শব্দ শুনতে পেলুম।

বিরাট-লাশ ঝান্ডুদা পিঁপড়ের মতো নয়ন করে সকাতরে বললেন, 'তাহলে ওটা ডাকে করে লন্ডন পাঠিয়ে দাও, আমি ওটাকে সেখানেই খালাস করব।'

কিন্তু আশ্চর্য, চুঙ্গিওলা তাতেও রাজি হয় না। আমরা সবাই কসাইটাকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, ঝান্ডুদার প্রস্তাবটি অতিশয় সমীচীন এবং আইনসঙ্গতও বটে। চুঙ্গিওলার ভাবখানা সে পৃথিবীর কোনো ভাষাই বোঝে না।

ঝান্ডুদা তখন চটেছেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'তবে খুলছি। কিন্তু ব্যাটা তোমাকে না খাইয়ে ছাড়ছি নে।'

তারপর ইংরেজিতে বললেন, 'কিন্তু তোমাকে ওটা নিজে খেয়ে পরখ করে দেখতে হবে।' ওটা সত্যি সুইটিস কিনা।

শয়তানটা চট করে কাউন্টারের নিচ থেকে টিন-কাটার বের করে দিল। ঝান্ডুদা টিন-কাটার হাতে নিয়ে ফের চুঙ্গিওলাকে বললেন, 'তোমাকে কিন্তু ওই মিষ্টি পরখ করতে হবে নিজে, আবার বলছি।'

চুঙ্গিওলা একটু শুকনো হাসি হাসল। শীতে বেজায় ঠোঁট ফাটলে আমরা যেরকম হেসে থাকি।

ঝান্ডুদা টিন কাটলেন।

কী আর বেরুবে? বেরুল রসগোল্লা। কাঁটাচামচের তোয়াক্কা না করে রসগোল্লা হাত দিয়ে তুলে প্রথমেই বিতরণ করলেন বাঙালিদের। তারপর যাবতীয় ভারতীয়দের, তারপর সবাইকে অর্থাৎ ফরাসি, জার্মান, ইতালীয়, এবং স্পাইনিয়ার্ডদের।

তামাম চুঙ্গিঘর তখন রসগোল্লা গিলছে। আকাশে বাতাসে রসগোল্লা। চুঙ্গিঘরের পুলিশ বরকন্দাজ চাপরাশি সকলেরই হাতে রসগোল্লা।

ওদিকে দেখি, ঝান্ডুদা আপন ভুঁড়িটি কাউন্টারের ওপর চেপে ধরে চুঙ্গিওলার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলছেন বাংলাতে 'একটা খেয়ে দেখ।' হাতে তার একটি সরেস রসগোল্লা।

চুঙ্গিওলা ঘাড়টা একটু পেছনের দিকে হটিয়ে গম্ভীর রূপ ধারণ করেছে। ঝান্ডুদা নাছোড়বান্দা। সামনের দিকে আর একটু এগিয়ে বললেন, 'দেখছ তো, সবাই খাচ্ছে। চেখে দেখ, এ বস্তু কী!'

চুঙ্গিওলা ঘাড়টা আরও পিছিয়ে নিল। লোকটা অতি পাষণ্ড। একবারের তরে 'সরি-টরি'ও বলল না।

হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, ঝান্ডুদা তামাম ভুঁড়িখানা কাউন্টারের ওপর চেপে ধরে ক্যাঁক করে পাকড়ালেন চুঙ্গিওলার কলার বাঁ হাতে, আর ডান হাতে থেবড়ে দিলেন একটা রসগোল্লা ওর নাকের ওপর। আর সঙ্গে সঙ্গে মোটা গলায় বললেন, 'তুমি খাবে না? তোমার গুষ্টি খাবে। ব্যাটা, তুমি মস্করা পেয়েছ? পইপই করে বললুম, রসগোল্লাগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, তা তুমি শুনবে না!'

ততক্ষণে কিন্তু তাবৎ চুঙ্গিঘরে লেগে গেছে ধুন্ধুমার। আর চিৎকার চেঁচামেচি হবেই না কেন? এ যে রীতিমতো বেআইনী কর্ম। কর্মটির জন্য আকছারই জেলে যেতে হয়।

ঝান্ডুদার কোমর জাবড়ে ধরে আমরা জনাপাঁচেক তাকে কাউন্টার থেকে টেনে নামাবার চেষ্টা করছি। তিনি পর্দার পর পর্দা চড়াচ্ছেন, 'খাবিনি, ও পরান আমার, খাবিনি ব্যাটা।' চুঙ্গিওলা ক্ষীণকণ্ঠে পুলিশকে ডাকছে। কিন্তু কোথায় পুলিশ? চুঙ্গিঘরের পাইক, বরকন্দাজ, ডাণ্ডাবরদার, আসসরদার বেবাক চাকর-নফর বিলকুল বেমালুম গায়েব। এ কি ভানুমতী, এ কি ইন্দ্রজাল!

ইতোমধ্যে ঝান্ডুদাকে বহুকষ্টে কাউন্টারের এদিকে নামানো হয়েছে। চুঙ্গিওলা রুমাল দিয়ে রসগোল্লার থ্যাবড়া মুছতে যাচ্ছে দেখে তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'ওটা মুছিসনি, আদালতে সাক্ষী দেবে।'

কে একজন ঝান্ডুদাকে সদুপদেশ দিল, পুলিশ ফের এসে যাবে। ততক্ষণে আপনি কেটে পড়ুন।'

তিনি বললেন, 'না, ওই যে লোকটা ফোন করছে। আসুক না ওদের বড়কর্তা।'

তিন মিনিটের ভেতর বড়কর্তা ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন। ঝান্ডুদা বড় সাহেবের সামনে গিয়ে বললেন, 'সিন্নোর, বিফো ইউ প্রসিড, অর্থাৎ কিনা ময়না তদন্ত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে আপনি একটি সুইটস চেখে দেখুন।' বলে নিজে মুখে তুললেন একটি, আমাদের সবাইকে আরেক প্রস্থ বিতরণ করলেন। বড়কর্তা একটি মুখে তুলেই চোখ বন্ধ করে রইলেন আড়াই মিনিট। চোখ বন্ধ অবস্থায়ই আবার হাত বাড়িয়ে দিলেন। ফের আবার।

টিন তখন ভোঁ ভোঁ।

চুঙ্গিওলা তাঁর ফরিয়াদ জানাল।

কর্তা বললেন, 'টিন খুলেছ তো বেশ করেছ, না হলে খাওয়া যেত কী করে?' আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কী করতে? আরও রসগোল্লা নিয়ে আসুন।' আমরা সুড়সুড় করে বেরিয়ে যাবার সময় শুনতে পেলুম। বড়কর্তা চুঙ্গিওলাকে বলছেন, 'তুমিও তো একটা আস্ত গাড়ল। টিন খুললে আর এই সরেস মাল চেখে দেখলে না?'

আমি গাইলুম,

রসের গোলক, এত রস কেন তুমি ধরেছিলে হায়।

ইতালির দেশ ধর্ম ভুলিয়া লুটাইল তব পায়।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'রসগোল্লা' একটি রম্যরচনা। এর মূল নাম চুঙ্গিঘর অর্থাৎ Custom House। সৈয়দ মুজতবা আলীর 'ধূপছায়া' গ্রন্থ থেকে রচনাটি সংকলিত হয়েছে।

মূলবক্তব্য

লেখক রসগোল্লার গুণের কথা বলতে গিয়ে একটি অভিনব ঘটনার অবতারণা করেছেন। রসগোল্লা যে কেবল এ দেশবাসীর মন ভুলিয়েছে তা নয়, পরখ করবার সুযোগ পেলে বিদেশিরাও এর রসে মজতে পারে।

শব্দার্থ ও টীকা।

বদখত - কদাকার, বিশ্রী। **বরবাদ** - বাতিল, নষ্ট। **সমীচীন** - যথার্থ, সংগত। **কাউন্টার (Counter)** - অফিস, ব্যাংক স্টেশন প্রভৃতিতে অর্থ ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র আদানপ্রদানের জন্য নির্দিষ্ট খোপ বা টেবিল। **টিন-কাটার (Tin-cutter)** - টিন কাটার যন্ত্র। **ফের** - আবার। **বিতরণ** - বণ্টন। **তামাম** - সব। **বরকন্দাজ** - বন্দুকধারী সেপাই। **চাপরাশি** - পেয়াদা, আর্দালি। **সরেস** - উত্তম, ভালো। **মস্করা** - ঠাট্টা, পরিহাস। **আকছার** - প্রায়ই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে। **ডাণ্ডাবরদার** - ডাণ্ডাওয়ালা। **বিলকুল** - সম্পূর্ণ। **বেমালুম** - যা জানা যায় না। **গায়েব** - গুপ্ত, অদৃশ্য। **ইন্দ্রজাল** - জাদু। **গাড়ল** - বোকা, যে পরের বুদ্ধিতে চলে। **ধুন্ধুমার** - তুমুল গোলমাল। **চুঙ্গিঘর** - শুল্কঘর (Custom House), যেখানে আমদানি ও রফতানি করা দ্রব্যের ওপর শুল্ক আদায় করা হয়। **ভ্যাকুয়াম প্যাকড মিষ্টান্ন** - বায়ুশূন্য টিনজাত মিষ্টান্ন। এ ধরনের পাত্রে খাবার পচন থেকে রক্ষা পায়। **ভানুমতী** - ভোজরাজের কন্যা, ইন্দ্রজালনিপুণা বিক্রমাদিত্যের সহধর্মিণী। **সিন্নোর (ইতালির শব্দ)** - ভদ্রলোকদের সম্বোধন করবার জন্য ব্যবহৃত শব্দ (মিস্টার, জনাব ইত্যাদির মতো)। **আসসরদার** - সরদার অর্থে রসিকতা করে আসসরদার বলা হয়েছে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১, ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

'রসগোল্লা' গল্পের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি, রসগোল্লাকে কেন্দ্র করে একটি অপ্রীতিকর অথচ রসময় ঘটনার অবতারণা হয়েছিল। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ঝান্ডুদার তিনটি উক্তি নিম্নরূপ –

ক. ব্রাদার, এ টিনটা আমি নিয়ে যাচ্ছি আমার এক বন্ধুর মেয়ের জন্য লন্ডনে

খ. তুমি খাবে না? তোমার গুষ্টি খাবে

গ. আসুক না ওদের বড়কর্তা

১. উপরি-উক্ত তিনটি উক্তিতে ঝান্ডুদার চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে?

ক. জেদ ও ক্রোধ খ. বিনয় ও নম্রতা

গ. বিনয় ও ধৈর্য ঘ. জেদ ও বিনয়

২. 'রসগোল্লা' গল্পের অপ্রীতিকর ঘটনা কোনটি?
   ক. রসগোল্লা নিয়ে ঝান্ডুদার অপদস্থ হওয়া
   খ. চুঙ্গিওলার নাকের ওপর রসগোল্লা লেপ্টে দেওয়া
   গ. ভীড় ঠেলে পুলিশের বড়কর্তার আগমন
   ঘ. মুখে রসগোল্লা পুরে বড়কর্তার চোখ বন্ধ করে থাকা

৩. 'শুল্ক ঘরের আইন' কখন মেনে চলতে হয়?
   i. বিদেশে প্রবেশের সময়
   ii. বিদেশ থেকে বহির্গমনের সময়
   iii. আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক.	i ও ii	খ.	i ও iii
গ.	ii ও iii	ঘ.	iii

৪. 'রসগোল্লা' একটি:

ক.	রূপক গল্প	খ.	রম্যরচনা
গ.	ভ্রমণকাহিনী	ঘ.	আত্মকাহিনী

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অংশটুকু পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র বা আন্তর্জাতিক কোনো ঘটনা যখন রসবোধ্যতার মাধ্যমে গল্পে উপস্থাপন করা হয় তখন তাকে রম্যরচনা বলে। রম্যরচনায় হাস্যরসে ভরা কৌতুকপ্রদ ঘটনা গল্পে রূপদান করা হয়। বাংলা সাহিত্যের সুরসিক এক লেখকের রম্যরচনায় কৌতুকটি ফুটে উঠেছে এভাবে :

> "রসের গোলক, এত রস কেন তুমি ধরেছিলে হায়।
> ইতালির দেশ ধর্ম ভুলিয়া লুটাইল তব পায়।"

ক. অনুচ্ছেদের কবিতাংশটিতে 'তব পায়' বলতে কার পা বোঝানো হয়েছে?

খ. অনুচ্ছেদটির আলোকে রম্য রচনার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত কর।

গ. 'রম্যরচনায় হাস্য রসে ভরা কৌতুকপ্রদ ঘটনা গল্পে রূপদান করা হয়।'– উক্তিটি তোমার পঠিত রম্যরচনার ক্ষেত্রে কীভাবে প্রযোজ্য? – যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

ঘ. অনুচ্ছেদের কবিতাংশটিকে যে যে বৈশিষ্ট্যের আলোকে রম্যরচনা বলা যায় তার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

পারী

অন্নদাশঙ্কর রায়

*[**লেখক পরিচিতি :** অন্নদাশঙ্কর রায় ১৯০৪ সালের ১৫ই মার্চ ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের ঢেঙ্কানাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৫ সালে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯২৬ সালে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান লাভ করে প্রশিক্ষণের জন্য বিলাত যান। ইউরোপের জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার পরিচয় তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণ কাহিনী 'পথে প্রবাসে' গ্রন্থে রয়েছে। অন্নদাশঙ্করের রায়ের লেখা মননধর্মী। তাঁর রচনায় জীবনের সঙ্গে শিল্পের, বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়সত্তার ও ব্যক্তিমানুষের সঙ্গে বিশ্বমানবের সমন্বয় ঘটেছে। তিনি একজন বিখ্যাত ছড়াকারও। অন্নদাশঙ্কর রায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতের সরকারি শাসন বিভাগে চাকরি করেছেন এবং ভারতের স্বাধীনতার পর অবসরগ্রহণ করেন। অসংখ্য গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : পথে প্রবাসে, জাপানে, আগুন নিয়ে খেলা, সত্যাসত্য, রত্ন ও শ্রীমতি, ক্রান্তদর্শী, জীবন শিল্পী রবীন্দ্রনাথ, বিনুর বই, উড়কি ধানের মুড়কি, রাঙা ধানের খৈ প্রভৃতি। অন্নদাশঙ্কর রায় ২০০২ সালের ২৯শে অক্টোবর কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।]*

ফরাসিদের পারী নগরীর নামে পৃথিবীসুন্ধ লোক মায়াপুরীর স্বপ্ন দেখে। আরব্য রজনীর বাগদাদ আর কথাসাহিত্যের পারী উভয়ের সম্বন্ধে বলা চলে, 'অর্ধেক নগরী তুমি অর্ধেক কল্পনা'। পৃথিবীর ইতিহাসে পারীর তুলনা নেই। দুই হাজার বৎসর তার বয়স তবু চুল তার পাকল না। কতবার তাকে কেন্দ্র করে দিগ্বিজয়ী সাম্রাজ্য বিস্তৃত হল, কতবার তার পথে পথে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার রক্তগঙ্গা ছুটল, কত ত্যাগী ও কত ভোগী, কত জ্ঞানী ও কত কর্মী, কত রসজ্ঞ, কত দুঃসাহসী বিপ্লবে ও সৃষ্টিতে, স্বাধীনতায় ও প্রেমে তাকে অমর মানবের অমরাবতী করলেন। সাহিত্যে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে, নাট্যকলায়, সুগন্ধিশিল্পে, পরিচ্ছদকলায়, স্থাপত্য ও বাস্তুকলায় সে সভ্যজগতের শীর্ষে উঠল। পারীই তো আধুনিক সভ্যতার সত্যিকারের রাজধানী, অগ্রসরদের তপস্যাস্থল, অনুসারকদের তীর্থ। এর একটি দ্বার প্রতি দেশের কাঞ্চনবানদের জন্য খোলা, অন্য দ্বারটি প্রতিদেশের নিঃসম্বল শিল্পী, ভাবুক বিদ্যার্থীদের জন্য মুক্ত। একদিক থেকে দেখতে পারী রূপপোজীবিনী, অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে পারী অন্নপূর্ণা, সর্বদেশের পলাতকদের আশ্রয়দাত্রী, তার জাতিবিদ্বেষ নেই, সে পোল, রুশ, রুমানিয়াকেও শ্রমের বিনিময়ে অন্ন দেয়, নিগ্রোকেও শ্বেতসেনার নায়ক করে এবং নানা দেশের যে অসংখ্য বিদ্যার্থীতে তার প্রাঙ্গণ ভরে গেছে তাদের কত বিদ্যার্থীকে সে বিদ্যার সঙ্গে জীবিকাও যোগায়।

পৃথিবীর অন্য কোনো নগর দেখতে পৃথিবীর এত দেশের এত ট্যুরিস্ট আসে না। পারী দেখতে প্রতি বৎসর যে কয় লক্ষ বিদেশি আসে, তাদের পনের আনা আমেরিকান ও ইংরেজ। আমেরিকানদের চোখে পারীই হচ্ছে ইউরোপের রাজধানী, আর ইউরোপের চোখে পারী হচ্ছে লন্ডন, ভিয়েনা, বার্লিন, মস্কোর চেয়েও আন্তর্জাতিক। আয়তন ও লোকসংখ্যায় পারী লন্ডনের প্রায় অর্ধেক।

পারীতে ট্রাম মেট্রো বাস ট্যাক্সি ধোঁয়া কাদা বস্তি ব্যারাক লন্ডনের মতো সমস্তই আছে, কিন্তু মোটরগাড়ি কিছু বেশি সংখ্যক, বাড়িগুলো কিছু স্বাধীন গড়নের, কাদাটা কিছু গভীর ও গাঢ়। মোটের ওপর পারী লন্ডনের মতো ফিটফাট নয়, বেশ একটু নোংরা এবং অনেক বেশি গরিব। উঁচুদরের বাস্তুকলা আর কয়েকটি প্রাসাদসৌধ থাকলেও লন্ডনের সৌষ্ঠব তার অধিকাংশ বাড়ির নেই। ঐতিহাসিক প্রাসাদসৌধের ছবি দেখে পারীকে যা ভাবি সর্বসাধারণের বাসগৃহ দেখলে সে কল্পনা ছুটে যায়। কিন্তু পারীর আসল সৌন্দর্য তার প্রশস্ত সরল রাজপথগুলো, তার বৃহৎ চতুষ্কোণ প্লাসাগুলো, তার সপ্তসেতুবেষ্টিত সর্পিণী নদীটি, সর্পিণীর দুই রসনার মতো যেন সিন নদীর দুটি অর্ধেক মধ্যবর্তী দ্বীপটি এবং নগরীর দুই উপান্তে প্রমোদোদ্যান দুটি। পারীতে লন্ডনের মতো পার্ক বিরল ; তবে তার একটি রাজপথ এক একটি সরলরেখাকৃতি পার্ক বিশেষ।

পারীর নিতান্ত মাঝারি রাজপথগুলো সেন্ট্রাল এভিনিউর চেয়ে চওড়া। সাঁজেলিসীর একপাশ থেকে আর এক পাশ দেখা যায় না, পাশাপাশি দশটা চৌরঙ্গীর মতো। সে তো একটি রাজপথ নয়, এক সঙ্গে অনেকগুলো রাজপথ, রাজপথের মাঝখানে এক সারি বাগান, রাজপথের ওপরে এক একটা দোকান বা প্রাসাদ বা থিয়েটার। এক একটা বুলভার্দ এক একটা বিরাট ব্যাপার, যেমন দীর্ঘ তেমন প্রস্থ। অধিকাংশ রাস্তার সম্বন্ধে একথা খাটে যে, একটি রাস্তা মানে একটি

রাস্তা নয়, সমান্তরাল দুটি তিনটি রাস্তা, কোনো কোনো স্থলে পাঁচটি রাস্তা। অর্থাৎ প্রতি রাস্তার অনেকগুলো করে ভাগ আছে, যেমন ইন্দ্রধনুর সাতটি ভাগ। প্রথম ফুটপাতের পর রাস্তা, রাস্তার পরে গাছের সারি, গাছের সারির পরে ঘোড়দৌড়ের রাস্তা, সে রাস্তার পরে গাছের সারি ও বসবার বেঞ্চ, তারপরে আবার ঘোড়দৌড়ের রাস্তা, তারপর আবার গাছের পার্টিশন, তারপরে আবার রাস্তা, তারপরে আবার ফুটপাত। সব রাস্তার অবশ্য একই রকম ভাগ নয়, তবে অধিকাংশ রাস্তাই অসাধারণ চওড়া আর অনেক রাস্তার ফুটপাতের ওপরে স্থলে স্থলে ছোট ছোট দোকান আছে। এক একটা ফুটপাত রাস্তার মতো চওড়া, স্থলে স্থলে এসব দ্বীপের মতো দোকান, অধিকাংশ ছেলেমেয়েদের খেলনার বা মেয়েদের এটা-ওটার দোকান। ঠিক আমাদের দেশের মতো সেসব দোকানে ভিড় জমেছে, দরদস্তুর চলেছে, হইচই হট্টগোল।

আমাদের সঙ্গে ফরাসি, ইতালিয়ান প্রভৃতি দক্ষিণ ইউরোপীয়দের প্রকৃতিগত মিল আছে। এরাও খুব গোলমাল ভালোবাসে, অতিরিক্ত রকম বাচাল, আর বাদশাহী কুঁড়ে। কুঁড়ে বললে বোধ হয় ঠিক হবে না, বরং বিশ্রামপ্রিয়। সময়ের দাম এরা ইংরেজ আমেরিকানদের মতো বোঝে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে দেয়। তা বলে এরা কম খাটে না। পারীর যারা আসল অধিবাসী, খুব খাটতে পারে বলে তাদের সুনাম আছে। মেয়েরা গল্প করার সময়ও জামা সেলাই করছে, শৌখিন জামা। জামা-কাপড়ের শখটা ফরাসিদের অসম্ভব রকম বেশি, বিশেষ করে ফরাসি মেয়েদের ও শিশুদের। পুরুষেরা কতকটা বেপরোয়া। তাদের প্রধান সম্পদ জাঁদরেলি গোঁফ, তাদের সেই ব্রহ্মাস্ত্রটিতে শান দেবার দিকে তাদের যত নজর, তত নজর তাদের স্নান-না-করা গাত্রের দিকে নেই। সুগন্ধিশিল্প পারীকে আশ্রয় করবার কারণ হয়তো এই। হাঁ, পারীর লোক খুব খাটতে পারে বটে, খুব ভোরে উঠে খাটতে আরম্ভ করে দেয়, অনেক রাত অবধি খাটে। আহার সম্বন্ধে এদের মোগলাই রুচি, গোপালের মতো যা পায় তা খায় না, রন্ধনশিল্প ইউরোপের কোথাও থাকে যদি তা পারীতে। এত দুনিয়ার সব দেশের খানার এরা সমঝদার, সেই জন্য যে কোনো রেস্তোরাঁয় সব নেশনের খাদ্যের একটা না একটা নমুনা পাওয়া যাবেই। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, পারীতে অল্প খরচে অনেকখানি তৃপ্তির সাথে খেতে পারা যায়। রান্নাটা উঁচুদরের তো বটেই, রান্নাটা টাট্‌কা। শাকসব্‌জি ও মাংসের জন্য ইংল্যান্ড অন্য দেশের মুখাপেক্ষী, ফ্রান্স তেমন নয়।

পারীতে গলিতে গলিতে একটা নয় দুটা নয় পঞ্চাশটা কাফে। লন্ডনে কাফে নেই, কাফে নামধেয় যা আছে আসলে তা রেস্তোরাঁ। লন্ডনের রেস্তোরাঁর সংখ্যা পারীর তুলনায় আঙুলে গোনা যায়।

এই কাফে জিনিসটি ফরাসি সভ্যতার একটা অঙ্গ। ফ্রান্সের আধুনিক ইতিহাস তার কাফেগুলোতে তৈরি হয়েছে, ইংল্যান্ডের ইতিহাস যেমন তৈরি হয়েছে তার স্কুলগুলোর প্লে-গ্রাউন্ডে। এটা একটা মস্ত জিনিস যে কাফে ভয়ানক সস্তা। দু চার আনা খরচ করে দুঘণ্টা এক স্থানে বসা ও প্রাণ খুলে গল্প করা যায়, লন্ডনে এমন সুযোগ নেই। আমাদের দেশে চায়ের দোকানগুলোতে তর্কসভা বসে- সেগুলোই আমাদের ভাবি যুগের কাফে। তাই থেকে আমাদের ভাবিসাহিত্যিকদের উদ্ভব হবে, ভাবিরাষ্ট্রনেতাদের অভ্যুত্থান ঘটবে। ব্যয়সাধ্য ক্লাব যে আমাদের মাটিতে শেকড় গেড়ে আমাদের বট অশ্বত্থের মতো দীর্ঘজীবী হবে এমন মনে হয় না। এই চায়ের আড্ডাগুলোর সঙ্গে একটা করে পাঠাগার জুড়ে দিলে ওগুলোই হবে জনসাধারণের বিশ্রাম, আমোদ ও শিক্ষার স্থান।

কাফের মতো পাতিসেরিগুলোতেও আড্ডা বসে। পাতিসেরি মানে কেক রুটির দোকান, ওখানে গিয়ে কেক কিনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে পারা যায়। অনেক পাতিসেরিতে চা-কফি খাবার জন্য একটু ঠাঁই করে দেওয়া হয়, সেই সুযোগে গল্প জমে, তর্ক ওঠে, আলাপ-পরিচয় হয়, দেশের মানুষেরা দেশের মানুষকে চিনতে চিনতে দেশকে চেনে, বিদেশের মানুষকে চিনতে চিনতে বিদেশকে চেনে। ফরাসিরা ইংরেজদের মতো নীরব প্রকৃতির নয়, গম্ভীর প্রকৃতির নয়, ওরা ভদ্রতার খাতিরে আবহাওয়া সম্বন্ধে দু একটা তুচ্ছ প্রশ্ন করে চুপ করে না, ওরা বকে আর বকায়।

ফরাসিদের জাতীয় সম্পদ তাদের মিউজিয়ামগুলো। জগৎ প্রসিদ্ধ লুভর ছাড়া লুকশাবুর্গ, ত্রোকাদেরো, গিমে ইত্যাদি আরও ডজনখানেক ছোট বড় মিউজিয়াম আছে পারীতে। লুভরের ঐশ্বর্যের তুলনাই হয় না। তার আকার এত বড় যে, একটা জাদুঘর নয় একটা জাদুপাড়া, সমস্তটি একবার চোখ বুলিয়ে দেখতে দু দিন লেগে যায়। Venus de Milo-কে একটা স্বতন্ত্র ঘর দেওয়া হয়েছে, সে ঘরে তার বন্ধুদের জন্য চমৎকার বসবার বন্দোবস্ত রয়েছে, সেসব আসনে

বসে যে-কোনো কোণ থেকে তাকে নিরক্ষীণ করতে পারা যায়। বলা বাহুল্য, যেদিক থেকেই দেখি না কেন সবদিক থেকেই সে সমান সুদর্শনা। তাজমহলকে যেমন বারবার নানা আলোকে দেখেও চির অপূর্ব মনে হয়, গ্রিক ভাস্করের এই মানসী মূর্তিটিকেও তেমনি।

লুভর মিউজিয়ামে 'মোনালিসা' (লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চিকৃত)-কেও দেখলাম। তার সেই রহস্যময় হাসি মানুষের পিছু নেয়, তাকে ভোলবার সাধ্য নেই, ইচ্ছা করলেও, চেষ্টা করলেও ভুলতে পারিনে। লুভরে কিছু না হোক লাখখানেক ছবি আছেই, পৃথিবীর সেরা শিল্পীদের আঁকা।

ফরাসিরা এসব ছবি মূর্তি নানা উপায়ে সংগ্রহ করেছে, সব উপায় সাধুও নয়। এদের অনেকগুলো যুদ্ধলব্ধ। রাজ্য জয় করে অনেক বিজেতা অনেক রত্নই হরণ করে, কিন্তু ফরাসিরা হরণ করেছে শিল্পসম্ভার। ফরাসিদের হারিয়ে দিয়ে বিসমার্ক অনেক কোটি স্বর্ণমুদ্রা আদায় করেছিলেন, সে সোনা এতদিনে ধুলো হয়ে গেছে। কোন জাতি কোন জিনিসকে বেশি দাম দেয় তাই নিয়েই তার ইতিহাস।

ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ মিউজিয়াম প্রভৃতি জাতীয় সম্পদ দেখে যা মনে হয়েছিল, ফ্রান্সের লুভর, ত্রোকাদেরো প্রভৃতি জাতীয় সম্পদ দেখে তাই মনে হল। ভাবলুম, ইংল্যান্ড-ফ্রান্সে জন্ম নিলে আত্মিক সুবিধা আছে, বাল্যকাল থেকেই মিউজিয়াম দেখতে দেখতে মানুষ হব। চোখ পাকবে কিন্তু মন পাকবে না, প্রতিদিন একটু একটু করে বড় হব, কিন্তু বুড়ো হব না। আমার প্রাচীন দেশের পরিপক্ব শিক্ষাকে আমার চিরতরুণ অন্তরে ধারণ করব এবং প্রতি দেশের নিজস্ব শিক্ষাকে আমার নিজস্ব শিক্ষার মধ্যে গ্রহণ করব।

ফরাসি জাতিটা হচ্ছে যাকে বলে কসমোপলিটান। এর মানে এ নয় যে বিশ্বপ্রেমিক, এর মানে ওরা বিশ্বচেতন। প্রমাণ ওদের পথঘাটের নামগুলো। পৃথিবীর সব দেশের ইতিহাস ও সব দেশের ভূগোল পড়বার যাদের সময় নেই তাঁরা কেবল পারীর মানচিত্রখানার উপরে চোখ বুলিয়ে যান, দেখবেন রাস্তার নাম Moscou, Tokio, Constantinople ইত্যাদি ও President Wilson, Edward VII, Garibaldi ইত্যাদি। রেলস্টেশনের নাম George V, St. Francis Xavier, Michel-Angelo ইত্যাদি। এ ছাড়া স্বদেশের মহাপুরুষ মাত্রেরই ও স্বদেশের প্রতি অংশের নাম পারীর সর্বাঙ্গে ছাপা। ফ্রান্সের লোকদের দেশাত্মজ্ঞান অমনি করেই হয় বলে তাদের দেশাত্মবোধ আপনা আপনিই জন্মায়। শৈশব থেকেই তারা পথ চলতে চেনে তাদের জাতীয় পূর্ব পুরুষদের নিয়ে, যাদের নিয়ে তাদের ইতিহাস লেখা হয়েছে। আর দেশের প্রতি জেলার প্রতি পর্বতের নাম-যাঁদের কোলে তাদের অখণ্ড জাতি লালিত হয়েছে। স্বদেশকে চেনে বলেই তারা বিশ্বকেও চিনতে পারে।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'পারী' একটি ভ্রমণকাহিনী। লেখকের 'পথে প্রবাসে' নামক গ্রন্থ থেকে এটি গৃহীত।

মূলবক্তব্য

আধুনিক সভ্যতার পীঠস্থান ফ্রান্সের রাজধানী পারী (প্যারিস)। সাহিত্য, শিল্পকলা ও সুগন্ধি শিল্পে তার স্থান সভ্যজগতের শীর্ষে। রূপসী পারীর অন্যতম আকর্ষণ তার প্রশস্ত রাজপথগুলো। পারীর অধিবাসীরা খুবই পরিশ্রমী, এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের কোনো ভেদ নেই। সমগ্র ইউরোপে রন্ধন শিল্পে পারীর স্থান সবার ওপরে। এখানকার মিউজিয়ামগুলো ফরাসিদের জাতীয় সম্পদ। এসব মিউজিয়ামে সংগৃহীত শিল্পসম্ভার বিশ্ববাসীর বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

শব্দার্থ ও টীকা

মায়াপুরী -রূপকথার কল্পিত প্রাসাদ। **অমরাবতী**-স্বর্গ। **স্থাপত্য** - স্থপতির কর্ম। **স্থপতি** - বাস্তুকলাবিদ। **বাস্তুকলা** - গৃহনির্মাণ শিল্প। **কাঞ্চনবান**- ধনবান। **তীর্থ**-পুণ্যস্থান। **অন্নপূর্ণা** - অন্ন দান করেন যিনি, দুর্গা। **রূপোপজীবিনী** - রূপ যে রমণীর জীবিকা। **বিদ্যার্থী** - ছাত্র। **ট্যুরিস্ট** (Tourist)- পর্যটক। **আন্তর্জাতিক** - সর্বজাতিক। **ট্রাম** (Tram)- বিদ্যুৎচালিত এক প্রকার গাড়ি, যা শহরের রাস্তায় লাইনের ওপর দিয়ে চলে। **মেট্রো** - ভূগর্ভস্থ রেলগাড়ি। **সৌধ** - দালান, প্রাসাদ। **সৌষ্ঠব** - সুগঠন। **প্লাসা** (Plaza)- নগর চত্বর। **প্রমোদোদ্যান**- আমোদ বা বিলাস করার বাগান। **পার্ক** (Park)- উদ্যান। **বুলভার্দ** (Boule Vard)- নগরবীথিকা, বৃক্ষশ্রেণী শোভিত প্রশস্ত রাস্তা। **ইন্দ্রধনু** -রংধনু। **পার্টিশন** (Partition)- বিভাগ, সীমানা দেয়াল। **বেপরোয়া** - নির্ভয়, যে পরোয়া করে না। **ব্রহ্মাস্ত্র** - ব্রহ্মতেজময় অস্ত্র, অব্যর্থ অস্ত্র। **জাঁদরেল** (General)- সেনাপতি, ব্যঙ্গার্থে জমকালোভঙ্গি বিশিষ্ট লোক। **মোগলাই রুচি** - ভোজনবিলাসী মোগল বাদশাহের মতো অভিজাত রুচি। **নেশন** (Nation)- জাতি। **পাতিসেরি**- কেক-রুটির দোকান, কনফেকশনারি। **কসমোপলিটন** (Cosmopolitan)- বিশ্বজনীন, জাতীয় সংস্কারমুক্ত। **আরব্যরজনী** - এখানে আরব্য উপন্যাস বোঝানো হয়েছে। **বাগদাদ**- একটি প্রাচীন নগরী, বর্তমানে ইরাকের রাজধানী।

'অর্ধেক নগরী তুমি অর্ধেক কল্পনা'- রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার শেষ লাইন 'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা'র অনুসরণে পারীর সৌন্দর্য বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ পারী নগরীর অধিবাসীর সৌন্দর্য বাহ্যত অর্ধেক দেখা যায়, কিন্তু বাকিটা উপলব্ধির ব্যাপার।

লন্ডন, ভিয়েনা, বার্লিন, মস্কো - যথাক্রমে ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, জার্মানি ও রাশিয়ার রাজধানী।

সপ্তসেতুবেষ্টিত সর্পিণী নদী - সাতটি সেতু সংযুক্ত সাপের মতো আঁকাবাঁকা সিন নদীকে বোঝানো হয়েছে।

ভেনাস দ্য মিলো - জগদ্বিখ্যাত ভাস্কর্য মূর্তি।

মোনালিসা - ইতালির শিল্পী লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি অঙ্কিত জগৎবিখ্যাত চিত্র।

তাজমহল - মোগল সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক তাঁর পত্নী মমতাজ মহলের কবরের ওপর মর্মর প্রস্তরে নির্মিত বিশ্ববিখ্যাত স্মৃতিসৌধ।

বিসমার্ক (১৮১৫-১৮৯৮) - ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রুশীয় প্রধানমন্ত্রী ; তাঁর নেতৃত্বে জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় এবং তিনি জার্মানির প্রথম চ্যান্সেলর ছিলেন।

লুভর (Louvre) - প্যারিসে অবস্থিত বিশ্ববিখ্যাত মিউজিয়াম(জাদুঘর)। এখানে প্রখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চির বিশ্ববিখ্যাত 'মোনালিসা' ছবিটি সংরক্ষিত আছে।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম - লন্ডন শহরে অবস্থিত সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পকীর্তির বিশ্ববিখ্যাত সংগ্রহশালা। এ মিউজিয়াম ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কনস্টান্টিনোপল - তদানীন্তন বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের (বর্তমান তুরস্ক) রাজধানী।

প্রেসিডেন্ট উইলসন - আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট।

সপ্তম এডওয়ার্ড - ইংল্যান্ডের তৎকালীন রাজা, বর্তমান রানী এলিজাবেথের চতুর্থ ঊর্ধ্বতন পিতামহ।

গ্যারিব্যাল্ডি (১৮০৭-১৮৮২) - ইতালির বিখ্যাত সৈনিক ও দেশপ্রেমিক। ইতালির স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন।

পঞ্চম জর্জ - সপ্তম এডওয়ার্ডের পুত্র, বর্তমান রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের পিতামহ।

ফ্রান্সিস জেভিয়ার (১৫০২-১৫৫২) - বিখ্যাত ফরাসি ধর্মযাজক ও সন্ত।

মাইকেল এঞ্জেলো (১৪৭৪-১৫৬৩)- প্রখ্যাত ইতালীয় চিত্রকর, ভাস্কর ও স্থাপত্যশিল্পী।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘কাদাটা কিছু গভীর ও গাঢ়’ পারীর কোন বিষয়টির ক্ষেত্রে লেখক এ মন্তব্যটি করেছেন?
   ক. রাজপথ খ. ফুটপাথ
   গ. বাড়িঘর ঘ. অলি-গলি

২. সময় সচেতনতার প্রশ্নে কোন দুটি জাতির মধ্যে মিল লক্ষ করা যায়?
   ক. ফরাসি ও ইংরেজ
   খ. ইতালি ও আমেরিকা
   গ. ইতালি ও ইংরেজ
   ঘ. ফরাসি ও বাঙালি

৩. ফরাসি জাতির বিস্তৃত সভ্যতার মধ্যে কোন আচরণটি নিন্দনীয়?
   ক. ব্রহ্মাস্ত্র শান দেওয়া
   খ. বাস্তুকলার অসৌন্দর্য
   গ. রাস্তাঘাটের দৈর্ঘ্য
   ঘ. শিল্পসম্ভার হরণ করা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অংশটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
   ‘পারী’ অন্নদাশঙ্কর রায় রচিত একটি ভ্রমণকাহিনী। ‘পারী’ ভ্রমণ করে মুগ্ধ লেখক ফ্রান্সের এই রাজধানীকে আধুনিক সভ্যতার পীঠস্থান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। লেখকের মতে পারী সাহিত্য, শিল্পকলা ও সুগন্ধি শিল্পে সভ্যতার শীর্ষে। এখানকার দালানকোঠা, রাস্তাঘাট, দোকানপাঠ সবই তাঁকে মুগ্ধ করেছে। এখানকার মানুষগুলো একদিকে যেমন অত্যন্ত পরিশ্রমী, অন্যদিকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ এবং বিশ্বসচেতনতায় উদার।
   ক. ‘পারী’র পূর্ণ নাম কী?
   খ. ‘পারী আধুনিক সভ্যতার পীঠস্থান’ – আলোচনা কর।
   গ. পরিশ্রম, জাতীয়তাবোধ ও বিশ্ব সচেতনতায় পারী (ফ্রান্স) ও বাংলাদেশের মধ্যকার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের একটি লেখচিত্র অঙ্কন কর।
   ঘ. উদ্ধৃতাংশে আধুনিক সভ্যতার যে মাপকাঠি তুলে ধরা হয়েছে তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

ধ্বনির ব্যবহার
মুহম্মদ আবদুল হাই

[লেখক পরিচিতি : মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯১৯ সালের ২৬ শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার মরিচা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪১ ও ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা সাহিত্য বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে যথাক্রমে বি.এ. অনার্স ও এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃত বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫২ সালে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৫৪ সালে বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। মুহম্মদ আবদুল হাই ধ্বনিবিজ্ঞানী, সাহিত্য সমালোচক ও গবেষক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ছিলেন উপমহাদেশের অন্যতম ভাষাতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতত্ত্ববিদ। ১৯৫৭ সালে তাঁর সম্পাদনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষণা পত্রিকা 'সাহিত্য পত্রিকা' প্রকাশ শুরু হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ : সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ), বিলাতে সাড়ে সাতশ দিন, তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা, ভাষা ও সাহিত্য, ধ্বনিবিজ্ঞান ও বংলা ধ্বনিতত্ত্ব প্রভৃতি। ১৯৬৯ সালের ৩রা জুন এক ট্রেন দুর্ঘটনায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।]

ধ্বনির ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে আলোচনা করার আগে সাধারণের অবগতির জন্য ধ্বনিবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলা ভালো মনে করি। প্রশ্ন উঠতে পারে, ধ্বনি তো ধ্বনিই কিংবা কথা তো কথাই, তার আবার বিজ্ঞান কী? সত্যি আমরা এত সহজে ধ্বনি উচ্চারণ করি কিংবা কথা বলি যে এ সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করার কোনো অবকাশ থাকে না। যেমন, আমরা উঠি, হাসি, খেলি, খাই-দাই, আরাম-বিশ্রাম করি, ঠিক তেমনি প্রয়োজনমতো যখন খুশি কথা বলি, শব্দ করি। ধ্বনি উচ্চারণ করার শক্তি আমাদের আয়ত্তে বলে, কী কৌশলে আমরা আমাদের মুখ থেকে ধ্বনি বের করি সে সম্পর্কে ভাববার প্রয়োজন মনে করি না। ছেলেবেলা থেকে এভাবে ধ্বনি উচ্চারণ করে আসছি বলে তার ওপর আমাদের যেন একটা জন্মগত অধিকার রয়ে গেছে। আলাদিনের প্রদীপের মতো এ অধিকার প্রয়োগ করে এর সাহায্যে আমরা কী না করছি।

আমাদের জীবনের অতীত ও বর্তমানের দিকে ফিরে চাইলে কত কথাই আমাদের মনে পড়বে। আমাদের জীবনের ভাঁজে ভাঁজে কত স্মৃতি যে জড়িয়ে আছে, শুধু পিছন ফিরে চাইলেই তা চোখের সামনে ভেসে উঠবে। মানুষ তার ব্যবহারিক জীবন, কি নিছক ব্যক্তিগত জীবন– যে জীবনই যাপন করুক না কেন, তা তাকে করতে হয় কথারই সাহায্যে। আমরা জীবনের যে অভিনয় করেও চলেছি– যাতে করে আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নানাভাবে সৃষ্টি হয়ে উঠেছে– এর পেছনে আছে আমাদের মুখ থেকে ঝরে পড়া কতকগুলো ধ্বনি।

এলোমেলোভাবেও মানুষ ধ্বনি করতে পারে। কিন্তু তা কথা হয়ে ফুটে ওঠে না। তখন তা মানুষের ভাষার ধ্বনি কিংবা বাগধ্বনি নাও হতে পাবে। কিন্তু ধ্বনি কথা হয়ে উঠলে আর তার সাহায্যে জীবনের কোনো না কোনো দিকের কিছু কাজ হলে– অন্যকথায় তার সমাজজীবন রঞ্জিত হয়ে উঠলে বুঝতে হবে একটা নিয়ম শৃঙ্খলার পথ ধরে ধ্বনিগুলো তর তর করে বের হয়ে এসেছে। ঘুরো বাঁকা পথে উল্টোপাল্টাভাবে কিংবা এলোপাতাড়িভাবে বের হয়নি, যার পর যে ধ্বনির আসার কথা ঠিক তেমনি সাজানো অবস্থায় তারা বেরিয়ে গেছে।

যা চিরসত্য এবং একান্ত সহজ তার পরিচয় দেওয়া আবার সহজ নয়। আমি যা বলছি তা এতই স্বাভাবিক যে, এ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন মানুষের মনে কোনো দাগ কাটবে না। কথার শৃঙ্খলাকে কোনোভাবে নষ্ট করতে পারলে তখনই ভালো বোঝা যায় কতখানি নিয়মের শাসন রয়েছে আমাদের কথার মধ্যে। আমাদের মুখের কথা কিংবা গানকে গ্রামোফোন কিংবা টেপরেকর্ডে ধরে রেকর্ডটাকে প্রথম দিক থেকে না বাজিয়ে কোনো কৌশলে যদি শেষের দিক থেকে বাজাতে শুরু করি, তাহলে যেসব ধ্বনি পাব সেগুলো কি ধ্বনি হবে? হলেও তা কি হবে মানুষের কথা, না অন্যকিছু? তার কি কোনো অর্থ থাকবে, না সবকিছু মিলেমিশে তালগোল পাকিয়ে যাবে?

আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। ভবিষ্যৎ জীবন আমার কীভাবে যে গড়ে উঠবে তা কখনো, কোনোদিন ভাবিনি। ধ্বনিবিজ্ঞানে যে একদিন দীক্ষা নেব, এমন কথা ঘুণাক্ষরেও মনে পড়েনি। একদিন কয়েক বন্ধুতে কথার কথা নিয়ে খেলা করছি। হঠাৎ দুষ্টবুদ্ধি জাগল–আমার এক দুলাভাইকে ঠকানোর জন্য কী কৌশল অবলম্বন করা যায়। আমরা

এমন একটি বাক্য তৈরি করে কাগজে লিখলাম যেটা উল্টো করে শেষের দিক থেকে পড়লে তার ভারি একটা কদর্থ হয়। লিখে নিয়ে গিয়ে তাঁকে দিয়ে সেভাবে পড়িয়ে দিয়ে তাঁকে জব্দ করে সেদিন যে কী খুশি হয়েছিলাম, তা আজ মনে পড়ছে।

মনে পড়ছে আরও এক দিনের কথা। তখনও বয়স আমার বেশ কাঁচাই। সংসার জীবন সম্বন্ধে কিছুই ওয়াকিবহাল নই। আমার দুজন আত্মীয়কে দেখলাম কী বিষয় নিয়ে যেন তাঁরা খোশ আলাপ করছেন। আমি তাঁদের কথা পাছে বুঝে ফেলি সেজন্য আমাকে দেখে তাঁরা প্রত্যেকটি শব্দের আগে একটি করে 'চ' ধ্বনির ব্যবহার করতে শুরু করে দিলেন। তাঁরা সেদিন কী বলেছিলেন তা মনে নেই, কিন্তু তাঁদের কথার মাথামুণ্ড সেদিন বুঝতে পারিনি- কথা শুনে মনে হয়েছিল তাঁরা যেন ভূতের ভাষা বলছেন। আমি ফ্যালফ্যাল করে তাঁদের মুখের দিকে চেয়েছিলাম। আমি যে তাঁদের কথা বুঝতে পারছি না, এ বোধ তাঁদেরকে বেশ স্বস্তি দিচ্ছিল। তা যা হোক, শিশুমনের রহস্য আমি সেদিন কাটিয়ে উঠতে পারি নি। কিছুদিন পর আমার এক খেলার সাথীর সঙ্গে পরামর্শ করে এ ধরনের সাংকেতিক ধ্বনির আবিষ্কার করলাম। সে ধ্বনিটি ছিল 'ব'। আমরা দুজন আমাদের সমবয়সী অন্যান্য খেলার সাথীদের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠবার জন্য প্রত্যেকটি শব্দের আগে 'ব' ধ্বনি ব্যবহার করতে শুরু করে দিলাম। কিছুদিন যেতে না যেতে দেখি আমাদের পাড়ার অধিকাংশ ছেলেমেয়েই নিজেদের মধ্যে দল করে এক একটা ধ্বনিসংকেত ব্যবহার করতে শুরু করে দিল।

ধ্বনি নিয়ে এরকম খেলা শুধু আমরা কেন, বহু শিশুই খেলেছে। হয়তো শিশুরা এখনও খেলে থাকে। শিশু বয়সের সেই খেলার কথা পরিণত বয়সে ধ্বনির শৃঙ্খল আবিষ্কার করতে গিয়ে বারবার মনে পড়ছে। ধান ভানতে শিবের গীত লম্বা হয়ে গেল। কিনতু এ কথা বোধ হয় পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলতে পেরেছি যে, কথার মধ্যে নিয়মের তথা শৃঙ্খলার আবিষ্কারই ধ্বনিবিজ্ঞানের প্রধান কাজ। এ কাজ ধ্বনি বৈজ্ঞানিকের।

ধ্বনি-বৈজ্ঞানিক না হয়েও কিনতু এ বিজ্ঞানের নিত্যপ্রয়োজনীয় দিক থেকে বহু উপকার লাভ করা যায়। সাধারণ মানুষের অবশ্য এটুকু ধারণা আছে যে, মানুষের মুখ থেকেই তার ভাষার ধ্বনিগুলো বেরিয়ে আসে। কোনো কথা বলতে গেলে আমরা হাত, পা কি শরীরের অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়ি কম, মুখ নাড়ি বেশি। মুখ দিয়েই বলি সত্য, কিন্তু মুখের এক জায়গা আছে, আবার একটি রীতিও আছে। মুখ, ঠোঁট, জিব, জিবের ডগা, তার মাঝখান, কি গোড়া, কি নাকের ফুটো ইত্যাদি প্রত্যঙ্গগুলোর কোনখান থেকে কীভাবে কোন ধ্বনি বেরোয় সে সম্পর্কে একটু অবহিত হলে যে কোনো মানুষ যথাযথভাবে তার ভাষায় ধ্বনি উচ্চারণ করতে পারে। বাচ্চাদের ভাষা আয়ত্ত করার পদ্ধতি একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, তারা হাত-পা ছুড়ে অর্থাৎ একরকম ব্যায়াম করে যেমন তাদের খাবার হজম করে ঠিক তেমনি মুখের মধ্যে নানারকম কসরৎ করে এক একটা ধ্বনি আয়ত্ত করে। শিশুকাল থেকে এভাবে তা নিজের অজ্ঞাতসারে ব্যায়াম করে মানুষ তার ভাষার ধ্বনিগুলো উচ্চারণ করে। ফলে তার মুখের প্রত্যঙ্গগুলো বিশেষ ধ্বনির জন্য বিশেষভাবে তৈরি হয়ে যায়। ভালোমন্দ যেমনই হোক আপনা থেকে এমনি করে উচ্চারণরীতি গড়ে ওঠে।

তার উচ্চারণ যদি শ্রুতিকটু হয়, কিংবা প্রচলিত উচ্চারণ থেকে দূরে সরে যায়, তবে দোষ দেওয়া যায় না। যারা এ বিষয়ে সাবধান, তারা ভালো উচ্চারণ শুনে নিজের দোষত্রুটি সারিয়ে নিতে পারে। ধ্বনি উচ্চারণের প্রত্যঙ্গগুলো সম্পর্কে যদি তার জ্ঞান থাকে, তবে তা হয় সোনায় সোহাগা। তখন একটু চেষ্টা করলেই অল্প সময়ের মধ্যে ভালো উচ্চারণ সে আয়ত্ত করে নিতে পারে। নিজের মন্দ উচ্চারণকেও যদি কোনো লোক আদর্শ মনে করে, সে কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। তার কথা আমরা বলছি না। কিন্তু অসুবিধা হয় তখনই যখন ভালো উচ্চারণকে বহু লোকেই ভালো বলে, আর মন্দকে বলে মন্দ। আর কেনই বা তারা তা না বলবে? মন্দ উচ্চারণ যে কানে লাগে, বিশ্রীও শোনায়, আর তার পাশাপাশি ভালো উচ্চারণ শুনলে মন যে বেশ প্রফুল্ল হয় ও চিত্তে দোলা লাগে। এর ওপর তো কারুর হাত নেই। এখানে তো কারুর জোর চলবে না। এ জন্যই বলছি, নিজের উচ্চারণকে ভালো করার জন্য, কথা বলে অপরের কাছে নিজেকে সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলার জন্য, ভালো করে কথা বলার শক্তি আয়ত্ত করা চাই। অবশ্য ভালোভাবে কথা বলতে পারার মধ্যে মানুষের ব্যক্তিত্বের বহু কিছুই জড়িয়ে আছে, তবু মানুষের মুখের মিষ্টি উচ্চারণ যে মানুষকে সুন্দরভাবে ফুটে ওঠার সুযোগ দেয়, তা স্বীকার না করে পারি কই? তাই দেখি ধ্বনি সম্পর্কিত জ্ঞান মানুষের ব্যবহারিক জীবন রচনায় বড় কাজে লাগে।

মুখের দোষ ত্রুটি থাকার জন্য কিংবা কোনো প্রত্যঙ্গের হানি হওয়ার জন্য, না হয় অন্য কোনো কারণবশত যদি কারুর বিকৃত উচ্চারণ কিংবা বাকশক্তিহীনতা দেখা যায়, তাহলে যে কোনো ধ্বনি-বৈজ্ঞানিক তা সারিয়ে দিতে পারেন। যারা তোতলা, কিংবা যাদের কথায় জড়তা আছে, কিংবা কথা বলতে গিয়ে পদে পদে যারা আটকে যায়, গভীর সহানুভূতি ও ধৈর্যের সঙ্গে উপযুক্ত ব্যায়াম করিয়ে তাদের সে দোষত্রুটিও ধ্বনিবিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকের সাহায্যে সারিয়ে দেওয়া যায়। ইউরোপ, আমেরিকার মনোবিজ্ঞান, ধ্বনিবিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান একযোগে কাজ করে এ ধরনের বহু রোগীকে তারা রোগমুক্ত করেছে।

আমি এমন অনেক মা-বাবাকে জানি যাঁদের ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত বয়সে কথা ফোটে না বলে তাঁদের চিন্তার অন্ত নেই। ধ্বনিবিজ্ঞান সম্পর্কে এঁদের যদি একটু জ্ঞানও থাকত তাহলে চিন্তিত হবার কোনো কারণ থাকত না। তাঁরা নিজেরাই প্রয়োজনীয় ব্যায়াম করিয়ে তাঁদের এ ধরনের শিশুদের মুখে কথা ফোটাতে পারতেন। এ ছাড়া এমন অনেক মা-বাবাই আছেন যাঁদের শিশুরা বাইরের পরিবেশ থেকে প্রতিনিয়ত বিকৃত উচ্চারণ শিখে এলেও তাঁদের শিশুদের উচ্চারণ সুন্দর করাতে পারতেন। মাঝে মাঝে তাই আমর মনে হয়, আমাদের দেশের শিক্ষিত মায়েরা যদি এক একটি খুদে ধ্বনি-বৈজ্ঞানিক হতেন, তাহলে তাঁদের শিশুর উচ্চারণ শুধরে দিতে পারতেন, আর সেরকম হলে বহুকাল ধরেই আমাদের মুখের ভাষার শ্রী, শালীনতা ও সৌন্দর্য বজায় থাকত।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'ধ্বনির ব্যবহার' লেখাটি মুহম্মদ আবদুল হাই-এর 'প্রবন্ধাবলি' থেকে গৃহীত হয়েছে।

মূলবক্তব্য

শিশুকাল থেকে মানুষ যেসব ধ্বনি উচ্চারণ করে সেসব ধ্বনির ওপর তার জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থবোধক ধ্বনির সাহায্যেই মানুষ তার মনের ভাব অন্যের কাছে সঞ্চার করে। ধ্বনির বিশৃঙ্খল উচ্চারণ বিশেষ জনগোষ্ঠীর কাছে কোনো অর্থ বহন করে না- এ কারণে অর্থ সৃষ্টির জন্য ধ্বনিসমূহকে বিশেষ নিয়ম এবং রীতির মাধ্যমে উচ্চারণ করতে হয়। এই ধ্বনিসমূহ উচ্চারিত হয় কতিপয় বাক-প্রত্যঙ্গের সহায়তায়; এগুলো হল- মুখ, ঠোঁট, জিহ্বা, জিহ্বার ডগা, নাসারন্ধ্র, স্বরযন্ত্র, দাঁত, তালু প্রভৃতি। মনের ভাব প্রকাশ করে ধ্বনিসমূহ–তা অনেক সময়ই বিকৃত উচ্চারণের কারণে কিংবা বাক-প্রত্যঙ্গের বিশেষ কোনো অসুবিধার জন্য শ্রুতিকটু হয়ে দাঁড়ায়। বাকশক্তিহীনতার কারণেও ধ্বনি উচ্চারিত হয় না। ধ্বনিবিজ্ঞানীর পরামর্শ অনুযায়ী বাগযন্ত্রের প্রয়োজনীয় ব্যায়াম করে এ ধরনের অসুবিধা দূর করা সম্ভব।

শব্দার্থ ও টীকা

ধ্বনি- ফুসফুসতাড়িত বাতাস মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় সাধারণত ধ্বনির সৃষ্টি হয়। শ্বাসবায়ু বেরিয়ে আসার সময় গলনালী ও মুখবিবরের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। এ সংঘর্ষের স্থান, রীতি ও পরিমাণ অনুযায়ী বিভিন্ন ধ্বনির সৃষ্টি হয়। এই ধ্বনিসমূহের মধ্যে কেবল অর্থবোধক ধ্বনিগুলোই মানুষের বিভিন্ন ভাষায় বাগধ্বনি হিসেবে বিবেচিত। **ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics)**-কোনো বিশেষ ধ্বনির গঠন, উচ্চারণরীতি, ধ্বনিশ্রুতি এবং ঐ ধ্বনির শুদ্ধ ও অশুদ্ধ উচ্চারণ সম্পর্কে ভাষাতত্ত্বের যে শাখা আলোচনা করে তাকে 'ধ্বনিবিজ্ঞান' বলে।

জন্মগত অধিকার- জন্মসূত্রে প্রাপ্ত অধিকার। এ ক্ষেত্রে 'জন্মের পর থেকে শিশুর মুখে আস্তে আস্তে যে প্রক্রিয়ায় ধ্বনি উচ্চারিত হয় তা বলা হয়েছে। **এলোপাতাড়ি-** বিশৃঙ্খল, এলোমেলা। **দীক্ষা-** শিক্ষা গ্রহণ করা। **ধ্বনি-বৈজ্ঞানিক (Phonetician)**- ধ্বনিবিজ্ঞানী, যিনি বাগধ্বনির স্থান, উচ্চারণরীতি ও শুদ্ধ-অশুদ্ধ উচ্চারণ বিষয়ে আলোচনা করেন।

বাক-প্রত্যঙ্গ (Organs of speech) যেসব প্রত্যঙ্গের সহায়তায় ধ্বনির সৃষ্টি হয়, যেমন- ফুসফুস, গলনালী, জিহ্বা, দাঁত, তালু, নাক, ঠোঁট ইত্যাদি। **বিকৃত উচ্চারণ**-অশুদ্ধ উচ্চারণ। **বাকশক্তিহীনতা**- ধ্বনির উৎপাদন এবং উচ্চারণে অক্ষমতা। **ধান ভানতে শিবের গীত**- অবান্তর কথকতা; অপ্রাসঙ্গিকতা। **মনোবিজ্ঞান** ((**Psychology**)- মনস্তত্ত্ব বিষয়ক বিজ্ঞান।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. এককেটি ধ্বনি আয়ত্ত করতে মুখের কোন কাজটি করতে হয়?

ক. অনুশীলন খ. কসরৎ

গ. ব্যবহার ঘ. নড়াচড়া

২. 'কথার মধ্যে নিয়মের শৃঙ্খলা'- এ মন্তব্যে নিচের কোন তাৎপর্যটি ফুটে ওঠে?

ক. ভাষায় ব্যাকরণের ব্যবহার অপরিহার্য খ. যথেচ্ছভাবে ভাষার ব্যবহার হয় না

গ, ভাষার উপাদান নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা ঘ. প্রয়োজনেই মানুষ ভাষার শৃঙ্খলা মানে

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

'মন্দ উচ্চারণ যে কানে লাগে, বিশ্রীও শোনায় আর তার পাশাপাশি ভালো উচ্চারণ শুনলে মন যে বেশ প্রফুল্ল হয় ও চিত্তে দোলা লাগে।'

৩. উদ্দীপকে ধ্বনির কোন দিকটি সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে?

ক. বিশুদ্ধতা খ. অলংকার

গ. সমৃদ্ধি ঘ. লৌকিক ব্যবহার

৪. নিচের কোন বাক্যে ধ্বনিগত মাধুর্য রক্ষিত হয় এবং শুনে মনও প্রফুল্ল হয়?

ক. আমাগো আজ যাইতে হবি নে খ. এক বেটার পাঁচ ছাওয়াল আছিল

গ. সেখানেই হয়তো তাঁর গন্তব্য ঘ. অশক্য আছিলু মুই দুর্বল ছাবাল

সৃজনশীল প্রশ্ন

অনুচ্ছেদটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ধ্বনি কেবল মুখনিঃসৃত আওয়াজই নয়, এর জন্য রয়েছে বিজ্ঞানসম্মত রীতি ও সংবিধান। নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে এর উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে বলেই এর যথেচ্ছ ব্যবহার কাঙ্ক্ষিত ও বাঞ্ছিত নয়। কথার শৃঙ্খলায় কোথাও বিন্দুবিসর্গ ব্যত্যয় ঘটলে তা সহজেই কানে লাগে। কাজে কাজেই কথার মধ্যে নিয়মের তথা শৃঙ্খলার আবিষ্কারই ধ্বনিবিজ্ঞানের প্রধান কাজ। ধ্বনিবৈজ্ঞানিক না হয়েও আমরা এর উপাদানসমূহ বাক্‌প্রত্যঙ্গের কসরৎ করে আজীবন পর্যবেক্ষণ ও আয়ত্ত করে থাকি।

ক. ধ্বনি কী ?

খ. ধ্বনির যথেচ্ছ ব্যবহার বাঞ্ছিত নয় কেন ?

গ. 'কথার শৃঙ্খলায় ব্যত্যয় হলে তা কানে লাগে।'– উদাহরণসহ প্রমাণ কর।

ঘ. কথার মধ্যে নিয়মের তথা শৃঙ্খলার আবিষ্কারই ধ্বনিবিজ্ঞানের প্রধান কাজ। –বিশ্লেষণ কর।

দুই মুসাফির

শওকত ওসমান

[লেখক পরিচিতি : শওকত ওসমান ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার অন্তর্গত সবলসিংহপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম শেখ আজিজুর রহমান। শওকত ওসমান তাঁর ছদ্মনাম। ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ.পাশ করার পর কিছুদিন সরকারি প্রচার বিভাগে সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্ত হলে তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং সরকারি কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি দীর্ঘকাল চট্টগ্রাম সরকারি বাণিজ্য কলেজে ও ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। শওকত ওসমানের গল্পে তীক্ষ্ণ সমাজ সচেতনতা ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : জননী, ক্রীতদাসের হাসি, জাহান্নাম হইতে বিদায়, জুনুআপা ও অন্যান্য গল্প, সাবেক কাহিনী, প্রাইজ ও অন্যান্য গল্প, প্রস্তর ফলক, আমলার মামলা, কাঁকর মনি, ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী, সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই, বনী আদম ইত্যাদি। ১৯৯৮ সালের ১৪ই মে শওকত ওসমান পরলোকগমন করেন।]

গ্রীষ্মের দুপুর প্রায় শেষ। অড়হর খেতে ছায়া পড়ছে। ক্রমশ দীর্ঘতর। কুষ্টিয়া জেলাবোর্ডের সড়ক পথে একজন পথিক হাঁটছিলেন। পরনে গেরুয়া তহবন্দ, গায়ে গেরুয়া আলখেল্লা। লম্বাটে মুখবোঝাই সাদা দাড়ি। হাতে একটা একতারা। পথিক ঘর্মক্লান্ত। তবু দুই চোখ পথের ওপর নয়, পথের দু ধারে। গ্রীষ্মের দাবদাহ সব পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। এই রুক্ষতার সৌন্দর্য বৈরাগীর মনের রঙের মতো। পথিক তাই চেয়ে চেয়ে দেখছেন আর হাঁটছেন। মাঝে মাঝে একতারায় হঠাৎ আঙুল অজানিতে গিয়ে পড়ে। টুং টাং আওয়াজ রৌদ্রের বিবাগী সুরে মিশে যায়। তা নিতান্ত অজানিতে। নচেৎ পথিকের মন একতারার সুরে নয়, বহির্বিশ্বের ফ্রেমে আবন্ধ। মাঝে মাঝে ছায়াবতী গাছ পড়ে কিন্তু মুসাফির থামেন না । তিন মাইল দূরে গঞ্জ দেখা যায়। সেখানেই হয়তো তাঁর গন্তব্য।

পেছনে আর একজন হাঁটছেন। একটু দ্রুত। তাঁর ইচ্ছা অগ্রগামী পথিকের সঙ্গ ধরা। ডাক দিয়ে হয়তো চলা থামানো যায়। কিন্তু এ মুসাফির অত দূরে গাঁয়ে-পড়া ভাব দেখাতে রাজি নন। তা ছাড়া এই মহাজনের চেহারায় রুক্ষ-কাঠিন্যের ছাপ স্পষ্ট, তাঁর কালো গুম্ফরাশি এবং সুঠাম লোমপূর্ণ দুই বাহুর মধ্যে মুখটি বেশ চওড়া। চোখ গোল- ভাঁটার মতো। দেখলেই মনে হয়, এই মানুষ হুকুম দিতে অভ্যস্ত, তামিলে নয়। কিন্তু তিনি হাঁটছেন জোর-পা। অগ্রগামী পথিককে ধরা উচিত। পথচলার ক্লান্তি দূর করতে সঙ্গীর মতো আর কিছুই নেই। দ্বিতীয় পথিক জোরে হাঁটতে লাগলেন। ফলে ঘাম ঝরে তার শরীর থেকে। মুখে অসোয়াস্তি ছাপ পড়ে। কিন্তু তবু সংকল্প টলে না।

কাছাকাছি এসে দ্বিতীয় পথিক ডাক দিলেন, ও ভাই !

আগের পথিক এবার পেছনে তাকান। অন্য মানুষ দেখে মুখে অভিনন্দনের হাসি, থামলেন প্রথম পথিক।

পেছনে ফিরে বললেন, আমাকে ডাকছেন, ভাই ?

-জি, স্লামালেকুম।

-অলাইকুম আসসালাম।

-আপনি কোন দিকে যাচ্ছেন?

-ঐ গঞ্জে।

-বেশ বেশ। আমিও যাব। বেশ ভালোই হল।

চলুন একসঙ্গো, কথা-বার্তায় যাওয়া যাবে।

দুজনে এগোতে থাকেন। এবার কিন্তু দুজনেরই পদক্ষেপ শ্লথ। সঙ্গী পেলে পথের দূরত্ব আর ভীতিজনক থাকে না। তাই হয়তো তাঁরা ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলেন। দুজনে পাশাপাশি। দাড়িশোভিত পথিকের দৃষ্টি বাইরের দিকে। গুম্ফধারী মুসাফির কিন্তু সঙ্গীর দিকে বারবার তাকান। গ্রীষ্মে দিগন্ত আলোর তীব্রতায় মুহ্যমান। সেই রূপ সবসময় পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় মুসাফির সেদিকে তাকিয়ে সঙ্গীর চোখের দৃষ্টি কোথায় মিশেছে দেখতে চান। সেই দৃষ্টি দিগন্ত-অভিমুখী। দ্বিতীয় মুসাফির তাই কয়েকবার দূরে তাকিয়ে আবার সঙ্গীর অবয়বের দিকে লক্ষ করেন। অপরজন নির্বিকার।

এই নিস্তব্ধতা দ্বিতীয় পথিকের কাছে অসহ্য লাগে। কথায় বন্ধন না এলে আর বন্ধু কী? গুমোট দূর করতে তিনি বেশ উঁচু আওয়াজেই বলেন, ভাই আপনি কি গান করেন। সদ্য চমক-ভাঙা প্রথম আনমনা মুসাফির শুধান, কী ভাই, আমাকে কিছু বলছিলেন?

-জি

-কী, বলুন?

-আপনি কি গান করেন?

-জি, করি।

তবে একটা গান করুন না, যদি আপনার অসুবিধা না হয়।

-না, অসুবিধা আর কী। তাহলে শুনুন।

-গেরুয়াবসন পথিক একতারার সাজ ঠিক করে নিলেন। তারপর গান ধরলেন :

দিল দরিয়ার মাঝে দেখলাম
আজব কারখানা।।
দেহের মাঝে বাড়ি আছে,
সেই বাড়িতে চোর লেগেছে,
ছয়জনাতে সিঁদ কাটিছে,
চুরি করে একজনা।।
দেহের মাঝে বাগান আছে
নানা জাতি ফুল ফুটেছে
ফুলের সৌরভে জগৎ মেতেছে
কেবল লালনের প্রাণ মাতল না।।

নির্জন মাঠ সুরের ঝরনাধারা থেকে পানীয় ঠোঁটে নিয়ে তৃষ্ণা মেটায়। দাবদাহ দূরে সরে যায়। সুরের মোড়কে পৃথিবী যেন শরণার্থী। কখন গান থেমে যায়, কেউ লক্ষ করে না। কারণ, পথের সঙ্গে পায়ের হদিস ঠিক ছিল। দ্বিতীয় পথিক এই রেশে আঘাত দিলেন।

-আহ, চমৎকার গান গানতো আপনি।

-জি?

চমৎকার আপনার গান।

-জি, এ আর কী।

-না, না। সত্যি সুন্দর গলা আপনার। আমি এ গান আর কখনও শুনিনি।

-কখনও শোনেননি?

-না।

-বেশ।

দুজনের মধ্যে আর কোনো বাক্যালাপ হয় না। তাড়াতাড়ি পথ শেষ করাই তখন লক্ষ্য।

মাঠ শেষ হয়ে গেল। তাঁরা দুই জনে এখন লোকালয়ের মধ্যে এসে পড়েছেন। গাছ-গাছালির মাঝখানে খড়ো বাড়ি, টিনের ঘর , কৃচিৎ ইমারত দেখা যাচ্ছে। সড়কের দু পাশে এখানে বহু গাছের সারি। দু একজন পথিক যে যার কাজে যাচ্ছে, এদের দিকে কেউ তাকায় না। তবু মানুষের সঙ্গ পাওয়া গেল, প্রথম মুসাফির ভাবলেন।

তাঁরা এবার একটা জায়গায় এসে পড়েছেন। এখানে সড়কের দু পাশ ফাঁকা। তারপরই অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ভিটা, পুকুর পুষ্করিণী। এক জায়গায় জড়াজড়ি করা কয়েকটা ইমারত দেখা গেল, বেশ বড় বাগানের ফলের গাছের সারির ভেতর দিয়ে।

দ্বিতীয় পথিকের সেদিকে চোখ পড়া মাত্র তিনি বৈরাগী পথিকের হাত ধরে টান দিলেন, আর বললেন- একটু জলদি আসুন, ঐ আমার ঘর দেখা যাচ্ছে, ঐ আমার বাগান। এই চারদিকে যত জমি-জিরাত সব আমার। চলুন, চলুন। আপনাকে ঐ যে নারকেল গাছ দেখা যাচ্ছে ওখান থেকে যা ডাব খাওয়াব,সাত দিনের পিয়াস মরে যাবে।

প্রথম মুসাফির আর জবাব দেওয়ার অবসর পান না। দ্বিতীয় পথিকের মুঠির মধ্যে তাঁর হাত বাঁধা। দ্রুত হাঁটতে তাই বাধ্য হচ্ছেন। দুই জনে এসে একটা পাকা সান-বাঁধানো দিঘির ধারে থামলেন। পাড়ে শত শত নারকেল গাছ।

দ্বিতীয় পথিক বললেন, এখানে বসুন। এই কামিনী গাছের ছায়ার নিচে। আমি ডাবের বন্দোবস্ত করি। এই সব আমার। এই দিঘি, আগান-বাগান, ওই ইমারত আর ওপাশে মাঠে চোখ যদ্দুর যায়, সমস্ত আবাদি জমি আমার। আর এই যে- পথিকের কথা সমাপ্ত হয় না। এরা লক্ষ করেন নি সানবাঁধা ঘাটের একপাশে দুটো নারিকেল গাছের আড়ালে আর একজন বেশ মোটা তেজীয়ান, গোঁফবান ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি হঠাৎ বেরিয়ে এলেন একদম দুজনের মুখোমুখি।

উভয়ের সারা বদনে দৃষ্টি বুলিয়ে তিনি দ্বিতীয় পথিককে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী বলছিলেন?

-এই আগান-বাগান ইমারত সব আমার।

-আপনার নাম কী?

সোবহান জোয়ার্দার।

ঐ ব্যক্তি একচোট হো-হো শব্দে খুব হেসে নিলেন, তারপর বেশ রুক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, জোয়ার্দার? বাপের নামটা ঠিক মনে আছে তো?

-নিশ্চয় আছে। গোলাম রহমান জোয়ার্দার।

লোকটা আবার হাসতে লাগলেন। কিন্তু এবার হাসি হঠাৎ থামিয়ে বেশ তিরিক্ষি মেজাজে বললেন, আপনার মাথা ঠিক আছে তো?

বিস্ময়ে দ্বিতীয় মুসাফির পাল্টা প্রশ্ন করেন, - কেন?

-মাথা ঠিক আছে বলে তো মনে হয় না। জোয়ার্দার বলে এই গাঁয়ে কোনো গাধা পর্যন্ত নেই। মানুষ তো দূরের কথা।

-মিথ্যে কথা। এ সব আমার। সব আমার। তুমি কে হে?

-মুখ সামলে ভদ্রলোকের মতো কথা বল। আপনি থেকে তুমি? আমার নাম সোলেমান মল্লিক। এই সব জমি-জিরাত, ইমারত-কোঠা, যা কিছু দেখছ সব আমার।

-এ সব আমার।

চুপ চোর-জোচ্চোর কোথাকার।

-কী ! আমার জিনিস, আর আমি চোর-জোচ্চোর?

- যা ব্যাটা । এখনও তোর গায়ে হাত তুলিনি, তোর বাপের নসিব। যা মানে মানে পালা। না হলে জুতো খাবি, আবার পুলিশের হাতকড়া পর্যন্ত হাতে উঠবে।

- তুমি ঝুট কথা বলছ। দ্বিতীয় মুসাফিরের মুখ থেকে এই প্রশ্ন বেরুনো মাত্র ঐ লোকটা এক থাপ্পড় তুলে এগিয়ে এল। এবার প্রথম মুসাফির মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর সৌম্য মুখের দুদিকে চেয়ে সোবহান মল্লিক হাত নামিয়ে নিল।

দ্বিতীয় পথিক অর্থাৎ জোয়ার্দার চিৎকার করে ওঠে,-না, এ জমি জায়গা আমার।

মল্লিক আবার থাপ্পড় তুলে শাসায়। মাঝখানে প্রথম মুসাফির। এই গোলমাল শুনে কয়েকজন লাঠি নিয়ে ছুটে এল। একজন বলল, বড়মিয়া সাহেব, আপনার গলা শুনে ছুটে এলাম। কী ব্যাপার?

আঙুল বাড়িয়ে মল্লিক জবাব দিল, ঐ ফকিরের পেছনে ওই যে দাঁড়িয়ে আছে, জোয়ার্দার না ফোয়ার্দার- নাম কেউ এলাকায় কোনোদিন শোনেনি, ব্যাটা বলে- এসব জমি-জায়গা, বাগান-দিঘি ওর। ব্যাটার আস্পর্ধা দ্যাখ।

-একবার হুকুম দিন না। মাথাটা একদম বাইন-মাছ ছেচাঁ করে দিই। সমস্বরের মধ্যে অন্যান্য আদেশ প্রার্থনার বুলি তলিয়ে গেল।

জোয়ার্দার তখন অবস্থার আঁচ পেয়ে আর মুখ খোলেন না। মুখ খুললেন ফকির নামে সম্বোধিত প্রথম মুসাফির। তিনি বললেন, ভাই ইনি আমার সঙ্গী। আপনাদের জমি-জিরাতের মামলা সেটা আদালতে ইনসাফ হতে পারে। ও নিয়ে বিবাদ ভালো নয়। ওকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। তার আগে আপনাদের একটি গান শুনিয়ে দিই। মল্লিক শান্ত হয়ে এসেছে এই প্রস্তাবে। বলল, জনাব ফকির সাহেব, একটা ডাব খেয়ে নিন। আপনি ক্লান্ত বেশ বোঝা যাচ্ছে। পরে গান করুন।

-না ভাই, আমি ক্লান্ত নই। আমার অত ভুক-পিপাস ঘন ঘন লাগে না।

-তবে বসুন।

না, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাইতে আনন্দ পাই।

গান শুরু হল :

মানুষ রে দেখরে ভাই দিব্যজ্ঞানে।
পাবিরে অমূল্য নিধি, এই বর্তমানে।।
ম'লে পাব বেহেস্তখানা,
তা শুনে আর মন মানে না।
লালন কয় বাকির লোভে নগদ পাওনা
কে ছেড়েছে এই ভুবনে।।

পড়ন্ত দুপুর। রৌদ্রের রিম ঝিম উত্তাপ সুরের মোচড়ে মূর্ছনার সঙ্গ অভিলাষী। বায়ু তরঙ্গ সকলের বক্ষ-সৈকতে সুরাবেশে বারবার আছড়ে পড়ে।

অনেক লোক জমেছে ইত্যবসরে। সুরের ইন্দ্রজালে কাজ ফেলে এসেছে কতজন। ছোটখাট জমায়েৎ পাড়ের ওপর। স্তম্ভিত শ্রোতাদল।

সোলেমান মল্লিক গান থামার পর জিজ্ঞেস করে, জনাব আমার বেয়াদবি মাফ করবেন। আপনার নাম?

-আমার নাম লালন ফকির।

-কুষ্টিয়ার লালন ফকির?

-হ্যাঁ ভাই।

গ্রামের জমায়েত লোকদের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে। একজন চিৎকার দিয়ে গ্রামের দিকে ছুটতে লাগল–ওরে কে কোথায় আছিস, লালন ফকির ফিরে এসেছেন, ওরে আয়। গান শুনবি। আয়, চোখ সার্থক করবি-আয় -আয়।

বিলম্ব হয় না। দলে দলে লোক ছুটতে লাগল। ফকির বিস্মিত। একজন এগিয়ে এসে বলল, জনাব, দাদা- পরদাদার কাছে আপনার নাম শুনেছি, গান শুনেছি। আপনাকে ছেড়ে দেব না। এখানে জায়গা কম। চলুন দশ মিনিটের পথ গঞ্জ। গঞ্জে চত্বরে হাজার হাজার লোক ধরে, সেখানে আপনাকে যেতে হবে।

- চলুন।

ফকির এইটুকু উচ্চারণ করেন মাত্র। তারপরই কয়েকজন তাঁকে কাঁধে তুলে নিল। ফকিরকে পায়ে হাঁটতে দেবে না। তাঁর হাজার অনুরোধ আর কেউ কানে নেয় না । ছোট জনস্রোত নানাদিক থেকে ছুটে আসছে। লালন ফকির বললেন, আমার সঙ্গী যেন হারিয়ে না যান। এতক্ষণে জোয়ার্দারের দিকে সকলের চোখ পড়ে। তিনি ফকিরের পাশেই আছেন।

হাজার হাজার জনতা গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে এসে জুটছে। সকলের মুখে মুখে সেই অপূর্ব কাহিনীর গুঞ্জন, কবি লালন ফকির আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। লোকারণ্য বিস্তৃত হতে থাকে গঞ্জের চত্বরে, চতুর্দিকে।

মাঝখানে গানের আসর। গেরুয়াবসন কবির কণ্ঠ ও একতারা নিনাদিত। অভিনয় সহকারে বাউল ফকির মেতে উঠেছেন। স্তব্ধ জনতা। নির্বাক পৃথিবী। সুর আর সুধার পার্থক্য কতটুকু?

।।২।।

জোয়ার্দার : কবি।

লালন : কী ভাই?

জোয়ার্দার : আমি ভেবেছিলাম, আজ রাত্রি কেন, বহু রাত্রি তোমাকে বন্দি থাকতে হবে এখানে।

লালন : তা তো থাকার যো নেই। আমি বলে এসেছি, ইহলোকে একদিন থাকব। আজ ভোরেই নিজের ঠিকানায় পৌঁছব। বাইরে আসার নাম করে, চলে এলাম। ওই শুকতারা উঠছে। চল, বাতাসে মিলিয়ে যাই।

জোয়ার্দার : আমিও তো একদিনের ছুটি নিয়ে পৃথিবী দেখতে এসেছিলাম।

লালন : কী দেখলে?

জোয়ার্দার : আমাকে কেউ চেনে না, নাম পর্যন্ত জানে না।

লালন : আর কী দেখলে?

জোয়ার্দার : আর কিছু না।

লালন : যুগে যুগে তোমাদের এই আর এক দোষ।

জোয়ার্দার : কী?

লালন : দেখলে না কিছু?

জোয়ার্দার : কী দেখলে?

লালন : দেখলে না? দেখলে না, একদিন তোমার কত কী, কত কে ছিল, আমার কিছুই ছিল না। আজ আমার সব আছে- অথচ তোমার কিছুই নেই।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'দুই মুসাফির' গল্পটি শওকত ওসমানের 'প্রস্তর ফলক' গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

মূলবক্তব্য

সংসারে যারা বিষয়ী ও বিত্তবান বলে পরিচিত তাদের জীবন শেষ হয়ে যায় মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। মৃত্যুই তাদের জীবনের ইতি টেনে দেয়। যারা সুর, সংগীত ও আধ্যাত্মিক চেতনায় মানুষেকে সঞ্জীবিত করেন, তাঁরা বেঁচে থাকেন মৃত্যুর পরে যুগ যুগ ধরে। এ সত্যটিকে গল্পকার তুলে ধরেছেন লালন ফকিরের চরিত্র অঙ্কন করে। লেখক কাল্পনিক কথোপকথন সংযোজন করে এর কাহিনীতে ছোটগল্পের আমেজ সৃষ্টি করেছেন।

শব্দার্থ ও টীকা

তহবন্দ (ফারসি শব্দ)- লুঙ্গি। **গেরুয়াবসন**- গৈরিকবর্ণ রঞ্জিত বস্ত্র, সন্ন্যাসীদের পরিধেয়। **আলখেল্লা** (আরবি শব্দ)- লম্বা ঢিলা জামা। **দাবদাহ**- প্রচণ্ড গরম,দাব মানে বন, দাহ মানে উত্তাপ-এখানে দাবানলের দহনের মতো গরম। **বহির্বিশ্ব**- বাইরের পৃথিবী। **একতারা**- একটি তার বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র, সাধারণত বাউলরা ব্যবহার করেন। **গন্তব্য**- যেখানে যেতে হবে। **তামিল**- পালন। **গুম্ফধারী**- গোঁফওয়ালা। **অবয়ব**- আকৃত। **দিব্যজ্ঞান**- অলৌকিক জ্ঞান।

লালন ফকির-লালন শাহ ছিলেন বাউল সাধক। তাঁর জন্মস্থান ও জন্ম তারিখ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যতদূর জানা যায়, ঝিনাইদহ জেলার হরিশপুর গ্রামের এক মুসলমান পরিবারে ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। সম্ভবত তিনি ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারিয়ে যখন গান গেয়ে রাখাল বালকরূপে ঘুরে বেড়াতেন তখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় বাউল সাধক সিরাজ সাঁইয়ের; তিনি সিরাজ শাহের কাছে আধ্যাত্মিক তত্ত্বে দীক্ষা নেন। লালন ক্রমে ক্রমে ধর্মগ্রন্থ, ষড়দর্শন, স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে অনেক জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক গানগুলোতে এর পরিচয় আছে। রবীন্দ্রনাথ বাউল সাধক লালন শাহের গুণগ্রাহী ছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু গানে ও কবিতায় লালনের প্রভাব আছে। লালন ফকিরের আধ্যাত্মিক গানগুলো গোঁড়া ধর্মানুসারীদের অনেক সময় পছন্দ হত না। লালন শাহ গান ও আধ্যাত্মিক সাধনায় এত মগ্ন থাকতেন যে মৃত্যুর পূর্বরাতে তিনি শুধু গানের পর গান গেয়েছেন এবং গান গাইতে গাইতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

মুসাফির- পরিভ্রমণকারী, পথিক। শব্দটি এখানে রূপক অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। এ পৃথিবীতে মানুষ আসে কয়েকদিনের জন্য। একজন ভ্রমণকারী বা পথিক যেমন এক জায়গায় বেশিক্ষণ অবস্থান করেন না, পৃথিবীতে মানুষের জীবন তেমনি নশ্বর। তবুও এ পৃথিবীতে কেউ আপন সৃষ্টির মাধ্যমে, সাধনা ও সুরের মাধ্যমে মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকেন। যাঁরা ধনবান ও বিত্তশালী তাঁরাও মারা যান এবং মৃত্যুর পর পর তাদের জীবনের আর কিছুই থাকে না। দুই মুসাফির গল্পে দেখা যায় জোয়ার্দার ও লালন ফকির দুজনই দুদিনের মুসাফির, কিন্তু একজন মুসাফিরকে অর্থাৎ লালন ফকিরকে তাঁর মৃত্যুর বহুকাল পরেও পরবর্তী বংশধর মনে রেখেছে, মনের মধ্যে লালন করে রেখেছে। অপর মুসাফির অর্থাৎ এক সময়কার জমিদার জোয়ার্দারকে কেউ মনে রাখেনি।

দিল দরিয়ার মাঝে দেখলাম...... প্রাণ মাতল না- লালন ফকিরের এই রূপক গানটিতে মানবদেহকে একটি আজব কারখানার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মানুষের দেহ একদিকে যেমন পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং ষড়রিপুর প্রবঞ্চনায় আবদ্ধ, অন্য দিকে এতে সুকুমার বৃত্তি ও আধ্যাত্মিক চেতনা আছে। এ জগতে আছে নানা মোহ ও আকর্ষণ। এ সবের মধ্যেই মানুষের জীবন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘কুষ্টিয়া জেলাবোর্ডের সড়ক পথে একজন পথিক হাঁটছিলেন।’- পরনে তার কী রঙের তহবন্দ ?

ক. লালচে খ. ধূসর
গ. গেরুয়া ঘ. সাদা

২. পথিকের হাতে একতারা কেন?

ক. আনন্দে পথ চলতে খ. বাউল মন তাই
গ. গঞ্জে যাবেন বলে ঘ. সুরময় গতির জন্যে

৩. গল্পে ‘মুসাফির’ শব্দটি কোন অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে?

ক. পথিক অর্থে খ. সন্ন্যাসী অর্থে
গ. ফকির অর্থে ঘ. রূপক অর্থে

৪. ‘আজ আমার সব আছে-অথচ তোমার কিছুই নেই।’ –কথাটির অর্থ কী?

ক. জোয়ার্দারের বিত্ত আছে খ. লালনের বিত্ত আছে
গ. লালনের আধ্যাত্মিক চেতনা ঘ. বাউলের সাধনা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. গানের অনুচ্ছেদটি পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

“দিল দরিয়ার মাঝে দেখলাম
আজব কারখানা।।
দেহের মাঝে বাড়ি আছে,
সেই বাড়িতে চোর লেগেছে,
ছয়জনাতে সিঁদ কাটিছে,
চুরি করে একজনা।।

ক. উল্লিখিত গানটির রচয়িতা কে ?
খ. মানবদেহকে একটি আজব কারখানার সঙ্গে তুলনা করার পক্ষে তোমার যুক্তি প্রদর্শন কর।
গ. গানটি রূপকধর্মী কেন ?
ঘ. ‘ছয়জনাতে সিঁদ কাটিছে, চুরি করে একজনা।।’- কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

লালসালু

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

[লেখক পরিচিতি : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১৯২২ সালের ১৫ই আগস্ট চট্টগ্রামের ষোলশহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বাবার কর্মস্থল পরিবর্তনের সূত্রে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে দেখার এবং সেসব অঞ্চলের জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। তিনি কলকাতায় একটি ইংরেজি দৈনিকে সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং পরবর্তীকালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকুরি নিয়ে দীর্ঘদিন প্যারিসে কাটান। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রথম উপন্যাস লালসালু ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। দীর্ঘদিন বিদেশে অবস্থান করলেও তাঁর লেখায় গ্রামবাংলার মুসলমান সমাজের সামাজিক সমস্যা ও তাঁর রূ প সার্থকতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। মননশীলতা ও ভাষার নিটোল বাঁধুনি তাঁর গদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : লালসালু, চাঁদের অমাবস্যা, কাঁদো নদী কাঁদো, বহিপীর ও দুই তীর। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে তিনি প্যারিসে বাংলাদেশের পক্ষ অবলম্বন করে কাজ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ১০ই অক্টোবর ১৯৭১ সালে প্যারিসে পরলোকগমন করেন।]

শ্রাবণের শেষাশেষি একদিন। হাওয়া-শূন্য স্তব্ধতায় বিস্তৃত ধানখেত নিথর। কোথাও একটু কম্পন নেই। আকাশে মেঘ নেই।

এমন দিনে লোকেরা ধানখেতে নৌকা নিয়ে বেরোয়। ডিঙিতে দুজন করে, সঙ্গে কোঁচ-জুতি। ধানখেতে নিঃশব্দতা, কোথাও একটা কাক আর্তনাদ করে উঠলে মনে হয় আকাশটা বুঝি চটের মতো চিরে গেল। অতি সন্তর্পণে ধানের ফাঁকে ফাঁকে তারা নৌকা চালায়। ঢেউ হয় না, শব্দ হয় না। গলুইয়ে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে এক জন, চোখে ধারালো দৃষ্টি। ধানের ফাঁকে ফাঁকে সে দৃষ্টি এঁকেবেঁকে চলে।

বিস্তৃত ধানখেতের একপ্রান্তে তাহের, কাদেরও আছে। তাহের দাঁড়িয়ে সামনে, চোখে তার যেন শিকারীর একাগ্রতা। পেছনে মূর্তির মতো বসে কাদের ভাইয়ের ইশারার অপেক্ষায় থাকে । দাঁড় বাইছে কিন্তু এমন কৌশলে যে, মনে হয় নিচে পানি নয়, তুলো।

হঠাৎ তাহের ঈষৎ কেঁপে উঠে মুহূর্তে শক্ত হয়ে যায়। সামনের পানে চেয়ে থেকেই আঙুল দিয়ে ইশারা করে। সামনে, বাঁয়ে আরও বাঁয়ে। সাবধান, আস্তে। তাহেরের আঙুল অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় এসব নির্দেশই দেয়।

ততক্ষণে সে পাশ থেকে আলগোছে কোঁচটা তুলে নিয়েছে। নিতে একটু শব্দ হয়নি। হয়নি তার প্রমাণ, ধানের শীষ এখনও ওখানে নড়ছে। তারপর কয়েকটি নিঃশ্বাসরুদ্ধ করা মুহূর্ত। দূরে যে-কটা নৌকা ধানখেতের ফাঁকে ফাঁকে এমনি নিঃশব্দে ভাসছিল সেগুলো থেমে যায়। লোকেরা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ধনুকের মতো টান হয়ে ওঠা তাহেরের কালো দেহটির পানে। তারপর দেখে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো সে কালো দেহটির ঊর্ধ্বাংশ কেঁপে উঠল, তীরের মতো বেরিয়ে গেল একটা কোঁচ। সা-ঝাক।

একটু পরে বৃহৎ একটা রুই মুখ হাঁ করে ভেসে ওঠে। আবার নৌকা চলে। ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে। এক সময় ঘুরতে ঘুরতে তাহেরদের নৌকা মতিগঞ্জের সড়কটার কাছে এসে পড়ে। কাদের পিছনে বসে তেমনি নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাহেরের পানে তার আঙুলের ইশারার জন্য। হঠাৎ এক সময় দেখে, তাহের সড়কপানে চেয়ে কী দেখছে। সেও সেদিক তাকায়। দেখে মতিগঞ্জের সড়কের ওপরেই একটি অপরিচিত লোক আকাশের পানে হাত তুলে মোনাজাতের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, শীর্ণ মুখে ক-গাছি দাড়ি, চোখ নিমীলিত, মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটে, লোকটির চেতনা নেই। নিরাক-পরা আকাশ যেন তাকে পথিকমূর্তিতে রূপান্তরিত করেছে।

কাদের আর তাহের অবাক হয়ে চেয়ে দেখে। মাছকে সতর্ক করে দেবার ভয়ে কথা কয় না। কিন্তু পাশেই একবার ধানের শিষ স্পষ্টভাবে নড়ে ওঠে, ঈষৎ আওয়াজ হয়, সেদিকে দৃষ্টি নেই।

এক সময়ে লোকটি মোনাজাত শেষ করে কিছুক্ষণ কী ভেবে ঝট করে পাশে নামিয়ে রাখা পুঁটলিটা তুলে নেয়। তারপর বড় বড় পা ফেলে উত্তর দিকে হাঁটতে থাকে। উত্তর দিকে খানিকটা এগিয়ে মহব্বতনগর গ্রাম। তাহের ও কাদেরের বাড়ি সেখানে।

অপরাহ্নের দিকে মাছ নিয়ে দু ভাই বাড়ি ফিরে দেখে খালেক ব্যাপারীর ঘরে কেমন একটা জটলা। সেখানে গ্রামের লোকেরা আছে, তাহেরের বাপও আছে। সকলের কেমন গম্ভীর ভাব, সবার মুখ চিন্তায় নত। ভেতরে উঁকি মেরে দেখে, একটু আলগা হয়ে বসে আছে সেই লোকটা। নৌকা থেকে মতিগঞ্জের সড়কের ওপর তখন তাকে মোনাজাত করতে দেখেছিল । রোগা লোক, বয়সের ভারে যেন চোয়াল দুটো উজ্জ্বল, চোখ বুজে আছে। কোটরাগত সে চোখে একটু কম্পন নেই।

এভাবেই মজিদের প্রবেশ হল মহব্বতনগর গ্রামে। শীর্ণ এ লোকটি চিৎকার করে গালাগালি করে লোকদের। খালেক ব্যাপারী ও মাতব্বর রেহান আলী ছিল। জোয়ানমতি, কালুমতি তারাও ছিল। কিন্তু লজ্জায় তাদের মাথা হেঁট । নবাগত লোকটির চোখে আগুন।

আপনারা জাহেল, বে এলেম, আনপড়াহ। মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখছেন? গ্রাম থেকে একটু বাইরে একটা বাঁশঝাড়। সে বাঁশঝাড়ের ক-গজ ওধারে একটা পরিত্যক্ত পুকুরের পাশে ঘন হয়ে আছে গাছপালা। তারই একধারে ভাঙা এক প্রাচীন কবর। ওরা কী করে জানবে যে, ওটা মোদাচ্ছের পীরের মাজার। সভায় অশীতিপর বৃদ্ধ সুলেমানের বাপও ছিল। হাঁপানি রোগী। সে দম খিঁচে লজ্জায় মাথা নত করে রাখে।

'আমি ছিলাম গারো পাহাড়ে।' মধুপুর গড় থেকে তিন দিনের পথ। মজিদ বলে যে, সেখানে সে সুখে শান্তিতেই ছিল। গোলাভরা ধান, গরুছাগল। তবে সেখানকার মানুষেরা কিন্তু অশিক্ষিত, বর্বর। তাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ খোদার আলো ছড়াবার জন্যই অমন বিদেশ বিভুঁইয়ে সে বসবাস করছিল। তারা বর্বর হলে কী হবে, দিল তাদের সাচ্চা, খাঁটি সোনার মতো। খোদা রসুলের ডাক একবার দিলে পৌঁছে দিতে পারলে তারা বেচইন হয়ে যায়। তা ছাড়া তাদের খাতির মমতার মধ্যে বেশ দিন কাটছিল। কিন্তু সে একদিন স্বপ্ন দেখে। সে স্বপ্নই তাকে নিয়ে এসেছে এত দূরে।

লোকেরা ইতোমধ্যে বারকয়েক শুনেছে সে কথা। তবু আবার উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

উনি একদিন স্বপ্নে ডেকে বললেন... বলতে বলতে মজিদের চোখ দুটো পানিতে ছাপিয়ে ওঠে।

জঙ্গাল সাফ হয়ে গেল। ইট সুরকি নিয়ে সেই প্রাচীন কবর নতুন দেহ ধারণ করল। ঝালরওয়ালা লালসালু দ্বারা আবৃত হল সে কবর। আগরবাতি গন্ধ ছড়াতে লাগল, মোমবাতি জ্বলতে লাগল রাতদিন।

এ গ্রাম সে গ্রাম থেকে লোকেরা আসতে লাগল। ক্রমে ক্রমে ঘরবাড়ি উঠল। বাহির ঘর, অন্দর ঘর, গোয়ালঘর, আওলাঘর। জমি হল, গৃহস্থালি হল। গ্রামের লোকেরা যেন চেনে জমি আর ধান। খোদার কথা নেই। স্মরণ করিয়ে দিলে আছে নচেৎ ভুল মেনে থাকে। জমিতে খরার দিনে ফাটল ধরলে তখন কেবল স্মরণ হয় খোদাকে।

কিন্তু জমি একাধারে উর্বর, চারা ছড়িয়েছে কি সোনা ফলবে। মানুষরাও পরিশ্রম করে, জমিও সে শ্রমের সম্মান দেয় বুক উজাড় করে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তারা খাটে। হয়তো কাঠফাটা রোদ, হয়তো মুষলধারে বৃষ্টি -তারা পরিশ্রম করে চলে। এত শ্রম এত কষ্ট তবু ভাগ্যের ঠিক-ঠিকানা নেই। মাঠের এক প্রান্তে একাকী দাঁড়িয়ে মজিদ দাঁত খেলাল করে আর সে কথাই ভাবে। কাতারে কাতারে সারবন্দি হয়ে মজুররা ধান কাটে আর বুক ফাটিয়ে গীত গায় ; তখন মজিদ দূরে দাঁড়িয়ে দেখে আর ভাবে, কিসের এত গান, এত আনন্দ? ওদের খোদার ভয় নেই? মজিদও চায় তার গোলা ভরে উঠুক ধানে। কিন্তু সে তো জমিকে ধন মনে করে না, আপন রক্তমাংসের সামিল খেয়াল করে না। জমায়েতকে মজিদ বলে, খোদাই রিজিক দেনেওয়ালা। শুনে সালু কাপড়ে ঢাকা কবরের পাশে তারা স্তব্ধ হয়ে যায়।

মজিদ বলে, মাঠভরা ধান দেখে যাদের মনে মাটির প্রতি পূজার ভাব জাগে, তারা ভূতপূজারী। তারা গুনাহ্‌গার। জমায়েত মাথা হেঁট করে থাকে।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রখ্যাত উপন্যাস 'লালসালু'র প্রথম দিকের অংশ থেকে 'লালসালু' গল্পটি সংকলিত হয়েছে।

মূলবক্তব্য

মহব্বতনগর গ্রামে একদিন মজিদ নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। সে বলে, এই গ্রামের ঘন ঝোপে আকীর্ণ একটি পরিত্যক্ত পুকুরের পাড়ে শ্যাওলা-ধরা যে প্রাচীন কবরটি রয়েছে তা মোদাচ্ছের পীরের। এরপর সেই কবরের সংস্কার হয় এবং কবরের ওপর লাল সালু কাপড় বিছিয়ে শুরু হয় মজিদের কবর ব্যবসা। এভাবেই গ্রামের সহজ সরল ধর্মপ্রাণ মানুষকে নানা সংস্কারের কথা বলে, ভয় দেখিয়ে মজিদের মতো লোকেরা নিজের আখের গুছিয়ে নেয়। লেখক এই সামাজিক সমস্যাকে 'লালসালু' উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন।

শব্দার্থ ও টীকা

স্তব্ধতা- নিশ্চলতা। **কোঁচ-জুতি**- মাছ মারার হাতিয়ার। **সন্তর্পণে**- সাবধানে। **নিমীলিত**- বোঁজা, মুদিত। **নিরাক-পড়া**- স্তব্ধ। **অপরাহ্ণ**- বিকেল। **জটলা**- ভিড়, বহু লোকের একত্রে জল্পনা। **হেঁট**- নিচু। **জাহেল**- মূর্খ। **বেএলেম**- জ্ঞানহীন। **আনপড়াহ**- যে লেখাপড়া জানে না, নিরক্ষর। **অশীতিপর**- আশির পর। **দিল**- হৃদয়। **সাচ্চা**- সত্য। **বেচইন**- অস্থির। **মুষলধারে**- প্রবলভাবে। **জমায়েত**- সমাবেশ। **রিজিক**- আহার্য। **ভূতপূজারী**- যারা ভূতকে বা কবরকে পূজা করে, পৌত্তলিক। **গুনাহ্গার**- পাপী।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

আপনারা জাহেল, বে এলেম, আনপড়াহ। মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখছেন? গ্রাম থেকে একটু বাইরে একটা বাঁশঝাড়। সে বাঁশঝাড়ের ক-গজ ওধারে একটা পরিত্যক্ত পুকুরের পাশে ঘন হয়ে আছে গাছপালা। তারই একধারে ভাঙা এক প্রাচীন কবর। ওরা কী করে জানবে যে, ওটা মোদাচ্ছের পীরের মাজার। সভায় অশীতিপর বৃদ্ধ সুলেমানের বাপও ছিল। হাঁপানি রোগী। সে দম খিঁচে লজ্জায় মাথা নত করে রাখে।

১. উল্লিখিত কথাগুলো কে বলেছে?

i. মজিদ ও মোদাচ্ছের
ii. তাহের
iii. মজিদ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii
গ. i ঘ. iii

২. গ্রামবাসীকে কেন জাহেল বলা হয়েছে?
   ক. পড়ালেখা জানে না
   খ. স্বাক্ষর করতে পারে না
   গ. পীরের মর্যাদা বোঝে না
   ঘ. একগুঁয়ে স্বভাবের

৩. 'অশীতিপর' শব্দটির অর্থ কী?
   ক. আশির পর
   খ. আশির কম
   গ. সত্তরের পর
   ঘ. ষাটের বেশি

৪. 'সে দম খিঁচে লজ্জায় মাথা নত করে রাখে।' —বৃদ্ধের লজ্জা কেন?
   ক. মজিদকে মর্যাদা না দেওয়া
   খ. মাজারের প্রতি অবহেলা
   গ. অশিক্ষিত বলে
   ঘ. হাঁপানি আছে বলে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

অপরাহ্ণের দিকে মাছ নিয়ে দু ভাই বাড়ি ফিরে দেখে খালেক ব্যাপারীর ঘরে কেমন একটা জটলা। সেখানে গ্রামের লোকেরা আছে, তাহেরের বাপও আছে। সকলের কেমন গম্ভীর ভাব, সবার মুখ চিন্তায় নত। ভেতরে উঁকি মেরে দেখে, একটু আলগা হয়ে বসে আছে সেই লোকটা। নৌকা থেকে মতিগঞ্জের সড়কের ওপর তখন তাকে মোনাজাত করতে দেখেছিল। রোগা লোক, বয়সের ভারে যেন চোয়াল দুটো উজ্জ্বল, চোখ বুজে আছে। কোটরাগত সে চোখে একটু কম্পন নেই।

   ক. উল্লিখিত দু ভাই কে কে?
   খ. 'সকলের কেমন গম্ভীর ভাব, সভার মুখ চিন্তায় নত।'-কথাটি বুঝিয়ে লেখ।
   গ. গ্রামবাসীর মনোভাবের আলোকে তোমার দেখা গ্রামীণ সরল ও ধর্মভীরু মানুষের সম্পর্ক নির্ণয় কর।
   ঘ. 'কোটরাগত সে চোখে একটু কম্পন নেই।' - মজিদ চরিত্রের আলোকে কথাটি বিশ্লেষণ কর।

মাতৃভাষা
মুনীর চৌধুরী

[লেখক পরিচিতি : মুনীর চৌধুরী ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর মানিকগঞ্জ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নোয়াখালি। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৭ সালে ইংরেজিতে এম.এ., ১৯৫৪ সালে কারাগার থেকে পরীক্ষা দিয়ে বাংলায় এম.এ. এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ সালে ভাষাতত্ত্বে এম.এ. পাশ করেন। চাকরি জীবনের প্রথম দিকে তিনি খুলনার দৌলতপুর কলেজে, ঢাকার জগন্নাথ কলেজে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপনা করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগদান করে ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। তিনি ৫২-র ভাষা আন্দোলনে কারাবরণ করেন। কৃতী অধ্যাপক, নাট্যকার, সমালোচক ও শ্রোতা-সম্মোহনকারী বক্তা হিসেবে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর রচিত ও অনূদিত নাটক : রক্তাক্ত প্রান্তর, চিঠি, কবর, রূপার কৌটা, মুখরা রমণী বশীকরণ; প্রবন্ধ গ্রন্থ : মীরমানস, তুলনামূলক সমালোচনা, বাংলা গদ্যরীতি ইত্যাদি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৪ই ডিসেম্বর তিনি স্বাধীনতা বিরোধী আলবদর বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা অপহৃত ও শহীদ হন।]

মাতৃভাষা সমাসবদ্ধ পদ। ব্যাকরণের নির্দেশ অনুযায়ী ষষ্ঠী তৎপুরুষ। অভিধানে অর্থ লেখা আছে স্বদেশের ভাষা। কিন্তু অভিধানের অর্থে সকলের চিত্ত সন্তুষ্ট হয় না। হওয়ার কথাও নয়। ভাষার স্বভাবই হল অস্পষ্ট থাকা, অন্তরাল সৃষ্টি করা, হরবোলার কৌতুকে মেতে ওঠা। ভাষা খেলা করে জিবের ডগায়, ঘোষিত হয় গলার মধ্য দিয়ে, প্রাণ লাভ করে ফুসফুস থেকে। এও বাইরের সত্য। আসলে ওর জন্ম বুকের মধ্যে, উৎস মানুষের মন। মন কি কোনো নিয়মের বশ হতে চায়? একই ভাষা একজনের মুখে মধু, অন্যজনের মুখে বিষ। সকাল বেলায় কলহের হাতিয়ার, দুপুরে কর্মের বাহন, অপরাহ্ণে শ্রান্তির, সন্ধ্যায় স্বপ্নের। আমার মাতৃভাষা বাংলা, মাত্র এইটুকু বললেই কি সবটা উত্তর সম্পূর্ণ হয়?

বিষয়ী লোকের বিবেচনাও কম বৈচিত্র্যপূর্ণ হয় না। আমার এক পরিচিত বুজর্গ আছেন। আপনাদেরও পরিচিত। তিনি নিজের মাতৃভাষাকে সবিশেষ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি সাফ জবাব দিয়েছেন যে, পন্ডিতের বাংলা তাঁর মাতৃভাষা নয়। একেবারে নির্জলা মায়ের বুলিই তাঁর মাতৃভাষা। মামার বাড়ির সকল আবদার আমারও খুব প্রিয়, কিন্তু তাই বলে মাতুলালয়ের ভাষাই আমার মাতৃভাষা এমন কথা স্বীকার করতে আমি নারাজ। আমি কি অপরাধী?

এক অধ্যাপক আছেন, তিনি তাঁর অঞ্চলের বুলির অকৃত্রিম ভক্ত। তিনি বই ছাপিয়ে প্রচার করেছেন যে, তাঁর দেশে বৃষকে বিরিষ বলে, অতএব তিনিও বিশুদ্ধ বাংলায় বৃষকে বিরিষরূপে লিখবেন ও বলবেন না কেন? যিনি বলবেন তিনি বলতে পারেন আমি বাধা দেবার কে? তবে আমার মাতৃভাষা বৃষভশক্তির হবে, এমন সম্ভাবনা অনিবার্য মনে করি না।

আমার এক বয়োকনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবী বন্ধু আছেন। মজলিসে বসলে অনায়াসে তার মধ্যমণি হয়ে থাকেন। সবাই সম্মোহিত হয়ে তাঁর কথা শোনেন। প্রতি কথায় যেমন ধার তেমনি ঝলক। প্রসঙ্গ, ব্যতিক্রমহীনভাবে পরনিন্দা। এমন নিঃস্বার্থভাবে, এরূপ অমোঘ বাক্যে, এরূপ অকাতরে তিনি অনুপস্থিত শত্রুমিত্র বিধ্বস্ত করতে থাকেন যে, শ্রোতৃমণ্ডলী মুহুর্মুহু পুলকিত বোধ না করে পারেন না। পরচর্চা আমার এই বন্ধুর আত্মার জারক, তার সত্তার নিশ্বাস, তার একান্ত নিজস্ব মাতৃভাষা হতে পারে।

আমার এক সহকর্মী আছেন। বাংলা ভাষা প্রচলনের সকল প্রয়াস পদে পদে উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত হতে দেখে তাঁর মনের প্রশান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। গুলি চলেছে ১৯৫২ তে, তারপর উনিশ বছর পার হয়ে গেছে। কই, বাংলাভাষা তো কোথাও প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। যেখানে যতটুকু পেরেছে তাও লোস্ট্র নিক্ষেপ ছাড়া সাধিত হয়নি। গোলাগুলি, কাঁদানে গ্যাস ও কারাবাস ছাড়া বাংলা ভাষাকে কেউ সূচ্যগ্র ভূমিও ছেড়ে দেয় নি। ধুতুরার বিষ কি মানুষের মনে অকারণে প্রবেশ করেছে? আমার সহকর্মী আজ তাই কোনো সুকোমল নির্বিষ বাংলা ভাষাকে নিজের মাতৃভাষা বলে জাহির করতে রাজি নন। তিনি আমাকেও বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, বাংলা ভাষার মঙ্গালের জন্যই আমাদের প্রত্যেকের মাতৃভাষা হওয়া উচিত ইষ্টক। মাতৃভাষার এই পরিণতির কথা আমরা কি পূর্বে কখনও ভাবতে পেরেছি?

হয়তো তাই। যার যা প্রাণের ভাষা, সেটাই তার মাতৃভাষা। কারও মাতৃভাষা খিস্তি, কারও মিছরি। আমি নিজেও এমন অনেককে জানি,যাদের মাতৃভাষা ঘরে আঞ্চলিক বুলি, অফিসে ইংরেজি, প্রণয় নিবেদনে বিশুদ্ধ বাংলা, রোষ প্রকাশে অশুদ্ধ উর্দু।

আমার মাতৃভাষা কী? বাংলা ভাষা। সমগ্র বাংলা ভাষা। বিচিত্ররূপিণী বাংলা ভাষা। অভিধানে আছে ষোড়শ রমণী মাতৃসম্বোধনযোগ্যা। শ্বশ্রূ থেকে তনয়া, গর্ভধারিণী থেকে পিতৃরমণী। ষোল নয়, আমার মাতৃভাষার ষোল শত রূপ। তারা সব পদ্মিনীর সহচরী। আমার মাতৃভাষা তিব্বতের গুহাচারী, মনসার দর্পচূর্ণকারী, আরাকানের রাজসভার মণিময় অলংকার, বরেন্দ্রভূমির বাউলের উদাস আহ্বান। মাইকেল-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল ইসলাম আমার মাতৃভাষা। আমার মাতৃভাষা বাংলা ভাষা।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'মাতৃভাষা' প্রবন্ধটি বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'মুনীর চৌধুরী' (রচনাবলি- ৩য় খণ্ড) থেকে সংকলিত।

মূলবক্তব্য

আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলার বহুমাত্রিক রূপবৈচিত্র্য তথা এর প্রায়োগিক, ভাষাতাত্ত্বিক, নান্দনিক ও প্রাত্যহিক ব্যবহারের বর্ণনা করা হয়েছে এ রচনায়। ভাষার ব্যবহার অভিধানসিদ্ধ শব্দের সীমানা ডিঙিয়ে নানা মাত্রায় বিকশিত হয়। শব্দের ও বাক্যের ব্যবহারনৈপুণ্যের ওপর নির্ভর করে এর বিকাশের ধারা। কারো কারো মধ্যে মাতৃভাষায় আঞ্চলিক বুলির অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কেউ বা ভাষাকে নিজের উপযোগী সামাজিকীকরণ করতে চান। কেউ বা ভাষাকে আপন অধিকারে এনে পরনিন্দা বা খিস্তি খেউড়েও ভরে তুলতে পারেন। কিন্তু সবসময় মনে রাখতে হবে, এ ভাষার একটা প্রমিত ও সুশৃঙ্খল সুন্দর রূপ আছে, নিয়মসিদ্ধ ব্যাকরণসম্মত গঠন আছে। সেভাবেই আমাদের চর্চা করতে হবে। আমাদের প্রিয় বাংলা ভাষা পৃথিবীর সমৃদ্ধ একটি ভাষা, ভাষা শব্দসম্পদ ও বাক্য-কলায় ধনী। এটি পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ভাষা। পৃথিবীর প্রায় ২২ কোটি লোক এ ভাষায় কথা বলে। এ ভাষা শতরূপিণী, চিরযৌবনবতী। কিন্তু বাঙালির সংগ্রাম ও সাহসে, রক্তস্রোত ও আন্দোলনে এটা যতটুকু এগিয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সে প্রতিষ্ঠা পায় নি। তবুও সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ও আমাদের সর্বপ্রকার আবেগ ও অনুভূতির ভাষা আমাদের মাতৃভাষা–বাংলা। এ ভাষার ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনেক প্রাচীন, এ ভাষার গৌরব স্বমহিমায় সুষমামণ্ডিত।

শব্দার্থ ও টীকা

হরবোলা- 'হর' শব্দের অর্থ প্রত্যেক, বিভিন্ন বা বিভিন্ন রকম। অর্থাৎ যে বিভিন্ন রকমের 'বুলি' বা ভাষা বলতে পারে।
ভাষা খেলা করে জিবের ডগায়- ভাষার উচ্চারণ বা ধ্বনির প্রকাশ ঘটে জিবের অগ্রভাগের সাহয্যে। আঞ্চলিক বুলিই হোক বা প্রমিত ভাষাই হোক জিবের ডগা থেকেই ভাষা আসে। চলিত প্রমিত ভাষা প্রয়োগের প্রধান প্রবক্তা বাংলা ভাষার প্রখ্যাত লেখক প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্য ছিল এরূপ, 'ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে নয়।' তিনি কথ্য ভাষার প্রায়োগিক দিকের উপযোগিতার কথা বলতে গিয়ে এ উক্তি করেছিলেন। আমাদের দৈনন্দিন আলাপচারিতা, কথাবার্তা, সবরকমের প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের বাক্যালাপ, প্রেম-ভালোবাসা, ঝগড়া-বিবাদ, পরনিন্দা সর্বপ্রকার ভাষার প্রয়োগ ঘটে মুখের ভাষায়, এবং তা জিবের ডগা দিয়েই উথলে পড়ে।

বুজর্গ (ফারসি শব্দ)- সম্মানিত। এখানে 'বুজর্গ' বলতে এমন একজনকে বোঝানো হয়েছে যিনি টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষাকেই তাঁর মাতৃভাষা বলে মনে করতেন এবং এই ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, তৎসম ও তদ্ভব শব্দের প্রাধান্য সংবলিত বাংলা ভাষা তিনি ব্যবহার করবেন না। তিনি মনে করেন, এরূপ ভাষা পণ্ডিতের ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা-জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের ভাষা।

মাতুলালয়ের ভাষা- যারা ভিন্ন ভাষার মিশেল দেওয়া বাংলা বা পরিশীলিত লৌকিক ভাষাকে মাতৃভাষারূপে প্রয়োগের পক্ষপাতী, তাদের প্রতি কিছুটা ব্যঙ্গ রসাত্মক ভাষায় লেখক এ উক্তি করেছেন। তাঁর মতে মাতুলালয়ের ভাষা মামার বাড়ির ভাষা, মাতৃভাষা নয়।

এক অধ্যাপক আছেন- এখানে ইঙ্গিতে এমন একজনের কথা বলা হয়েছে, যিনি বাংলা ভাষা প্রচলনের লক্ষ্যে অনেক উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন এক ধরনের 'সহজ বাংলা' প্রচলনের পক্ষপাতী, যা বাংলা ভাষার ধারাবাহিকতা ও প্রাণশক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। তাঁর 'সহজ বাংলা' শেষ পর্যন্ত গ্রাহ্য হয়নি, টেকেনি। তিনি প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত চট্টগ্রামের আঞ্চলিক শব্দ 'বিরিষ' (বৃষ)-কে শুদ্ধ ও প্রমিত বাংলায় ব্যবহার করতে চেয়েছেন। বৃষকে বিরিষরূপে ব্যবহার করার এ প্রবণতাকে লেখক বৃষভশক্তি অর্থাৎ ষাঁড়ের শক্তির বহিঃপ্রকাশ বলে কঠোরভাবে ব্যঙ্গ করেছেন।

সম্মোহিত- মুগ্ধ, মোহিত। **পুলকিত**- আনন্দিত, খুশি।

বয়োকনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবী- এখানে এক কৃতী শিক্ষক ও সাহিত্যিকের কথা বলা হয়েছে। অসাধারণ বাচনভঙ্গির জন্য তাঁর বক্তব্য সবসময়ে আকর্ষণীয় হত।

উনিশ বছর পার হয়ে গেছে- এ রচনাটি ভাষা আন্দোলনের ১৯ বছর পর ১৯৭১ সালের গোড়ার দিকে লেখা। তাই উনিশ বছর পার হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

লোষ্ট্র- ঢিল। শক্ত মাটি, ইট, পাথর প্রভৃতির টুকরো।

ষোড়শ রমণী মাতৃসম্বোধনীযোগ্যা- ষোল প্রকার নারীকে মা-রূপে সম্বোধন করা যায়। এতে আমাদের মাতৃভাষার শব্দ ভাণ্ডারের সমৃদ্ধিকেই বোঝানো হয়েছে।

পদ্মিনীর সহচরী- লেখক বাংলা ভাষার বৈচিত্র্য ও এর ব্যাপকতর সুন্দর রূপকে বোঝানোর জন্য বলেছেন পদ্মিনীর সহচরী, অর্থাৎ সুন্দরী সঙ্গিনীদের মতো বাংলা ভাষারও রয়েছে সৌন্দর্যমণ্ডিত ষোলশত রূপ।

তিব্বতের গুহাচরী- বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় নেপালের রাজদরবারে। বৌদ্ধ সাধকদের লেখা এসব গানের তিব্বতী অনুবাদও হয়েছিল। এইসূত্রে বাংলা ভাষাকে তিব্বতের গুহাচারী বলা হয়েছে।

মনসার দর্পচূর্ণকারী- চাঁদ সদাগর সর্পদেবী মনসার অহংকার চূর্ণ করেছিলেন। এ নিয়ে বাংলায় অনেক কাব্য আছে। এখানে প্রকারান্তরে বলা হয়েছে যে, বাংলা ভাষার বিরোধীদের দর্প শেষ পর্যন্ত চূর্ণ হয়েছিল।

আরাকানের রাজসভার মণিময় অলংকার- সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান (আরাকান বলতে তখন বৃহত্তর চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল ও বার্মার অংশবিশেষ বোঝাতো) রাজসভায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হত। এই আরাকান রাজসভাতেই মাগনঠাকুরের আনুকূল্যে কবি আলাওল বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা ও কাব্যানুবাদ করে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেন।

বরেন্দ্রভূমির বাউলের উদাত্ত আহ্বান- নানা ধর্মতত্ত্বের মিশ্রণে বাউল মতবাদ গড়ে ওঠে। সেই মতের প্রকাশ দেখা দেয় বাউল গনে। এই গীতধারার মহৎ সাধক লালন ফকির এবং আরও কয়েকজন কবি বরেন্দ্র অঞ্চলে সাধনা করতেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'মাতৃভাষা' প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য-

ক. মাতৃভাষার বহুমাত্রিক রূপ ব্যাখ্যা করা
খ. মাতৃভাষার প্রায়োগিক দিক ব্যাখ্যা করা
গ. মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধের পরিচয় দান
ঘ. মাতৃভাষার উদ্ভব ও বিকাশের তথ্যপ্রদান

২. 'আসলে ওর জন্ম বুকের মধ্যে, উৎস মানুষের মন'- মন্তব্যটির অর্থ কী ?

i. ভাষা ভাব প্রকাশের মাধ্যম
ii. ভাষার নান্দনিক শক্তি আছে
iii. ভাষা ব্যক্তির অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. iii

৩. 'কই, বাংলাভাষা তো কোথাও প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি'-বাক্যটিতে ফুটে উঠেছে লেখকের-

ক. আক্ষেপ ও দুঃখবোধ
খ. আবেগ ও আনন্দ
গ. অভিযোগ ও সংকীর্ণতা
ঘ. বিদ্রোহ ও আবেগ

৪. মুনীর চৌধুরীকে হত্যা করেছিল কারা?

ক. রাজাকার
খ. আলবদর
গ. আলসামস
ঘ. পাকবাহিনী

সৃজনশীল প্রশ্ন

অনুচ্ছেদ পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর জবাব দাও :

ভাষার ব্যবহার বিচিত্ররূপিনী। মানসিক, সামাজিক ও পরিবেশগত কারণে এই তারতম্য ঘটে থাকে। ভাষাকে কেউ ব্যবহার করেন পরচর্চা, পরনিন্দার প্রয়োজনে, কেউবা আপনজনের কাছে ভালোবাসার কথা জানাতে। বাংলাভাষা আমাদের মাতৃভাষা। এ ভাষা বাংলার ভাষা।

ক. 'মাতৃভাষা' শব্দের অভিধানিক অর্থ কী?
খ. বাংলাভাষাকে বিচিত্ররূপিণী বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকে মাতৃভাষার ব্যবহার বৈচিত্র্যের যে কারণগুলোর কথা বলা হয়েছে তা তোমার পঠিত 'মাতৃভাষা' প্রবন্ধ অবলম্বনে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মাতৃভাষার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর।

মহাপতঙ্গ
আবু ইসহাক

[লেখক পরিচিতি : আবু ইসহাক ১৯২৬ সালের ১লা নভেম্বর শরিয়তপুর জেলার শিরঙ্গাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিক ও ১৯৪৪ সালে আই,এ, পাশ করার পরই সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করেন। ১৯৬০ সালে তিনি করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৮৩ সালে চাকরি থেকে অবসরগ্রহণ করেন। সাহিত্য সাধনায় তিনি স্বীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি গ্রামবাংলার চিত্র এবং সেখানকার সমস্যা অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন। এদিক থেকে তাঁর ' সূর্যদীঘল বাড়ি' উপন্যাসটিকে বাস্তব জীবনের সার্থক চিত্রণের উজ্জ্বল নিদর্শন হিসাবে বিবেচনা করা যায়। 'সূর্যদীঘল বাড়ি' উপন্যাসটি আমাদের সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। উপন্যাস–সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি ১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো : সূর্যদীঘল বাড়ি, হারেম , মহাপতঙ্গ, পদ্মার পলিদ্বীপ ইত্যাদি। আবু ইসহাক ২০০৩ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন]

ছোট এক শহরের ছোট এক বাড়ি। সেই বাড়ির উত্তর দিকের দেওয়ালের ফোকরে থাকত একজোড়া চড়ুই পাখি। একদিন কুড়িয়ে খেতে মাঠে গিয়েছিল ওরা, হঠাৎ কেমন অদ্ভুত শব্দ শুনে ওরা সচকিত হয়ে ওঠে। মাথা তুলে একে অন্যের দিকে তাকায়।

দূর থেকে বোঁ-বোঁ শব্দ ভেসে আসছে।

চড়ুই দুটো ভয় পায়। ফুড়ুৎ করে ওরা গাছের ডালে গিয়ে বসে। শব্দ ক্রমেই বাড়ছে। চারদিকের পাখপাখালি উর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে। চড়ুই পাখি দুটো পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারে। দূর দিগন্ত থেকে প্রকাণ্ড একটি কী এদিকেই উড়ে আসছে। ভয়ে ওরা ঘন পাতার ভেতর লুকিয়ে পড়ে। ভয়ঙ্কর বোঁ-বোঁ আওয়াজ করতে করতে ওদের মাথার ওপর দিয়েই ওটা চলে যায়।

বুক দুরু দুরু করে দুটোরই । কিছুক্ষণ পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে চড়ুই ওর সঙ্গিনীকে বলে,

-চিনতে পেরেছ তো ?

-উঁহু।

-আরে! বাবা তো এটার কেচ্ছাই শুনিয়েছিল একদিন, মনে নেই?

-অহ হো, মহাপতঙ্গ?

-হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই।

চড়ুই পাখি দুটোর শিশুকালের কথা। পুরাতন এক বাড়ির দেওয়ালের ফোকরে ছিল ওদের মা-বাবার নীড়। মা-বাবার ডানার মধ্যে মুখ লুকিয়ে ওরা তখন রাক্ষস-খোক্ষস আর দেও-দুরাচারের কেচ্ছা শুনত। ছোঁ-রাক্ষস, ম্যাও- খোক্ষস, কুড়লী-ফোঁসফোঁস ও কা-ভক্ষুসের কথাই বেশি করে বলত মা-বাবা। কারণ এগুলোই ওদের প্রধান শত্রু।

এক অন্ধকার রাতে মা ছোঁ-রাক্ষসের গল্প বলছিল। ছোঁ-রাক্ষস আমাদেরই মতো পাখাওয়ালা আকাশচারী জীব। ওদের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ। ওরা মটির দিকে চোখ রেখে আকাশে ভেসে বেড়ায়, সুযোগ পেলে চোখের পলকে ছোঁ মেরে বাঁকা নখে বিঁধিয়ে ধরে নিয়ে যায়। তারপর গাছে বসে ঠোকর মেরে চোখ খায়, বুক খায়, কলজে খায়।

ছানা দুটো ভয়ে ওদের মার ডানার মধ্যে মুখ লুকায়। জোছনা উঠলে ওদের ভয় কমে। তখন নর-ছানাটা শুধায়,

–আচ্ছা মা, সবচেয়ে বড় পাখি কোনটা?

-তোর বাপকে জিজ্ঞেস কর। উনি দেখেছেন। বল না গো, সেই বড় পাখির গল্পটা।

-হ্যাঁ বলছি। অনেক আগে। আমরা তখন ছিলাম অনাবৃষ্টির দেশে। তোদের মা ডিমে তা দিচ্ছিল। আমি গিয়েছিলাম কুড়িয়ে খেতে। হঠাৎ শুনি বিকট শব্দ। চেয়ে দেখি অতি প্রকাণ্ড এক পাখি বোঁ-বোঁ আওয়াজ তুলে উড়ে যাচ্ছে। উড়ে যাচ্ছে অনেক দূর দিয়ে- আকাশ যেখানে গাছের মাথায় ঠেকেছে সেখান দিয়ে। এত বড় বিরাট পাখি আর কখনও দেখিনি।

-এটা কি ছোঁ -রাক্ষসের মতো ছোঁ মারে? মাদি ছানাটা রীতিমতো কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

-তা তো দেখিনি, মা। ঐ একদিনই দেখেছি ওটা। ওটা দেখতে? ইতস্তত করে চড়ুই। -হ্যাঁ, ওটা দেখতে অনেকটা ফড়িং-এর মতো। লেজ-লম্বা ফড়িং দেখেছিস তো? ঐ যে বৃষ্টির দিনে একটা মেরে এনে তোদের খাইয়েছিলাম।

-হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছি। দুটো ছানাই বলে।

-সেই ফড়িং-এর মতো পাখা আর লম্বা লেজ। সে এক মহাপতঙ্গা। কত যে বড়, না দেখলে বোঝা যাবে না।

বোঁ-বোঁ শব্দ করে উড়ে বেড়ায়।

পিতার বর্ণনার সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে। আজকের এ আকাশচারী জীবটা মহাপতঙ্গা না হয়ে যায় না।

পক্ষিরাজ্য ভীত - সন্ত্রস্ত। এরকম পাখি এর আগে কেউ কখনও দেখেনি এ দেশে। গাছে গাছে পাখিদের জরুরি সভা বসে।

এক পাখি বলে, ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমার মনে হয় এটা শস্যভোজী। মাংসভোজী রাক্ষস নয়। প্রতিবাদ করে অন্য পাখি বলে, না, না, এটা নিশ্চয় রাক্ষস পাখি। রাগের চোটে কেমন বোঁ-বোঁ করছিল।

আর এক পাখি সমর্থন করে বলে, ঠিকই, এটা রাক্ষস পাখি। তর্জন-গর্জন শুনেও বুঝতে পার না তোমরা? এটা খপাখপ ধরবে আর টপাটপ গিলবে। যদি বাঁচতে চাও, তবে এ দেশ ছেড়ে পালাও।

পালিয়ে যায় অনেক পাখিই। বেশির ভাগ যায় অনাবৃষ্টির দেশে। চড়ুই পাখি দুটো কিন্তু দেশ ছাড়ে না। কারণ ঘনবৃষ্টির দেশে ঝড়-বৃষ্টিতে কষ্ট হলেও পেট ভরে খেতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া, এ মহাপতঙ্গা অনাবৃষ্টির দেশেও দেখা দিয়েছে। ওদের জনক স্বচক্ষে দেখেই গল্প বলেছিল। চড়ুই দম্পতি তুলো, পালক, শুকনো খড় ঠোঁটে করে ফোকরে এনে জমা করে। সাজিয়ে গুজিয়ে সেখানে নীড় রচনা করে। বাড়ির বাসিন্দা দোপেয়ে দৈত্য ওদের দেখে খুশি হয়। স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের ডেকে বলে, লক্ষণ শুভ। ঐ দেখো, চড়ুই পাখি বাসা বাঁধছে। এগুলো ভালো দেখে আসে, মন্দ দেখে চলে যায়। এ বছরটা সুখে-শান্তিতে কাটবে।

কিন্তু সুখে-শান্তিতে দিন কাটে না। বন্যায় দেশ ডুবে যায়। দিন দিন পানি বাড়তে থকে। বাড়ির মালিক দোপেয়ে দৈত্য এবং আর অনেকে দেশ ছেড়ে চলে যায়। যারা যেতে পারে না, তারা প্রাণের দায়ে বাড়ির ছাদে, ঘরের চালে, গাছের ডালে উঠে হা-হুতাশ করে। চড়ুই পাখি দুটোরও দুর্দশার অন্ত নেই। ওদের প্রতিবেশী চড়ুই পাখিগুলো অনেকেই দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। কিন্তু ওদের পালাবার উপায় নেই। বাসায় রয়েছে কলজের টুকরো দুটো কচি ছানা। ওদের ফেলে আর যাওয়া যায় না।

এমন দুঃসময়ে বোঁ-বোঁ আওয়াজ তুলে আসে এক মহাপতঙ্গা। চড়ুই দুটো উঁচু গাছের ডালে ঘন পাতার আড়ালে বসে চেয়ে দেখে। মহাপতঙ্গাটা কয়েক পাক ঘুরে একটা জলা মাঠে নামে।

দোপেয়ে দৈত্যরা হৈ-হৈ শুরু করে দেয়। মহাপতঙ্গাটা সাঁতার কেটে একটা বড় বাড়ির ছাদে সিঁড়ির কাছে গিয়ে থামে। কী অবাক কাণ্ড! একটা দোপেয়ে দৈত্য মহাপতঙ্গোর পেট থেকে বেরিয়ে আসে। তার আহ্বানে এক এক করে একপাল দোপেয়ে দৈত্য মহাপতঙ্গোর পেটের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ওটা এবার বোঁ-বোঁ ডাক দিতে দিতে আকাশে ওঠে। দুপাক ঘুরে সোজা সূর্যাস্তের দিকে চলে যায়।

ঐ দিন আরও কয়েকবার মহাপতঙ্গা আসে। বাড়ির ছাদে, ঘরের চালে, গাছের ডালে ছিল যেসব দোপেয়ে দৈত্য তাদের পেটে পুরে কোথায় উধাও হয়ে যায়।

চড়ুই পাখি দুটোর বিস্ময়ের সীমা নেই। রাতে বাসায় বসে স্ত্রী চড়ুই বলে,

-দোপেয়ে দৈত্যরা তো যেমন তেমন টেটন নয়।

-হ্যাঁ, জবর টেটন। পুরুষ চড়ুই বলে, ওরা মহাপতঙ্গাকেও দেখছি পোষ মানিয়েছে।

-সত্যি, ওদের বুদ্ধি-কৌশলের তারিফ করতে হয়।

-কেন, মা? বুকের তলা থেকে নর-ছানাটা জিজ্ঞেস করে।

-হ্যাঁরে, হ্যাঁ। বড় হয়ে যখন বাইরে যাবি তখন দেখতে পাবি। হাম্বা-হাম্বা, ভ্যাঁ-ভোম্বল, ঘেঁউ পা-চাটা, কুক্কুরুত, প্যাঁক-টেটে, ম্যাও-খোক্কস, শুশুধর, চিহিঁ-টগবগ আরও কত জীব-জানোয়ারকে যে ওরা পোষ মানিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

-এই হাম্বা-হাম্বার অবস্থা দেখে আমার হাসিও পায়, দুঃখও লাগে। পুরুষ চড়ুই বলে, বেচারাকে নানান কাজে খাটিয়ে তো মারেই, উপরন্তু ওর পেটের নিচের ঝুলেপড়া চামড়া টেনে টিপে সাদা রস বের করে করে দোপেয়ে দৈত্যরা নিজেদের গলা ভেজায়।

স্ত্রী চড়ুই হেসে বলে, আবার দেখো, বিরাটকায় শুশুধর, চিহিঁ-টগবগ- ওদের পিঠে চড়ে কেমন মনের সুখে ঘুরে বেড়ায়।

- এতেও সাধ মেটেনি। এবার মহাপতঙ্গের পেটের মধ্যে জায়গা করেছে। দল বেঁধে ওর পেটের মধ্যে বসে এখন মহানন্দে আকাশে পাড়ি জমাতে শুরু করেছে।

স্ত্রী চড়ুই বলে, এবার দোপেয়ে দৈত্যরা কিন্তু ভারি বিপদে পড়েছিল। মহাপতঙ্গাকে পোষ মানিয়েছিল তাই রক্ষা।

কিছুদিন পরে পানি শুকিয়ে যায়। দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল যে সব দোপেয়ে দৈত্য তারা দেশে ফিরে আসে। কিন্তু দেশে খাবার নেই। খেতের ফসল ভেসে গেছে বন্যায়। চারদিকে হাহাকার। চড়ুই পাখি দুটোরও দুর্দশার অন্ত নেই। বন্যার সময় দোপেয়ে দৈত্যরা বাড়ির ছাদে যেসব খাদ্যশস্য ফেলে গিয়েছিল তাই কাড়াকাড়ি করে খেয়ে এতদিন চলেছে। কিন্তু এখন দুটো ঘাসের দানাও কুড়িয়ে পাওয়া যায় না। এই দুর্দিনে আবার পেটে দুরন্ত ক্ষুধা নিয়ে দুটো নতুন ঠোঁটের আবির্ভাব হয়েছে। ক্ষুধার জ্বালায় সেগুলো খালি ট্যাঁও ট্যাঁও করে। বাসায় ঢুকবার সাথে সাথে ঠোঁট ফাঁক করে এগিয়ে আসে আ-দে-দে-দে।

চড়ুই পাখি দুটো মাঠে খাবার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। এমন দিনে আবার শব্দ শোনা যায়, বোঁ-বোঁ-বোঁ।

মহাপতঙ্গা এসে মাঠে নামে। দোপেয়ে দৈত্যরা তার পেট থেকে বস্তা বস্তা কী সব নামিয়ে নেয়। এটা উড়ে চলে গেলে আর একটা মহাপতঙ্গা আসে। তারপর আরেকটা- আরও কয়েকটা । সবগুলোই বস্তা বস্তা কী সব দিয়ে চলে যায়। চড়ুই দুটোর কৌতূহল জাগে। ফুড়ুৎ লাফ দিয়ে ওরা এগিয়ে যায়। কাছাকাছি গিয়ে দেখে ওদের স্বজাতি কয়েকটা গিয়ে হাজির হয়েছে ওখানে। খুঁটে খুঁটে কী যেন খাচ্ছে।

ফুড়ুৎ করে উড়ে ওরাও ছুটে যায়।

কী আশ্চর্য! খাবার দিয়ে গেছে মহাপতঙ্গা ক্ষুধার খাবার। আনন্দ! আনন্দ! কী আনন্দ! বস্তা থেকে ঝরে পড়ছে কত খাবার।

দুটো ঠেসে পেট পুরে খায়। বাসায় ফিরে বাচ্চা দুটোকে খাওয়ায়। আঃ কী শান্তি!

অনেক দিন পরে আজ চড়ুই দম্পতি খোশ মেজাজে গল্প করে। গল্প ঠিক নয়। দোপেয়ে দৈত্যের গুণকীর্তন।

পুরুষ চড়ুই বলে, দোপেয়ে দৈত্য সমস্ত দুঃখ-শান্তি দূর করতে পারে। ওরা ইচ্ছে করলে আরও সুন্দর করতে পারে পৃথিবীকে।

- হ্যাঁ, তা পারে। ওরা যদি করে পণ, করে দুঃখ বিমোচন। স্ত্রী চড়ুইটা কৃতজ্ঞতায় গানই জুড়ে দেয়। ওর সঙ্গীও যোগ দেয় সে গানে। ছানা দুটো মুগ্ধ হয়ে শোনে।

মহাপতঙ্গা যে খাদ্যশস্য দিয়ে যায়, সেগুলো দোপেয়ে দৈত্যদের ঘরে ঘরে আসে। দেয়ালের ফোকরে আবার চড়ুই দম্পতির সুখের ঘরকন্না চলে। স্ত্রী চড়ুই জোড়া ডিম পাড়ে। দুটিতে পালা করে তা দেয়। জোড়া জোড়া বাচ্চা ফোটে। সারাদিন ধরে শস্যকণা কীট-পতঙ্গা কুড়িয়ে এনে বাচ্চাদের ঠোঁটে ঢুকিয়ে খাওয়ায়। ওরা বড় হয়ে ওঠে। ওদের কাছে ছোঁ- রাক্ষস, ম্যাও-খোক্ষস, কুন্ডলী-ফোঁস ফোঁস ও রাক্ষুসের কেচ্ছা বলে । এসব রাক্ষস-খোক্ষস ও দেও-দুরাচারের কেচ্ছা শুনে বাচ্চাগুলো মুষড়ে পড়ে। তখন ওরা সুন্দর পৃথিবীর গল্প শুরু করে দেয়। রং-রসের বৈচিত্র্যে প্রাণবন্ত এ পৃথিবী। পানি আর বাতাসের প্রাচুর্যে প্রাণবন্ত পৃথিবী। ফুল-ফল-শস্যের সম্ভারে সমৃদ্ধ এ পৃথিবী। দুঃখের তুলনায় অনেক সুখ এখানে। গল্পে গল্পে দোপেয়ে দৈত্যের প্রসঙ্গা এসে যায়। এদের বুদ্ধি, কৌশল ও গুণ হেকমতের অনেক গল্প চলে। তারপর চলে মহাপতঙ্গোর গল্প। বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সময় কত মহান কাজ করেছে এগুলো।

এভাবে দিন যায়। মাস পেরোয়। বছর ঘোরে। একদিন ভোর বেলা। উড়ু উড়ু বাচ্চা দুটোকে খেলার ছলে আত্মরক্ষার নানা কৌশল শিখিয়ে দিচ্ছিল পাখি দুটো। হঠাৎ স্ত্রী চড়ুই বলে ওঠে , ঐ যে শব্দ । মহাপতঙ্গা আসছে।

-হ্যাঁ, তাই তো! মহাপতঙ্গাই আসছে। পুরুষ চড়ুই বলে, এবার আবার কী নিয়ে এল?

-নিশ্চয়ই ভালো খাবার-টাবার নিয়ে এসেছে। চল না দেখে আসি।

-আমরাও যাব, মা। ছানা দুটো আবদার করে।

-না রে, না। তোরা এখনও ভালো করে উড়তে পারিসনে। আমরা গিয়ে দেখে আসি।

-আমাদের ভয় করবে যে। মাদি ছানাটা বলে।

-ভয়! দিনে-দুপুরে আবার কিসের ভয়?

ম্যাও-খোক্ষস আসে যদি?

—দূর বোকা! ম্যাও-খোক্ষস এ দেয়াল বেয়ে উঠতেই পারবে না।

-কুন্ডলী-ফোঁস ফোঁস যদি আসে?

উহু, কুন্ডলী-ফোঁস ফোঁস এ খাড়া দেয়াল বেয়ে উঠতে পারবে না। তোরা বড় হয়ে এরকম জায়গা বেছে নিয়ে বাসা বাঁধবি। এ রকম জায়গায় যদি আসে তো কা-ভক্ষুস পারে।

-কা-ভক্ষুস!

বাচ্চা দুটো ভয়ে শিউরে ওঠে। ওদের মা বুঝতে পেরে বলে, থাক সে কথা, আমি ওদের কাছে থাকি। তুমিই গিয়ে দেখে এসো।

—আচ্ছা, তুমি থাক ওদের নিয়ে। আমি গিয়ে দেখে আসি। মহাপতঙ্গা খাবার নিয়ে এলে তোমাদের জন্য টোপলা ভরে নিয়ে আসব। পুরুষ চড়ুই ঢেউয়ের তালে নাচতে নাচতে উড়ে যায়।

মহাপতঙ্গা ঠিকই। আর এসেছে একটা নয়, এক জোড়া নয়, পাঁচ জোড়া। চড়ুই খুশি হয়। অনেক খাবার নিয়ে এসেছে নিশ্চয়।

চোওঁ করে একটা মহাপতঙ্গা নেমে যায় অনেক নিচে।

একি! ছোঁ মারবে নাকি? ঐ তো উপর দিকে উঠছে আবার, কিন্তু ওটার পেট থেকে পড়ছে কী ও?

চড়ুই ভাবে, নিশ্চয়ই ডিম। বা রে বা, বড় পাখির বড় রং, আন্ডা পাড়ার দেখ ঢং।

বুম-ম্ -ম্-

প্রচন্ড শব্দে মূর্ছা যায় চড়ুই পাখি। ঘুরতে ঘুরতে সে একটা ঝোপের ওপর পড়ে।

বেলা যখন গড়িয়ে যায় তখন জ্ঞান ফিরে আসে। কিন্তু শরীরে এতটুকু বল নেই। সে চোখ মেলে। ঝোপের ওপর কাত হয়ে শুয়েই সে মিটমিট করে তাকায় এদিক-ওদিক।

এ কোথায় সে? কেমন করে সে এল এখানে, এই ঝোপের ওপর? কী হয়েছিল তার?

চড়ুইটি প্রথমে কিছুই মনে করতে পারে না।

অনেকক্ষণ ধরে ঘটনাটা মনে করার চেষ্টা করে সে। তারপর আস্তে আস্তে সব মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে আর বিস্ময় জাগে- ডিমটা বুঝি ফেটেই গেছে। তাই তো এমন শব্দ। বড় পাখির বড় ডিম। এরকম শব্দ তো হবেই। চড়ুই ভাবে কিন্তু এভাবে ডিম পেড়ে লাভটা কী? মাটিতে পড়ে ফেটেই তো গেল, তা দিয়ে বাচ্চা ফোটাতে পারল না আমাদের মতো।

বাচ্চা ফোটানোর কথা ভাবতে গিয়ে নিজের বাচ্চা দুটোর কথা মনে পড়ে যায় তার। বাচ্চা দুটো নিয়ে স্ত্রী সেই সকাল থেকে ওর পথ চেয়ে বসে আছে। ক্ষুধার জ্বালায় কত না জানি কষ্ট পাচ্ছে ওরা। কিন্তু একটা দানাও যে যোগাড় হয়নি। কী ব্যাপারটাই না ঘটে গেল। ওরা কি শুনতে পেয়েছে ডিম ফাটার শব্দ?

চড়ুই কোনোরকমে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। ফুড়ুৎ করে সে উড়াল দেয়। হঠাৎ নিচে চোখ পড়ে চড়ুই পাখির। পথ ভুল হল নাকি। চড়ুই চমকে ওঠে, কোন পথে এল সে? এরকম দেখাচ্ছে কেন? না, পথ ভুল হবার কথা তো নয়।

তালগাছ ডানে রেখে দুই আমগাছের ফাঁক দিয়েই তো এসেছে সে। কিন্তু আভা রঙের উঁচু বাড়িটা কোথায় গেল? ঐ দিকে নারকেলের গাছটা তো ঠিকই আছে।

চড়ুই উড়ে যায় দুদিকে নিশানা ঠিক রেখে। কিন্তু সব নিশানা পাওয়া যাচ্ছে না। ঐ যে তেঁতুল গাছ। কিন্তু ওটার এমন ছিন্ন-ভিন্ন চেহারা কেন? কিছু ভেবে পায় না চড়ুই। যাকগে, আর একটু গেলেই কাউন রঙের বাড়িটা।

কিন্তু কোথায় সে কাউন রঙের বাড়ি?

চড়ুই পাখির বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ করে ওঠে। নিচে চেয়ে দেখে ধ্বংসস্তূপ। লণ্ডভণ্ড সব। সে চিৎকার করে ওঠে। স্ত্রীর নাম ধরে ডাকে। বাচ্চা দুটোর নাম ধরে ডাকে। কিন্তু সে ডাক ফিরে আসে প্রতিধ্বনি হয়ে।

ইটের ফাঁকে ফাঁকে খোঁজে চড়ুইটি। কিন্তু কোনো চিহ্ন নেই তার স্ত্রী আর বাচ্চা দুটোর। শুধু এক জায়গায় মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে বাড়ির বাসিন্দা দোপেয়ে দৈত্য।

ব্যথায় ছটফট করে চড়ুই। ডানা ঝাপটায়। ঠোঁট দিয়ে বুকের পালক কাটে। বিলাপ করতে করতে সঙ্গিনী ও ছানা দুটোর কত কথাই না ইনিয়ে বিনিয়ে বলে যায়।

নিঃসঙ্গ এক চড়ুই পাখিকে প্রায়ই দেখা যায় জানালার ধারে, রেলিং-এর ওপর। ঘৃণার স্বরে সে ডেকে যায়,

ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

এ ছিঃ ছিঃ কিসের জন্য? এ ধিক্কার কাদের জন্য? এ নিশ্চয় তাদের জন্য যারা ডিম্ববতী মহাপতঙ্গিনীর পেটে চড়ে উড়ে বেড়ায়, আর অশান্তি ডেকে আনে।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

মহাপতঙ্গা গল্পটি লেখক আবু ইসহাকের 'মহাপতঙ্গা' গল্পগ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

মূলবক্তব্য

মহাপতঙ্গা একটি রূপক গল্প। ফড়িং-এর মতো বিরাটকায় যে পতঙ্গা বা মহাকায়াবিশিষ্ট পাখির কথা বলা হয়েছে, এটা আসলে আধুনিক সভ্যতার একটি প্রধান আবিষ্কার উড়োজাহাজ বা বিমান। সভ্যতার বিকাশে অনেক আবিষ্কারের মধ্যে এ আবিষ্কারটিও মানুষের কল্যাণ ও অকল্যাণ দুই-ই বয়ে আনে। দেশে যখন দুর্ভিক্ষ আর বন্যা হল তখন পাখির মতো এ যন্ত্রটি মানুষের জন্য নিয়ে এল খাদ্য, বাড়িয়ে দিল সাহয্যের হাত। চড়ুই পাখি দুটিও একটু দানা পানি খেয়ে সে সময় বেঁচে উঠল। যে মহাকায় পতঙ্গাসদৃশ বস্তুটি দেখে ভয় পেয়েছিল, তাদের ভয় কেটে গেল কিন্তু আসল চেহারাটি একদিন ধরা পড়ল। প্রকৃতি ছিল নিরুপদ্রব,মানুষ ছিল শান্তিতে। তবু পৃথিবীতে শুরু হল যুদ্ধ। সেই বৃহৎ পাখিটা আবার ভিন্ন বেশে আসল। একদিন তার পেট থেকে কী ভয়ানক শব্দে চারদিক কাঁপিয়ে ডিম ঝরে ফেটে পড়ল। পাখিদের সংসার গুঁড়িয়ে গেল। গাছপালা উৎপাটিত হল । সবার ঘর বাড়ি লন্ডভন্ড হয়ে গেল। পাখিটি আর খুঁজে পেল না তার স্ত্রী ও আদরের দুটি বাচ্চাকে। শান্তিময়, সুন্দর পৃথিবীতে নেমে এল ভয়াবহতা।

শব্দার্থ ও টীকা

সচকিত- ভয়ে চমকে ওঠা। **উর্ধ্বশ্বাসে-** বিশ্রাম না নিয়ে। **দুই দিগন্ত-** দূরের আকাশ। **মহাপতঙ্গা-** বিরাট আকারের পাখি। **দেও-** দুরাচার-দৈত্য-দুর্বৃত্ত। **কেচ্ছা-** কল্প-কাহিনী। **ছোঁ- রাক্ষস-**যে রাক্ষস ছোঁ মারে, চিল বা বাজপাখি। **ম্যাও-খোক্কস-** ম্যাও ম্যাও করে যে রাক্ষস, বিড়াল।

কুণ্ডলী- ফোঁসফোঁস- কুণ্ডলী পাকিয়ে যে প্রাণী ফোঁসফোঁস করে, সাপ। পাখির ছানার প্রধান শত্রু হল চিল, বিড়াল আর সাপ। কাজেই চড়ুই-মা ওদের শত্রুদের গল্পই শোনায়। **বিঁধিয়ে-** বিদ্ধ করে, নখ ফুটিয়ে। **নর-ছানা-** পুরুষ বাচ্চা। **ইতস্তত-** সঙ্কোচ। **তর্জন-গর্জন-** হাঁকডাক, প্রচণ্ড শব্দ। **নীড়-** পাখির বাসা। **বিস্ময়ের-** আশ্চর্যের। **তারিফ-** প্রশংসা। **হাম্বা হাম্বা-** গরু। **ভ্যাঁ-** ভোম্বল-ভেড়া। **ঘেঁউ পা-চাটা-** কুকুর। **কুক্কুরুত-** মোরগ। **প্যাঁক-টেঁটে** -হাঁস। **শুশুধর-** হাতি। **চিহিঁ-টগবগ-** ঘোড়া। **পাড়ি জমানো-** ভ্রমণ, কোনো কিছুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করা। **দোপেয়ে দৈত্য-** মানুষ। **কা-ভক্কুস-** কাক। **টোপলা-** পোঁটলা। **নিশানা-** দিকচিহ্ন। **লন্ডভন্ড-** ছারখার। **ডিম্ববতী-** পেটে ডিম বিশিষ্ট, বোমারু বিমানের পেটের ভেতরের বোমাকে ডিম বলা হয়েছে। **টেটন-** চালাক চতুর, পাকা।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'বাবা তো এটার কেচ্ছাই শুনিয়েছিল একদিন।' -কিসের কেচ্ছা?

ক. রূপকথার খ. দৈত্যপুরীর
গ. মহাপতঙ্গের ঘ. দোপেয়ে দৈত্যের

২. নিচের কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে 'মহাপতঙ্গা'-কে রূপক গল্প বলা যায়?

i. উড়োজাহাজকে মহাপতঙ্গা বলে আখ্যা দেওয়ায়
ii. একটি বিষয়বস্তুর আশ্রয়ে অন্য কিছু প্রকাশ করায়
iii. বিষয়বস্তুটি একটি কাহিনীর মাধ্যমে উপস্থাপন করায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii, iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩, ৪ ও ৫নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

চড়ুই পাখির বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ করে ওঠে। নিচে চেয়ে দেখে ধ্বংসস্তূপ। লন্ডভন্ড সব। সে চিৎকার করে ওঠে। স্ত্রীর নাম ধরে ডাকে। বাচ্চা দুটোর নাম ধরে ডাকে। কিন্তু সে ডাক ফিরে আসে প্রতিধ্বনি হয়ে।

৩. কী খুঁজে না পেয়ে চড়ুই পাখির বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ করে ওঠে?

ক. আড়া রঙের বাড়িটা খ. নারিকেল গাছটা
গ. তেতুল গাছটা ঘ. কাউন রঙের বাড়িটা

৪. অনুচ্ছেদটিতে কোন পরিবেশ লক্ষ করা যায়?

i. যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার অব্যবহিত পরের পরিবেশ
ii. আক্রমণের অব্যবহিত পরের পরিবেশ
iii. ঝড়ঝঞ্ঝার অব্যবহিত পরের পরিবেশ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. iii ঘ. ii

৫. 'সে ডাক ফিরে আসে প্রতিধ্বনি হয়ে।' - তার ডাক প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে কেন?

i. ধ্বংসস্তূপ অনুবর্ণিত হওয়ার কারণে
ii. তার স্ত্রী ও বাচ্চারা জবাব না দেওয়ায়
iii. নারিকেল গাছটার সাথে অনুরণিত হওয়ায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i, ii ঘ. i, ii, ও iii

৬. 'প্রচন্ড শব্দে মূর্ছা যায় চড়ুই পাখি।'– কিসের শব্দ?

ক. বাজ পড়ার খ. বোমা ফাটার
গ. বড় পাখির ডিম পাড়ার ঘ. ঝড়ে গাছ ভেঙে পড়ার

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

কিন্তু সুখে-শান্তিতে দিন কাটে না। বন্যায় দেশ ডুবে যায়। দিন দিন পানি বাড়তে থাকে। বাড়ির মালিক দোপেয়ে দৈত্য এবং আরও অনেকে দেশ ছেড়ে চলে যায়। যারা যেতে পারে না, তারা প্রাণের দায়ে বাড়ির ছাদে, ঘরের চালে, গাছের ডালে উঠে হা-হুতাশ করে। চড়ুই পাখি দুটোরও দুর্দশার অন্ত নেই। ওদের প্রতিবেশী চড়ুই পাখিগুলো অনেকেই দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। কিন্তু ওদের পালাবার উপায় নেই। বাসায় রয়েছে কলজের টুকরো দুটো কচি ছানা। ওদের ফেলে আর যাওয়া যায় না।

ক. দোপেয়ে দৈত্য কারা?
খ. দোপেয়ে দৈত্যদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্ধৃতাংশে মানুষের যে দুর্দশার চিত্র আছে, উদাহরণসহ তার ভয়াবহতা নিরূপণ কর।
ঘ. উদ্ধৃতিতে মানুষের জীবনের সঙ্গে পাখিদের জীবনের যে সম্পর্ক লক্ষ করা যায় তার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

দুজন বীরশ্রেষ্ঠ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ডাক দিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অগ্নিঝরা সে ডাকে বাংলার মানুষ উদ্বেলিত হল। অকাতরে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপ দিল লক্ষ লক্ষ মানুষ। কৃষক, মজুর, ছাত্র, শিক্ষক, তরুণ, প্রবীণ, সেনা, পুলিশ, গৃহবাসী আর কর্মচারী সকলেই মুক্তিযোদ্ধা। জয় বাংলা, বাংলার জয় সর্বত্র অনুরণিত হল। এক সত্য এক কথা, চাই বাংলার স্বাধীনতা।

পাকিস্তানের বৈষম্য, নিপীড়ন, অত্যাচার, দস্যুতা আর সম্পদ পাচারের সীমাহীন অন্যায় থেকে চিরতরে বাঁচার জন্য মুক্তিযুদ্ধ। আর নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনবোধের পূর্ণ বিকাশের জন্য স্বাধীনতার সংগ্রাম। যুদ্ধ শুরু হল। বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা পথে প্রান্তরে নগরে বন্দরে অরণ্য জলপথে যুদ্ধ করছেন। সবার মনে এক প্রতিজ্ঞা, পাকিস্তানি শাসক এবং হানাদার বাহিনীকে বাংলা ছাড়তে হবে।

জনগণের কোটি কোটি টাকা দিয়ে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত যুদ্ধবাজ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। ওদের হাতে আধুনিক মারণাস্ত্র, আর বাঙালির চিত্তে দেশমাতৃকার জন্য অপরিমেয় প্রেম। বাংলার যোদ্ধারা অকাতরে জীবন দান করেছেন, তাঁদের রক্তস্রোতে বাংলার মাটি আর্দ্র হয়েছে- কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকালে একজনও শঙ্কিত বা বিব্রত হননি। তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড় হল দেশ আর দেশের স্বাধীনতা।

যাঁরা দেশের জন্য জীবন দিলেন তাঁরা আমাদের অহংকার। বাংলাদেশের হৃদয়ে তাঁরা অমর সন্তান হিসেবে চিরকাল ভাস্বর হয়ে থাকবেন।

বাংলার এক নির্ভয় মুক্তিযোদ্ধা মুন্সী আব্দুর রব।

ফরিদপুর জেলার মধুমতী তীরের সালামতপুর গ্রামের মুন্সী মেহেদি হাসান এবং মকিদুননেসার একমাত্র পুত্র তিনি। বড় আদরের পুত্র। রবের বাবা মসজিদের ইমাম, যত্ন নিয়ে ছেলেকে পবিত্র কোরান পাঠ শিখিয়েছেন। স্কুলের শিক্ষক বলেন, আব্দুর রব বেশ মেধাবী ছাত্র, আমরা ওকে যশস্বী দেখতে চাই।

কিন্তু আব্দুর রবের পিতা অসময়ে মারা গেলেন। দারিদ্র্য নেমে এল সংসারে। বড় বোনের বিয়ে হল। একটা নতুন শাড়িও দেওয়া হল না। মা নীরবে কাঁদলেন। আব্দুর রব জননীর চোখের ধারা মুছিয়ে বললেন, মাগো, আমি চাকরি নেব, বড়বু'র জন্য শাড়ি কিনে আনব, তোমাদের দুঃখমোচন করব।

আব্দুর রব ই.পি.আর. বাহিনীতে যোগ দিলেন। সেখান থেকে সামরিক শিক্ষা নিয়ে ল্যান্সনায়েক হলেন। মাঝারি মেশিনগানের এক নম্বর চালক পদে উন্নীত হলেন। গ্রাম সালামতপুরে ছোট বোন হাজেরার বিয়ে ঠিক হয়েছে। আব্দুর রব লিখে পাঠালেন, ছোট বোনের জন্য শাড়ি নিয়ে ঠিক সময়ে তোমাদের কাছে যাব।

কিন্তু তাঁর সে যাওয়া হল না। স্বাধীনতার ডাক এসেছে- 'তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।'

সেই বজ্রকণ্ঠ ডাকে মধুমতী তীরের মুন্সী আব্দুর রবের বাঙালি চেতনা সমুদ্রের মতো বিশাল হল। যুদ্ধে এলেন আব্দুর রব।

রাঙামাটি ও মহালছড়ির জলপথটি পাহারা দিচ্ছে মুক্তিবাহিনী। হানাদার পাকিস্তানি সৈন্য যেন এ পথ দিয়ে এগোতে না পারে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানি বুড়িঘাট এলাকার চিংড়িখালে প্রতিরোধ গঠন করে রেখেছে, শত্রুদের কিছুতেই এগোতে দেবে না। এ কোম্পানির সৈনিক ল্যান্সনায়েক আব্দুর রব।

সেদিন হানাদার বাহিনী সাতটা স্পিডবোট আর দুটো লঞ্চ নিয়ে এগিয়ে আসছে। তাদের কাছে অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। কিন্তু তাতে মেশিনগান চালক মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রব এতটুকু ভীত নন। তাঁর অব্যর্থ এবং নির্ভুল নিশানায় হানাদার বাহিনী বিপর্যস্ত। তাদের সাতটা স্পিডবোট ডুবে গেল। হানাদার সৈন্যরা মরল। লঞ্চ দুটো নিয়ে পালালো

পাকিস্তানিরা। আব্দুর রবের মেশিনগানের নিশানার বাইরে গিয়ে তারা ভারী মর্টারে গোলাবর্ষণ করছে। কিন্তু আমাদের রব নির্ভয়। স্বাধীনতার সৈনিক তিনি। শত্রুর একটি গোলা এসে পড়ল আব্দুর রবের ওপর। রক্তে রাঙা হল বাংলার মাটি। মুন্সী আব্দুর রব ঢলে পড়লেন চিরনিদ্রায়। গভীর সে নিদ্রা, গৌরবের সে শয়ন।

১৯৪৩ সালে মুন্সী আব্দুর রবের জন্ম। আর ১৯৭১ সালের ২০ শে এপ্রিল মঙ্গলবার মধ্যগগনের সূর্যের দীপ্ত আলোতে তাঁর মৃত্যু। এমন মহান মৃত্যু যাঁর, তিনি বাংলার অন্যতম বীরশ্রেষ্ঠ। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাথায় আছেন আমাদের সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ। আরও আছেন বীর-উত্তম, বীরবিক্রম ও বীরপ্রতীক। বাংলার স্বাধীনতার জন্য তাঁদের অবদান আমরা কোনোদিন ভুলব না।

আর এক বীরশ্রেষ্ঠ যিনি, তাঁর নাম রুহুল আমিন। নৌ-সৈনিক রুহুল আমিন ইচ্ছা করলেই জীবন রক্ষা করতে পারতেন। তাঁর রণতরী 'পলাশ' থেকে নেমে নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে পারতেন- কিন্তু গেলেন না। মুক্তিযোদ্ধা কখনও রণে ভঙ্গ দেয় না। আকাশে জঙ্গি বিমান এসেছে। 'পদ্মা' আর 'পলাশ' দুই রণতরী লক্ষ করে গোলাবর্ষণ হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের রণতরী পদ্মা ধ্বংস হয়ে গেল। আর পলাশ রণতরীর ইঞ্জিনরুমের আর্টিফিসার রুহুল আমিন তখনও দৃঢ় হস্তে যুদ্ধ করছেন। জঙ্গি বিমানের গোলার আঘাতে পলাশে আগুন লাগল। গোলাবারুদে বিস্ফোরণ ঘটল। দারুণভাবে আহত রুহুল আমিন নদীতে ঝাঁপ দিলেন। তীরের ঘৃণ্য রাজাকাররা আহত রুহুল আমিনকে তুলে নিয়ে নির্মমভাবে আঘাতের পর আঘাত করে হত্যা করল। বাংলার এক নির্জন নিরিবিলি গ্রামে রুহুল আমিনের প্রবীণা জননী কাতর নয়নে অপেক্ষা করছিলেন, কখন তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তান ফিরে আসবে। রুহুল আমিনের ব্যাকুল পুত্র-কন্যা পথের দিকে তাকিয়ে আছে, কখন স্নেহময় পিতা ফিরে এসে তাদের বুকে তুলে নেবে।

ঘরে ফেরা হল না অদ্ভুত সুঠামদেহ এবং সুন্দর মানুষ রুহুল আমিনের। বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন। গৃহের বন্ধন, সন্তানদের সজল চোখ অপেক্ষা তাঁর কাছে দেশের স্বাধীনতা অনেক বড়। নোয়াখালি জেলার বেগমগঞ্জ থানার বাঘচাপটা গ্রামের আজাহার পাটোয়ারি এবং মা জোলেখা খাতুনের জ্যেষ্ঠ সন্তান রুহুল আমিন ম্যাট্রিক পাশ করলেন। সংবাদপত্রে চাকরিও করলেন। কিন্তু আরও বড় ও মহৎ কাজ করতে চান। সে কাজ দেশ এবং দেশের মানুষের জন্য। যোগ দিলেন নৌবাহিনীতে। নানারকম প্রশিক্ষণ নিলেন। মেকানিশিয়ান কোর্স শেষ করে নৌবাহিনীর আর্টিফিসার হলেন। করাচি থেকে বদলি হয়ে এলেন চট্টগ্রামে। বাংলার স্বাধীনতার জন্য ডাক এল। রুহুল আমিন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলেন। দু নম্বর সেক্টরে স্থলযুদ্ধে অংশ নিলেন।

যুদ্ধের সময় ভারত সরকার বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের দুটি গানবোট উপহার দিয়েছিলেন। তার একটি 'পলাশ'। এ রণতরীর ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসারের দায়িত্ব পেলেন রুহুল আমিন।

ভারতীয় রণতরী 'পাভেল' আর বাঙালির রণতরী 'পদ্মা' ও 'পলাশ' চলেছে হানাদার বাহিনীর তিতুমীর নৌঘাঁটি দখল করতে। বিনা বাধায় হিরণপয়েন্ট ও মংলা বন্দরে পৌছল মুক্তিযুদ্ধের রণতরী। তখন যুদ্ধের শেষ দিক। ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখ। রণতরীগুলো খুলনা বন্দরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

কিন্তু আকাশে উড়ে এল জঙ্গি বিমান।

ইঞ্জিনরুমে মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমিন তাঁর রণতরী রক্ষার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করছেন। জঙ্গি বিমানের গোলাবর্ষণে ধ্বংস হল 'পদ্মা' আর 'পলাশ'। আহত রুহুল আমিন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করেছেন। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও তিনি 'পলাশকে' রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা হাসতে হাসতে জীবন দিতে পারেন, কিন্তু পরাজয় মেনে নিতে পারেন না।

ঐ যে নীলাকাশ, উজ্জ্বল সূর্যের দীপ্ত আলোয় ভরে আছে। তার মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের ঘন সবুজ আর রক্তের রঙে গাঢ় লাল পতাকা উড়ছে। সবুজে মিশে আছে শ্যামল বাংলাদেশ আর লাল জুড়ে ঘন হয়ে আছে সহস্র সহস্র মুক্তিযোদ্ধার চিরঞ্জীব রক্তধারা। কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষক, সেনা-পুলিশ, তরুণ- প্রবীণ বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা রক্ত ঢেলে দিয়ে বাংলার স্বাধীনতা এনেছেন।

তাঁদের জন্য আমাদের চক্ষু জুড়ে অশ্রু, আর হৃদয় জুড়ে স্ফীত অহংকার।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে মহান মুক্তিযুদ্ধের পাঁচজন বীরশ্রেষ্ঠের জীবন ও অবদানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে 'দুজন বীরশ্রেষ্ঠ' শিরোনামে বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রব ও বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনের বীরত্ব ও অবদানের কথা তুলে ধরা হল।

মূলবক্তব্য

বাঙালির মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর অগ্নিঝরা ডাকে আপামর জনগণ দেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাঁদেরই একজন মহান মুক্তিযোদ্ধা ল্যান্সনায়েক মুন্সী আব্দুর রব। ফরিদপুর জেলার সালামতপুর গ্রামের সন্তান তিনি। বেশি লেখাপড়া করা সম্ভব হয়নি। তিনি তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর)-এ সৈনিক হিসেবে যোগ দেন এবং পরে ল্যান্সনায়েক পদে উন্নীত হন। রাঙামাটি জেলার মহালছড়ি এলাকার বুড়িঘাটে পাকিস্তানি শত্রু বাহিনীর সাতটি স্পিডবোট মেশিনগানের গুলি চালিয়ে ডুবিয়ে দেন তিনি।

কিন্তু কিছুক্ষণ পর শত্রুর ভারি মর্টারের গোলায় তিনি শহীদ হন। মুক্তিযুদ্ধের এই মহান শহীদ তাঁর বীরত্বের জন্য চিরকাল বাঙালি হৃদয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

মুক্তিযুদ্ধের আরেকজন মহান বীর নৌ-সৈনিক রুহুল আমিন। তিনি ছিলেন যুদ্ধ জাহাজ 'পলাশ'-এর ইঞ্জিনরুমের আর্টিফিসার। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অসামান্য আত্মত্যাগ তাঁকে বাঙালি হৃদয়ে চিরপ্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শেষ দিকে তাঁর রণতরী 'পলাশ' যখন খুলনার দিকে এগোচ্ছিল পাকিস্তানিদের নৌঘাঁটি দখল করতে, তখন জঙ্গি বিমানের গোলাবর্ষণে ধ্বংস হয় 'পলাশ'। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেও রুহুল আমিন যুদ্ধ করেছেন, নিজেকে বাঁচানোর কোনো চেষ্টা করেন নি। গোলার আঘাতে 'পলাশ' যখন দাউ দাউ করে জ্বলছে, তখন তিনি ঝাঁপ দিলেন নদীতে। তীরে অপেক্ষমান নরঘাতক ঘৃণ্য রাজাকারেরা তাঁকে আহত অবস্থায় নির্মমভাবে হত্যা করে। রুহুল আমিন শহীদ হলেন, বেঁচে রইলেন চিরকাল আমাদের অন্তরে।

শব্দার্থ

অগ্নিঝরা- আগুন ঝরে পড়ছে এমন। **উদ্বেলিত-** আবেগে উচ্ছলিত। **গৃহবাসী-** গৃহস্থ, সাধারণ মানুষ। **মারণাস্ত্র-** যুদ্ধের অস্ত্র। **অপরিমেয়-** যা পরিমাপ করা যায় না, বিপুল। **আর্দ্র-** ভেজা, সিক্ত। **ইপিআর-** তৎকালীন 'ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস'। **আর্টিফিসার** (Artificer) -দক্ষ কারিগর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

'মুক্তিযুদ্ধ' শব্দটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে সমগ্র বাঙালি জাতির অপরিমেয় গৌরব, আপোষহীন বীরত্ব, অসীম আত্মত্যাগ, স্ফীত অহংকার এবং স্বাধীনতা রক্ষার চিরস্থায়ী প্রতিজ্ঞা।

১. মুক্তিযুদ্ধ কত তারিখে শুরু হয়েছিল?

ক. ৭ই মার্চ ১৯৭১ খ. ২৫শে মার্চ ১৯৭১
গ. ২৬শে মার্চ ১৯৭১ ঘ. ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১

২. মুক্তিযুদ্ধ কাদের গৌরবগাথা?

ক. বীরশ্রেষ্ঠদের খ. বীরপ্রতীকদের

গ. বীর-উত্তমদের ঘ. বীর বাঙালির।

৩. 'স্বাধীনতা রক্ষার চিরস্থায়ী প্রতিজ্ঞা' অর্থ কী রক্ষা করা?

ক. সীমান্ত রক্ষা খ. গণতন্ত্র

গ. সার্বভৌমত্ব ঘ. মৌলিক অধিকার

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

ঐ যে নীলাকাশ, উজ্জ্বল সূর্যের দীপ্ত আলোয় ভরে আছে। তার মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের ঘন সবুজ আর রক্তের রঙে গাঢ় লাল পতাকা উড়ছে। সবুজে মিশে আছে শ্যামল বাংলাদেশ আর লাল জুড়ে ঘন হয়ে আছে সহস্র সহস্র মুক্তিযোদ্ধার চিরঞ্জীব রক্তধারা। কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষক, সেনা-পুলিশ, তরুণ–প্রবীণ বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা রক্ত ঢেলে দিয়ে বাংলার স্বাধীনতা এনেছেন। তাঁদের জন্য আমাদের চক্ষু জুড়ে অশ্রু, আর হৃদয় জুড়ে স্ফীত অহংকার।

ক. কাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা 'পতাকা' অর্জন করেছি?

খ. অনুচ্ছেদটির আলোকে জাতীয় পতাকায় ব্যবহৃত রঙের তাৎপর্য তুলে ধর।

গ. অনুচ্ছেদের আলোকে তুমি যে প্রেরণা লাভ কর তার পরিচয় দাও।

ঘ. 'আমাদের পতাকার রঙের সঙ্গে প্রকৃতির রূপ ও শহীদের আত্মত্যাগ একাকার হয়ে আছে।' –কীভাবে তা বিশ্লেষণ কর।

সময়ের প্রয়োজনে

জহির রায়হান

[লেখক পরিচিতি : জহির রায়হান ১৯৩৫ সালের ১৯ শে আগস্ট ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ। ১৯৫৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি লাভ করেন। একজন ছোটগল্পকার ও ঔপন্যাসিক হিসেবে জহির রায়হান খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি মূলত মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার। চারপাশের মানুষের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনার চিত্র তাঁর রচনাকে সমৃদ্ধ করেছে। সমাজের নানা বৈষম্য ও অসঙ্গতির বিরুদ্ধেও তাঁর কণ্ঠ ছিল বলিষ্ঠ। হাজার বছর ধরে, বরফ গলা নদী, শেষ বিকেলের মেয়ে, আরেক ফাল্গুন ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান চলচ্চিত্রকার হিসেবেও জহির রায়হানের পরিচিতি রয়েছে। স্বাধীনতাযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয় লাভের অল্পকাল পরেই ১৯৭২ সালের ৩০ শে জানুয়ারি তিনি নিখোঁজ ও শহীদ হন।]

কিছুদিন আগে সংবাদ সংগ্রহের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের একটা অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে গিয়েছিলাম। ক্যাম্প কমান্ডার ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন। সেই মুহূর্তে আমার দিকে একটা খাতা এগিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি বসুন। এই খাতাটা পড়ুন বসে বসে। আমি কয়েকটা কাজ সেরে নিই। তারপর আপনার সঙ্গে আলাপ করব।

খাতাটা হাত বাড়িয়ে নিলাম।

লাল মলাটে বাঁধানো একটা খাতা। ধুলো, কালি আর তেলের কালচে দাগে ময়লা হয়ে গেছে এখানে সেখানে।

খাতাটা খুললাম।

মেয়েলি ধরনের গোটা গোটা হাতে লেখা।

মাঝে মাঝে একটু এলোমেলো।

আমি পড়তে শুরু করলাম।

প্রথম প্রথম কাউকে মরতে দেখলে ব্যথা পেতাম। কেমন যেন একটু দুর্বল হয়ে পড়তাম। কখনও চোখের কোণে একফোঁটা অশ্রুও হয়তো জন্ম নিত। এখন অনেকটা সহজ হয়ে গেছি। কী জানি, হয়তো অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে গেছে। তাই মৃত্যুর খবর আসে। মরা মানুষ দেখি। মৃতদেহ কবরে নামাই। পরক্ষণে ভুলে যাই।

রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিয়ে ছোট্ট টিলাটার ওপরে এসে দাঁড়াই। সামনে তাকাই। বিরাট আকাশ। একটা লাউয়ের মাচা। কচি লাউ ঝুলছে। বাতাসে মৃদু দুলছে। কয়েকটা ধানখেত। দুটো তালগাছ। দূরে আর একটা গ্রাম। খবর এসেছে ওখানে ঘাঁটি পেতেছে ওরা। একদিন যারা আমাদের অংশ ছিল। এক সঙ্গে থেকেছি। শুয়েছি। খেয়েছি। ঘুমিয়েছি। এক টেবিলে বসে গল্প করেছি। প্রয়োজনবোধে ঝগড়া করেছি। ভালোবেসেছি। আজ তাদের দেখলে শরীরের রক্ত গরম হয়ে যায়। চোখ জ্বালা করে ওঠে। হাত নিসপিস করে। পাগলের মতো গুলি ছুড়ি। মারার জন্য মরিয়া হয়ে উঠি। একজনকে মারতে পারলে উল্লাসে ফেটে পড়ি। ঘৃণায় থুথু ছিটাই মৃতদেহের মুখে। সামনে ধানখেত। আলের ওপরে কয়েকটা গরু। একটা ছাগল। একটানা ডাকছে। এক ঝাঁক পাখি উড়ে চলে গেল দূরে গ্রামের দিকে। কী যেন নড়েচড়ে উঠল সেখানে। সন্দেহে মুহূর্তে দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। ক্যাম্প কমান্ডারকে খবর দিলাম।

স্যার, মনে হচ্ছে ওরা এগুতে পারে।

তিনি একটা ম্যাপের ওপরে ঝুঁকে পড়ে হিসেব কষছিলেন। মুখ তুলে তাকালেন। একজোড়া লাল চোখ। গত দু রাত ঘুমোননি। অবকাশ পাননি বলে। তিনি তাকালেন।

বললেন, কী দেখেছ ?

বললাম, মনে হল একটা মুভমেন্ট।

ভুল দেখেছ। আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন তিনি। ওদের দু-একদিনের মধ্যে এগোবার কথা নয়। যাও, ভালো করে দেখ।

চলে এলাম নিজের জায়গায়। একটানা তাকিয়ে থাকি। মাঝে মাঝে তন্দ্রা এসে যায়। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। হয়তো তাই ভুল দেখি।
কিন্তু বুড়িগঙ্গার পাশে লঞ্চঘাটের অপরিসর বিশ্রামাগারে যে দৃশ্য দেখেছিলাম সেটা ভুল হবার নয়। শুনেছিলাম, বহুলোক আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে। যখন গেলাম, দেখলাম কেউ নেই।
দেখলাম-
মেঝেতে পুডিং -এর মতো জমাট রক্ত।
বুটের দাগ।
অনেকগুলো খালি পায়ের ছাপ।
ছোট পা। বড় পা। কচি পা।
কতগুলো মেয়ের চুল।
দুটো হাতের আঙুল।
একটা আংটি।
চাপ চাপ রক্ত।
কালো রক্ত। লাল রক্ত।
মানুষের হাত, পা, পায়ের গোড়ালি।
পুডিং-এর মতো রক্ত।
খুলির একটা টুকরো অংশ।
এক খাবলা মগজ।
রক্তের ওপরে পিছলে যাওয়া পায়ের ছাপ।
অনেকগুলো ছোট বড় ধারা। রক্তের ধারা।
একটা চিঠি।
মানিব্যাগ।
গামছা।
এক পাটি চটি।
কয়েকটা বিস্কুট।
জমে থাকা রক্ত।
একটা নাকের নোলক।
একটা চিরুনি।
বুটের দাগ।
লাল হয়ে যাওয়া একটা সাদা ফিতে।
চুলের কাঁটা।
দেশলাইয়ের কাঠি।
একটা মানুষ টেনে নিয়ে যাওয়ার ছাপ।
রক্তের মাঝখানে এখানে ওখানে অনেকগুলো ছড়ানো।
পাশের নর্দমাটা বন্ধ।
রক্তের স্রোত লাভার মতো জমে গেছে সেখানে।
দেখছিলাম।
দেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছিলাম সেখান থেকে।
আমি একা নই। অসংখ্য মানুষ।
অসংখ্য মানুষ পিঁপড়ের মতো ছুটছিল।
মাথায় সুটকেস, বগলে কাপড়ের গাঁটরি। হাতে হ্যারিকেন।
কোমরে বাচ্চা।
চোখে মুখে কী এক অস্থির আতঙ্ক!
কথা নেই। মৌন সবাই।

সহসা কে যেন বলল, ওদিকে যাবেন না। মিলিটারি। নৌকায় করে করে লোকজন সব ওপারে পালাচ্ছিল। মিলিটারি ওদের ওপরে গুলি করেছে। তিনশ লোক মারা গেছে ওখানে। যাবেন না।

মনে হল পায়ের সঙ্গে যেন কয়েক মণ পাথর বেঁধে দিয়েছে কেউ।

একা নই। অসংখ্য মানুষ। সহস্র চোখ। হতবিহ্বল মুহূর্ত। কোনদিকে যাব? পেছনে ফিরে যাবার পথ নেই। মৃতদেহের স্তূপের নিচে সে পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

সামনে এগিয়ে যাব। ভরসা পাচ্ছিনে। সেখানেও হয়তো মৃতের পাহাড় পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

কোনদিকে যাব?

পরমুহূর্তে একটা হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পেলাম।

আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সবাই ছুটতে লাগলাম আমরা। যে যেদিকে পারছে ছুটছে। কাঁচকি মাছের মতো চারপাশে ছিটকে যাচ্ছে সবাই।

হেলিকপ্টার মাথার ওপরে নেমে এল।

তারপর।

তারপর মনে হল এক সঙ্গে যেন অনেকগুলো বাজ পড়ল। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। কিছু দেখতে পাচ্ছি না। শুধু শুনছি। অনেকগুলো শব্দের তাণ্ডব। মেশিনগানের শব্দ। বাচ্চার কান্না। কতগুলো মানুষের আর্তনাদ। কাতরোক্তি। কয়েকটা কুকুরের চিৎকার। মেশিনগানের শব্দ। মানুষের বিলাপ। একটি কিশোরের কণ্ঠস্বর। বাজান। তারপর শ্মশানের নীরবতা। ঘাড়ের কাছে চিনচিনে একটা ব্যথা। ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকালাম। দেখলাম। না, কিছুই দেখতে পেলাম না। সবকিছু ঝাপসা হয়ে এল। মনে হল চারপাশে অন্ধকার নেমে আসছে। বুঝতে পারলাম জ্ঞান হারাচ্ছি, কিংবা মারা যাচ্ছি।

সামনে ধানখেত। একটা লাউয়ের মাচা। কচি লাউ ঝুলছে। পেছনে কয়েকটা বাঁশ বন। আড়ালে চার-পাঁচটা তাঁবু। একটা পুরনো দালান। ওখানে আমরা থাকি।

মোট সাতাশ জন মানুষ।

প্রথমে উনিশ জন ছিলাম। আট জন মারা গেল মর্টারের গুলিতে। ওদের কবরে নামিয়ে দিয়ে যখন ক্যাম্পে ফিরলাম, তখন আমরা এগার জন।

একজন পালিয়ে গেল হঠাৎ অসুখ করে। কী অসুখ বুঝে ওঠার আগেই হাত-পা টান টান করে শুয়ে পড়ল সে। আর উঠল না। তার বুক পকেটে একটা চিঠি পেয়েছিলাম। মায়ের কাছে লেখা। 'মা। আমার জন্য তুমি একটুও চিন্তা কোরো না, মা। আমি ভালো আছি।'

চিঠিটা ওর কবরে দিয়ে দিয়েছি। থাক, ওখানেই থাক। তখন ছিলাম নয়জন। এখন আবার বেড়ে সাতাশে পৌঁছেছি।

সাতাশ জন মানুষ।

নানা বয়সের। ধর্মের। মতের।

আগে কারও সঙ্গে আলাপ ছিল না। পরিচয় ছিল না। চেহারাও দেখিনি কোনোদিন।

কেউ ছাত্র ছিল। কেউ দিন-মজুর কৃষক। কিংবা মধ্যবিত্ত কেরানি। পাটের দালাল। অথবা পদ্মাপারের জেলে।

এখন সবাই সৈনিক।

একসঙ্গে থাকি। খাই। ঘুমোই।

রাইফেলগুলো কাঁধে তুলে নিয়ে যখন কোনো শত্রুর সন্ধানে বেরোই তখন মনে হয় পরস্পরকে যেন বহুদিন ধরে চিনি। জানি। অতি আপনজনের মতো অনুভব করি।

মনে হয় দীর্ঘদিনের আত্মীয়তার এক অবিচ্ছেদ্য বাঁধনে আবদ্ধ আমরা। আমাদের অস্তিত্ব ও লক্ষ্য দুই-ই এক। মাঝে মাঝে বিশ্রামের মুহূর্তে গোল হয়ে বসে গল্প করি আমরা। অতীতের গল্প।

বর্তমানের গল্প।

ভবিষ্যতের গল্প।

ওষুধ ফুরিয়ে গেছে। আনতে হবে। কদিন ধরে শুধু ডাল-ভাত চলছে। একটু মাছ আর মাংস পেলে মন্দ হত না। সাতাশ জন মানুষ আমরা। মাত্র ন'টা রাইফেল। আরও যদি অস্ত্র পেতাম। সবার হাতে যদি একটা করে রাইফেল থাকত, তাহলে সেদিন ওদের একজন সৈন্যকেও পালিয়ে যেতে দিতাম না। মোট দু শ জনের মতো এসেছিল ওরা। পঁয়তাল্লিশটা লাশ পেছনে ফেলে পালিয়েছে। তাড়া করেছিলাম আমরা। খেয়াপার পর্যন্ত। গুলি ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে ফিরে চলে এসেছি।

এসে দেখি আশেপাশের গ্রাম থেকে ছেলে-বুড়ো-মেয়ে গেরস্ত-বাড়ির বউ ছুটে এসেছে সেখানে।

কারও হাতে ঝাঁটা। দা। কুড়োল। খুন্তি।

জনতার সমুদ্র।

সমুদ্রের চেয়ে গভীর।

গতিময়।

মনে হচ্ছিল, সামনে যত বাঁধার পাহাড় আসুক না কেন, সবকিছুই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

পাথরে খোদাই করা চেহারা। মুষ্টিবদ্ধ হাত সীমানা ছাড়িয়ে। লক্ষ-কোটি বজ্রের শব্দ কিংবা ঢেউয়ের ধ্বনি সে মিছিলের গর্জনের কাছে অর্থহীন।

আগে তো দেখিনি কোনোদিন।

বায়ান্নর ফেব্রুয়ারিতে। চুয়ান্নতে। বাষট্টি, ছেষট্টি, কিংবা ঊনসত্তরে অনেক দেখেছি।

কিন্তু এত প্রাণের জোয়ার কখনও দেখিনি।

এত মৃত্যুও দেখিনি আগে।

সামনে তাকাই। বিরাট আকাশ। কয়েকটা লাউয়ের মাচা।

কচি লাউ ঝুলছে। কয়েকটা ধানখেত। দুটো তালগাছ। দূরে আর একটা গ্রাম।

প্রতিদিন দেখি।

পেছনে কয়েকটা বাঁশবন। আড়ালে চার-পাঁচটা তাঁবু। একটা পুরনো দালান। সে দালানের গায়ে কাঠ কয়লা দিয়ে অনেকগুলো ছোট ছোট রেখা এঁকেছি আমরা। ওগুলো মৃতের হিসাব।

আমাদের নয়।

ওদের।

যখনই কোনো শত্রুকে বধ করেছি, তখনই একটা নতুন রেখা টেনে দিয়েছি দেয়ালে। হিসাব রাখতে সুবিধে হয় তাই। প্রায়ই দেখি। গুণি। তিনশ বাহাত্তর, তিয়াত্তর, চুয়াত্তর। পুরো দেওয়ালটা কবে ভরে যাবে সে প্রতীক্ষায় আছি।

আমাদের যাঁরা মরেছে তাঁদের হিসাবও রাখি। কিন্তু সেটা মনে মনে। মনের মধ্যে অনেকগুলো দাগ। সেটাও মাঝে মাঝে গুনি।

একদিন।

বেশ কিছুদিন আগে। সেক্টর কমান্ডার এসেছিলেন আমাদের ক্যাম্পে, দেখতে। সারিবন্ধভাবে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা। অভিবাদন করেছিলাম তাঁকে। তিনি আমাদের একটি প্রশ্ন করেছিলেন।

'কেন যুদ্ধ করছ বলতে পার?'

প্রায় একই ধরনের উত্তর দিয়েছিলাম আমরা।

বলেছিলাম, দেশের জন্য। মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধ করছি। যুদ্ধ করছি দেশকে মুক্ত করার জন্য।

বাংলাদেশ।

না। পরে মনে হয়েছিল উত্তরটা বোধ হয় ঠিক হয়নি। নিজেরা অনেকক্ষণ আলাপ করেছি আমরা। উত্তরটা ঠিক হল কি?

দেশ তো হল ভূগোলের ব্যাপার। হাজার বছরে যার হাজার বার সীমারেখা পাল্টায়। পাল্টেছে। ভবিষ্যতেও পাল্টাবে।

তাহলে কিসের জন্য লড়ছি আমরা?

বন্ধুরা নানাজনে নানারকম উক্তি করেছিল।

কেউ বলেছিল, আমরা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য লড়ছি। ওরা আমাদের মা-বোনদের কুকুর-বেড়ালের মতো মেরেছে, তাই। তার প্রতিশোধ নিতে চাই।

কেউ বলেছিল, আমরা আসলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছি। ওরা বহু অত্যাচার করেছে আমাদের ওপর। শোষণ করেছে। তাই ওদের তাড়াবার জন্য লড়ছি। কেউ বলেছিল, আমি অতশত বুঝি না মিয়ারা। আমি দেশের জন্য লড়ছি।

আমি ওদের কথাগুলো শুনছিলাম। ভাবছিলাম। মাঝে মাঝে আলোচনায় অংশ নিতে গিয়ে তর্ক করছিলাম।

কিন্তু মন ভরছিল না।

কিসের জন্য লড়ছি আমরা? এত প্রাণ দিচ্ছি, এত রক্তক্ষয় করছি?

হয়তো সুখের জন্য। শান্তির জন্য। নিজের কামনা-বাসনাগুলোকে পরিপূর্ণতা দেবার জন্য। কিংবা, শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য।

অথবা, সময়ের প্রয়োজনে। সময়ের প্রয়োজন মেটাবার জন্য লড়ছি আমরা।

না।

অতশত ভাবতে পারি না। আমার ছোট মাথায় অত ভাবনা এখন আর ধরে না। ব্যথা করে। যেটা বুঝি সেটা সোজা। আমাদের মাটি থেকে ওদের তাড়াতে হবে। এটাই এখনকার প্রয়োজন।

দেওয়ালের রেখাগুলো বাড়ছে।

মনের দাগও বাড়ছে প্রতিদিন।

হাতের কব্জিতে এসে একটা গুলি লেগেছিল কাল।

সেটা হাতে না লেগে বুকেও লাগতে পারত। মাত্র দু আঙুলের ব্যবধান।

এখন কদিন বিশ্রাম।

মা কাছে থাকলে মাথায় হাত বুলিয়ে দিত। কাঁদত। বকুনি দিয়ে বলত, বাহাদুর। অত সামনে এগিয়ে গিয়েছিলি কেন? সবার পেছনে থাকতে পারলি না? আর অত বাহাদুরির দরকার নেই বাবা। ঘরের ছেলে এখন ঘরে ফিরে চল।

ঘর?

সত্যি, মানুষের কল্পনা বড় অদ্ভুত।

ঘরবাড়ি কবে ওরা পুড়ে ছাই করে দিয়েছে। তবু ঘরের কথা ভাবতে মন চায়।

খবর পেয়েছি- মা, বাবা, ভাই, বোন ওরা সবাই কোথায় যেন চলে গেছে। হয়তো কোনো গ্রামে, কোনো গঞ্জে। কোনো উদ্বাস্তু শিবিরে, কিংবা-

জানি না। জানতে গেলে ভয় হয়।

শুধু জানি, এ যুদ্ধে আমরা জিতব। আজ, নয় কাল। নয়তো পরশু।

একদিন আমি আবার ফিরে যাব। আমার শহরে, আমার গ্রামে। তখন হয়তো পরিচিত অনেকগুলো মুখ সেখানে থাকবে না। তাদের আর দেখতে পাব না আমি। যাদের পাব তাদের প্রাণভরে ভালোবাসব।

যারা নেই, কিন্তু একদিন ছিল, তাদের গল্প আমি শোনাব ওদের।

সেই ছেলেটির গল্প। বুকে মাইন বেঁধে যে ট্যাংকের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

কিংবা, সেই বুড়ো কৃষক। রাইফেলটা হাতে তুলে নিয়ে যে মৃদু হেসে বলেছিল, চললাম। আর ফিরে আসেনি। অথবা উদ্বাস্তু শিবিরের পাঁচ লক্ষ মৃত শিশু।

দশ হাজার গ্রামের আনাচে কানাচে এক কোটি মৃতদেহ।

না, এক কোটি নয়, হয়তো হিসাবের অঙ্ক তখন তিন কোটিতে গিয়ে পৌঁছেছে।

এক হাজার এক রাত কেটে যাবে হয়তো। আমার গল্প তবু ফুরোবে না।

সামনে ধানখেত। বিরাট আকাশ। একটা লাউয়ের মাচা, কচি লাউ ঝুলছে। দুটো তালগাছ। দূরে আরেকটা গ্রাম। গ্রামের নাম রোহনপুর। ওখানে এসে ঘাঁটি পেতেছে ওরা, একদিন যারা আমাদের অংশ ছিল।

ডায়েরিতে আর কিছু লেখা নেই।

খাতাটা ক্যাম্প কমান্ডারের দিকে এগিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলাম। কার লেখা, আপনার?

না। আমাদের সঙ্গের একজন মুক্তিযোদ্ধার। তার সঙ্গে একটু আলাপ করতে পারি কি? আবার প্রশ্ন করলাম।

উত্তর দিতে গিয়ে মুহূর্ত কয়েক আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, দিন কয়েক আগে একটা অপারেশনে গিয়ে ওদের হাতে ধরা পড়েছে সে।

তারপর?

তারপরের খবর ঠিক বলতে পারছি না। হয়তো মেরে ফেলেছে। বেঁচেও থাকতে পারে হয়তো।

চোখ জোড়া অজান্তে আবার খাতাটার ওপরে নেমে এল। অনেকক্ষণ উল্টেপাল্টে দেখলাম সেটা। তারপর মুখটা ঘুরিয়ে নিলাম বাইরের দিকে।

বিরাট আকাশ। একটা লাউয়ের মাচা, কচি লাউ ঝুলছে। কয়েকটা ধানখেত। দুটো তালগাছ। দূরে আরেকটা গ্রাম। সেখানে আগুন জ্বলছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

'সময়ের প্রয়োজনে' গল্পটি জহির রায়হানের গল্প সংগ্রহ থেকে সংকলিত হয়েছে।

মূলবক্তব্য

'সময়ের প্রয়োজনে' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি গল্প। এখানে একজন তরুণ মুক্তিযোদ্ধার রোজনামচা গল্পাকারে পরিবেশিত হয়েছে। এ গল্পে বাংলাদেশের তৎকালীন মুক্তিপাগল জনতার ঐক্য ও সংগ্রামী চেতনার পরিচয় বিধৃত হয়েছে। দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি অকৃত্রিম মমত্ববোধও এখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত।

শব্দার্থ ও টীকা

ম্যাপ- মানচিত্র। **মুভমেন্ট-** গতিবিধি। **পুডিং-** ডিম, দুধ, চিনি ও ময়দা সহযোগে তৈরি খাবার। **সহসা-** হঠাৎ। **ক্যাম্প-** শিবির। **বাহাদুর-** বীর। **উদ্বাস্তু শিবির-** আশ্রয়প্রার্থীদের ছাউনি। **মাইন-** দালান, সেতু, জাহাজ ইত্যাদি ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য এক প্রকার বিস্ফোরক। **ট্যাঙ্ক-** ইস্পাতনির্মিত কামানবাহী দুর্ধর্ষ আধুনিক স্থলযুদ্ধযান। **মধ্যবিত্ত -** ধনী ও দরিদ্রের মাঝামাঝি সাধারণ অবস্থার লোকেরাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আমাদের মুক্তি সংগ্রামে এঁদের বিশিষ্ট অবদান রয়েছে। **ওপার-** বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে ভারতীয় এলাকা।

পদ্মাপারের জেলে- পদ্মানদীর তীরে বসবাসকারী জেলেদের বোঝানো হয়েছে। এরা পদ্মায় জাল ফেলে মাছ ধরে এবং মাছ ধরাই এদের জীবিকার অন্যতম অবলম্বন।

বায়ান্ন, উনসত্তর- এখানে লেখক উনিশ শ বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলনে এবং উনিশ শ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। **মুক্তিযোদ্ধা-** মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধা। এখানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের বোঝানো হয়েছে। এঁরা ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস (২৬শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত) বাংলাদেশকে শত্রুকবলমুক্ত করার জন্য মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। এ দেশের স্বাধীনতা অর্জনে এই মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান অবিস্মরণীয়। **ক্যাম্প কমান্ডার-** সৈন্য শিবিরের প্রধান কর্মকর্তা। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর ও গ্রাম এলাকায় হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘সময়ের প্রয়োজনে’ গল্পটির ঘটনা -

ক. ভাষা আন্দোলনের
খ. মুক্তিযুদ্ধের
গ. উনসত্তরের অভ্যুত্থানের
ঘ. বাষট্টির গণ-আন্দোলনের

২. ‘আমাদের মাটি থেকে ওদের তাড়াতে হবে।’-কাদের তাড়াতে হবে?

i. মুক্তিযোদ্ধাদের
ii. হানাদারবাহিনীকে
iii. শত্রুদের

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. ii ও iii

৩. ‘সময়ের প্রয়োজনে’ গল্পটির নামকরণ কোন প্রেক্ষাপটে সার্থক বলে মনে কর?

i. দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি অকৃত্রিম মমত্ববোধ
ii. মুক্তিপাগল জনতার ঐক্য ও সংগ্রামী চেতনা
iii. ১৯৭১ -এর মুক্তিযুদ্ধের অপরিহার্যতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও ii

৪. ‘লক্ষ-কোটি বজ্রের শব্দ কিংবা ঢেউয়ের ধ্বনি সে মিছিলের গর্জনের কাছে অর্থহীন’– উদ্ধৃতিটি কোন তাৎপর্য বহন করে?

i. আবেগ নয়-বিদ্রোহই ছিল যুদ্ধের অন্যতম প্রেরণা
ii. মাটি ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই সৈনিকের ঝাপিয়ে পড়েছে
iii. জনতার ঐক্য ও সংগ্রামী চেতনার ফসল হিসেবে বাংলাদেশ জেগে উঠেছে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. তারপর মনে হল এক সঙ্গে যেন অনেকগুলো বাজ পড়ল। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। কিছু দেখতে পাচ্ছি না। শুধু শুনছি। অনেকগুলো শব্দের তান্ডব। মেশিনগানের শব্দ। বাচ্চার কান্না কতগুলো মানুষের আর্তনাদ। কাতরোক্তি। কয়েকটি কুকুরের চিৎকার। মেশিনগানের শব্দ। মানুষের বিলাপ। একটা কিশোরের কণ্ঠস্বর। বাজান। তারপর শ্মশানের নীরবতা। ঘাড়ের কাছে চিনচিনে একটা ব্যথা। ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকালাম। দেখলাম। না, কিছুই দেখতে পেলাম না। সবকিছু ঝাপসা হয়ে এল। মনে হল চারপাশে অন্ধকার নেমে আসছে। বুঝতে পারলাম জ্ঞান হারাচ্ছি কিংবা মারা যাচ্ছি।

ক. উদ্দীপকটি কোন গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে?
খ. উদ্ধৃতাংশে কোন পরিবেশের কথা বর্ণিত হয়েছে ব্যাখ্যা কর।
গ. উপরের ঘটনার সাথে মিল রেখে তোমার জানা যে কোনো একটি ঘটনাংশের বর্ণনা দাও।
ঘ. ‘মনে হল চারপাশে অন্ধকার নেমে আসছে’-বিশ্লেষণ কর।

ওদের জন্য ভালোবাসা

মাহবুবুল আলম

*[**লেখক পরিচিতি :** মাহবুবুল আলম ১৯৩৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও থানার হাতিখলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে এম. এ. ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনে অধ্যাপনাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে তিনি বিভিন্ন সরকারি কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রেও অবদান রেখেছেন; বিশেষ করে প্রবন্ধ, রম্যরচনা, ছড়া, অনুবাদ, শিশুসাহিত্য, পাঠ্যপুস্তক রচনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,' 'বাংলা ছন্দের রূপরেখা', 'বাংলা সাহিত্যের নানাদিক', 'বাংলা সাহিত্য : কিশোর ইতিহাস', 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ', 'বাংলা বানান ও ভাষারীতি', 'ভাষাসৌরভ ব্যাকরণ ও রচনা', 'রম্যকথা', 'রোভারিং টু সাকসেস', 'মাধ্যমিক বাংলা ব্যাকরণ' ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা।]*

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায় তার কাজে–কর্মে ও আচার–আচরণে। মানবচরিত্রের সুন্দর বিকাশে আর মহৎ গুণাবলির সমাবেশে সৃষ্টির সেরা হিসেবে তার অনন্য পরিচয় ফুটে ওঠে। এই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় ফুটিয়ে তোলার জন্য তাকে কর্মমুখর জীবনযাপন করতে হয়। কর্মময় জীবনের বিচিত্র ও মহৎ অবদানের মাধ্যমে মানুষের জীবনের গৌরবময় বিকাশ সাধিত হয়।

মহৎ কাজের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য মানুষ নিজেকে প্রতিনিয়ত নিয়োজিত রাখে। মানুষের শারীরিক সামর্থ্য, বুদ্ধিবৃত্তির যোগ্যতা তাকে এ কাজে সবসময় সহায়তা করে। কিন্তু কারও যদি কোনো অঙ্গহানি ঘটে, অথবা মানসিক দিক থেকে কখনও ভারসাম্যহীন হয়, তবে সে নিজের কিংবা অন্যদের কল্যাণে অবদান রাখতে পারে না।

সমাজে বসবাসকারী মানুষগুলোর দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, সংসারে সবাই সমান দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা কেউ জন্মগতভাবেই, আবার কেউ বা পরবর্তীকালে শারীরিক কিংবা মানসিক অক্ষমতায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। মস্তিষ্ক বা অঙ্গের কোনো ত্রুটির ফলে যদি কোনো মানুষের অক্ষমতা দেখা দেয় এবং এ ধরনের অক্ষমতার কারণে তার জীবনযাপন সমস্যায় ভারাক্রান্ত হয়, তখন সে অবস্থাকে প্রতিবন্ধিতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। স্বাভাবিক সুস্থ সবল মানুষের মতো এরা চলতে পারে না বলে এদের জীবনের বিকাশ ঘটে ধীরে ধীরে। স্বাভাবিক সংবেদনশীল মানুষের ভালোবাসায় এরা বেড়ে উঠতে থাকে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এ মানুষগুলোকে সনাতনী ভাষায় 'প্রতিবন্ধী' বলা হয়। তবে সবাই একই ধরনের প্রতিবন্ধী নয়। প্রতিবন্ধিতার বৈচিত্র্যের প্রেক্ষিতে এদের নানা ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

১. **শারীরিক প্রতিবন্ধী :** হাত–পা বা দেহের কোনো অঙ্গের অক্ষমতার জন্য যাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হয়, তাদের শারীরিক প্রতিবন্ধী বলা হয়।

২. **দৃষ্টি প্রতিবন্ধী :** কারও চোখের দৃষ্টিক্ষমতায় যদি এমন মাত্রায় ঘাটতি থাকে যে সে জীবনে স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারে না, তাহলে তাকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বলে।

৩. **শ্রবণ প্রতিবন্ধী :** কানে শোনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঘাটতি থাকলে অপরের কথা শোনার ব্যাপারে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কারও এমন হলে তার নাম শ্রবণ প্রতিবন্ধী।

৪. **বুদ্ধি প্রতিবন্ধী :** বুদ্ধির ক্ষেত্রে যদি কারও উল্লেখযোগ্য ঘাটতি থাকে এবং এতে যদি বয়সের অনুপাতে তার কর্মসম্পাদনে বাধার সৃষ্টি হয়, তখন তাকে অভিহিত করা হয় বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হিসেবে।

এ ছাড়া আছে বাক্ প্রতিবন্ধী। এরা স্পষ্টভাবে কথা বলার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না।

কারও কারও জীবনে একাধিক ধরনের প্রতিবন্ধিতা থাকে এবং তখন নানাদিক থেকে তার জীবনযাপন কষ্টকর হয়ে

পড়ে। প্রতিবন্ধী মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে যেমন স্বাভাবিক জীবনযাপনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত, তেমনি পরিবার–পরিজন, সমাজ–সংসার, এমনকি রাষ্ট্রও তার বিকাশ ও সমৃদ্ধির পথগুলো প্রস্তুত করে দেয় না।

কোনো কোনো প্রতিবন্ধী শিশু জন্মগতভাবেই প্রতিবন্ধিতা নিয়ে পৃথিবীতে আসে। আবার কেউ কেউ পরবর্তী জীবনে দুর্ঘটনাজনিত কোনো কারণে প্রতিবন্ধী হয়ে ওঠে। আবার কখনও বংশগতির কারণেও কোনো কোনো শিশু প্রতিবন্ধী হয়। মানবশিশু তার শরীরে বংশগত বৈশিষ্ট্য বহন করে বলে পূর্বপুরুষের কোনো ত্রুটি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে। কোনো কোনো সময় শারীরিক ত্রুটি বা বুদ্ধিজনিত সমস্যা বংশের ধারা হিসেবে দেখা দিতে পারে। জন্মগতভাবে একজন প্রতিবন্ধী শিশু স্বাভাবিক মানুষের মতো জীবনযাপন করতে পারে না।

মানবশিশুর শরীর, অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয়সমূহ কোনো রোগ, দুর্ঘটনা বা জৈবিক ত্রুটির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। নানারকম দুর্ঘটনায় মানুষের অঙ্গহানি ঘটে। দুর্ঘটনায় বিকলাঙ্গ হয়ে পড়লে মানব জীবনের অনেক সম্ভাবনাময় পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে। বেঁচে থাকলেও কঠিন হয়ে যায় তার জীবনের স্বাভাবিক গতি। কর্ম ও কোলাহলমুখর স্বাভাবিক জীবনে অংশগ্রহণ তাদের জন্য কণ্টকময় হয়ে ওঠে।

পরিবেশগত কারণে মানবশিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে। যে পরিবেশে শিশু লালিত–পালিত হয় তার প্রভাব শিশুর ওপর পড়ে। পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে শিশুর প্রতিবন্ধিতা দেখা দিতে পারে। পরিবেশ সবসময় অনুকূলে থাকে না বলে শিশুর জীবনের সুষ্ঠু বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।

মানুষের জীবন অপার সম্ভাবনাময়। শারীরিক ও মানসিক কোনো ত্রুটির জন্য সে সম্ভাবনা থেকে কাউকে বঞ্চিত করা অমানবিক। প্রতিবন্ধিতার অসুবিধাগুলো যথোপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে দূর করা যায়। চিকিৎসা দিয়ে যখন কোনো প্রতিবন্ধীকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নেওয়া যায় তখন সে আর প্রতিবন্ধী থাকে না। তখন সে অন্য দশজনের মতোই স্বাভাবিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

যাদের প্রতিবন্ধিতা চিকিৎসা দ্বারা দূর করা যায় না তারা স্থায়ী প্রতিবন্ধী। তাদের জীবনকেও স্বাভাবিক মানুষের মতো সুন্দর ও কর্মক্ষম করে তোলা সম্ভব। তার জন্য দরকার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, কর্মের জগৎ সৃষ্টি এবং সর্বোপরি মমত্ব ও সহানুভূতির দৃষ্টিভঙ্গি। তাদের উন্নয়নে আধুনিক বিশ্বের উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারও করা যেতে পারে। সারা বিশ্বে এ ব্যাপারে সচেতনতা ও উদ্যোগের সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের দেশে প্রতিবন্ধী অর্থাৎ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা কোনোভাবেই উপেক্ষা করার মতো নয়। জাতিসংঘের বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের অধিবাসীদের শতকরা দশ ভাগ প্রতিবন্ধী। বর্তমানে দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে প্রায় দেড় কোটি লোক প্রতিবন্ধী বলে অনুমান করা হয়। বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রের জনসংখ্যার চেয়ে এ সংখ্যা বেশি। এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকর্মকাণ্ডে কল্যাণকর কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না। অথচ প্রতিবন্ধিতা থেকে মুক্ত করা গেলে কিংবা তাদের কর্মোপযোগী করা গেলে এ বিপুল সংখ্যক মানুষ পরিবার, সমাজ বা দেশের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারত। তারা ব্যক্তিজীবনে কর্মক্ষমতার পরিচয় দিতে পারলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারত এবং জাতীয় জীবনেও তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হত। আমাদের একটু যত্ন ও ভালোবাসা পেলে ওরা সফল জীবনের অধিকারী হয়ে অন্য মানুষের মতোই স্বাভাবিক জীবনের অংশীদার হতে পারত। তারা তখন হয়ে উঠত দেশের জনসম্পদ।

প্রতিবন্ধী বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিশ্ব জুড়ে নানারকম কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। জাতিসংঘ এবং তার অঙ্গ সংগঠন ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, আই.এল.ও, ইত্যাদি বিশ্বের মানুষকে প্রতিবন্ধী সম্পর্কে সচেতন করার জন্য কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এসব কর্মসূচি বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে। জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী প্রতিবছর ৩রা ডিসেম্বর 'আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস' পালন করা হয়। এর উদ্দেশ্য পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের অবস্থা সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা, যাতে এদের সম্পর্কে তারা ইতিবাচক ধারণা লাভ করতে পারে এবং এদের সুপ্ত কর্মক্ষমতাকে উজ্জীবিত করতে পারে। বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন ও সেবামূলক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এ ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ প্রতিষ্ঠার শর্ত অনুযায়ী প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও পুনর্বাসনসহ সব দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার করে বাংলাদেশ উক্ত সনদে স্বাক্ষর করেছে।

বাংলাদেশ সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা ও পুনর্বাসন বিষয়ক কার্যক্রম শুরু করে। 'জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম' নামে একটি সংগঠন সরকারের সহযোগিতায় জাতীয় প্রতিবন্ধী নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৯৫ সালের নভেম্বর মাসে এ নীতিমালা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভায় 'জাতীয় প্রতিবন্ধী নীতিমালা' হিসেবে অনুমোদিত হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০০৬ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন করে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কোনো প্রতিবন্ধীকে যদি তার সুস্থ অঙ্গের উপযোগী কোনো কাজে নিয়োজিত করা যায় তাহলে স্বাভাবিক মানুষের মতোই কাজ করে সে নিজের জীবনকে সুন্দর করতে পারে, দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে। যার পা নেই সে হাতের কাজে দক্ষ হতে পারে। যে কানে শোনে না সে হাত,পা কিংবা চোখের সাহায্যে কাজ করতে পারে। হাত না থাকলে পায়ের সাহায্যেও কোনো কোনো কাজ করা সম্ভব। চোখের দৃষ্টি নেই যার, ব্রেইল পদ্ধতিতে সে লেখাপড়া করে তার শারীরিক ও অন্যান্য যোগ্যতা কাজে লাগাতে পারে। আসলে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ মানুষকে দক্ষ করে তোলে। তখন নানাক্ষেত্রে অবদান রাখার মতো সে যোগ্য হয়ে ওঠে। তার সম্পর্কে আলাদা করে ভাবনার আর কোনো প্রয়োজন থাকে না। প্রতিবন্ধী, কিন্তু সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের চেয়েও সচল – এমন লোকও সমাজে অনেক আছে।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এইসব মানুষের জীবনকে অবহেলা আর উপেক্ষা না করে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য নাগরিকের মতোই প্রতিষ্ঠা দেওয়া যায়। তবে সেই সঙ্গে দরকার অভিভাবক ও সমাজের সক্রিয় সমর্থন। সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের জীবনে সাফল্য আনয়ন করা সম্ভব। তারা কোনো না কোনো কাজ করার দক্ষতা অর্জন করতে পারলে পরিবার বা সমাজের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে এবং ওরা নিজেদের জীবনকেও সফল করে তুলবে। তার সুপ্ত কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে তাকে সকল মানুষের মতোই যোগ্যতার অধিকারী করতে হবে। এখন ওদের শুধু প্রয়োজন একটু যত্ন আর আমাদের অকৃত্রিম ভালোবাসা।

অনুশীলনমূলক কাজ

মূলবক্তব্য

দেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ প্রতিবন্ধী। শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোনো ত্রুটি বা মানসিক ভারসাম্যহীনতার জন্য তারা স্বাভাবিক জীবনযাপনে সমস্যায় পড়ে। প্রতিবন্ধিতার কারণে মানব জীবনের সম্ভাবনা বাধাগ্রস্ত হয়। তারা পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য কাজে দক্ষতার ঘাটতিতে পড়ে। উন্নত বিশ্বে প্রতিবন্ধীদের কল্যাণের জন্য নানারকম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের প্রতি সচেতন ও সহানুভূতিশীল হলে, তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দান করলে তাদের প্রতিবন্ধিতার সমস্যা বহুলাংশে দূর করা যায়। তখন তারা স্বাভাবিক মানুষের মতো জীবনযাপন করতে সমর্থ হয়। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের জন্য নানারকম কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের জন্য পরিবার, সমাজ ও দেশের সবার তৎপর হওয়া দরকার। এ ব্যাপারে সবাই সচেতন হলে এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে তারা দেশ ও জাতির জন্য স্বাভাবিক মানুষের মতোই সম্পদ হিসেবে প্রমাণ রাখবে।

শব্দার্থ ও টীকা

প্রতিনিয়ত – সবসময়। **সামর্থ্য** – যোগ্যতা। **বুদ্ধিবৃত্তি** – মেধাশক্তি। **সনাতনী**–পুরাতন। **ব্যাহত**–বাধাগ্রস্ত। **বাক্** – কথা। **উত্তরাধিকার**–বংশগতভাবে লাভ করা। **বিকলাঙ্গ**–বিনষ্ট অঙ্গ। **অপার**–সীমাহীন। **মমত্ব**–মমতা। **সুপ্ত** – ঘুমন্ত। **ব্রেইল পদ্ধতি**–দৃষ্টিহীনদের পড়ার জন্য বিশেষ পদ্ধতি। **ইতিবাচক**–অনুকূল।

ইউনিসেফ – UNICEF - United Nations International Children's Emergency Fund

ইউনেস্কো – UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

আই.এল.ও – ILO - International Labour Organization.

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস কোনটি?

ক. ৭ই এপ্রিল
খ. ৩রা ডিসেম্বর
গ. ২১শে ফেব্রুয়ারি
ঘ. ১৬ই ডিসেম্বর

২. 'ওদের জন্য প্রয়োজন একটু যত্ন ও অকৃত্রিম ভালোবাসা'। -এ উক্তিটি

i. ব্যঙ্গোক্তি
ii. প্রশংসাবাণী
iii. মানবতার বাণী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. ii ও iii

৩. একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর সাথে তুমি কী রকম আচরণ করবে?

i. পথ চলাতে সাহায্য করব।
ii. দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করব।
iii. চোখে ঔষধ দেওয়ার ব্যবস্থা করব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও ii

৪. 'মানুষের জীবন অপার সম্ভাবনাময়'-উদ্ধৃতিটি কোন তাৎপর্য বহন করে?

ক. মানুষ দীর্ঘজীবী হয়
খ. মানুষ অনেক কিছু করতে পারে
গ. মানুষের জীবনে কাজের সুযোগ আছে
ঘ. মানুষের ক্ষমতা অপরিসীম

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোনো ত্রুটি বা মানসিক ভারসাম্যহীনতার জন্য যারা স্বাভাবিক জীবন যাপনে সমস্যায় পড়ে তারাই প্রতিবন্ধী। প্রতিবন্ধিতার কারণে মানবজীবনের সম্ভাবনা বাধাগ্রস্ত হয়। উন্নত বিশ্বে প্রতিবন্ধীদের কল্যাণের জন্য নানারকম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের প্রতি সচেতন ও সহানুভূতিশীল হলে, তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দান করলে তাদের প্রতিবন্ধীতার সমস্যা বহুলাংশে দূর করা যায়। প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের জন্য পরিবার, সমাজ ও দেশের সবার তৎপর হওয়া দরকার।

ক. কারা প্রতিবন্ধী?
খ. মানুষকে কর্মক্ষম করতে হলে কী দূর করা দরকার?
গ. উদ্দীপকের আলোকে তোমার দেখা আমাদের সমাজের প্রতিবন্ধীদের অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত কর।
ঘ. 'প্রতিবন্ধিতার কারণে সমাজের উন্নয়ন ব্যাহত হয়'- বিশ্লেষণ কর।

খাদ্য ও পরিবেশ

আবদুল্লাহ আল মুতী

[লেখক পরিচিতি : আবদুল্লাহ আল মুতী সিরাজগঞ্জ জেলার ফুলবাড়ি গ্রামে ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কৃতিত্বপূর্ণ শিক্ষা জীবনের অধিকারী ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পদার্থবিদ্যা বিষয়ে এম.এসসি. ডিগ্রি লাভ করেন এবং আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা বিষয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি জনশিক্ষা পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের সচিব প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে, অবাক পৃথিবী, রহস্যের শেষ নেই, মেঘ বৃষ্টি রোদ, জানা অজানার দেশে, আবিষ্কারের নেশায়, বিজ্ঞান ও মানুষ, সাগরের রহস্যপুরী, এ যুগের বিজ্ঞান, প্রাণলোক : নতুন দিগন্ত ইত্যাদি। 'শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন' তাঁর অনুবাদগ্রন্থ। তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার ও ইউনেস্কোর কলিঙ্গ পুরস্কার লাভ করেছেন। ১৯৯৮ সালের ৩০ শে নভেম্বর আবদুল্লাহ আল মুতী পরলোকগমন করেন।]

পৃথিবীর আর সব জীবের মতো মানুষও তার আবির্ভাবের সময় থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করছে নিজের চারপাশের পরিবেশ থেকে। কালের প্রবাহে ক্রমে ক্রমে বদলে গিয়েছে মানুষ আর তার পরিবেশ, তেমনি সাথে সাথে বদলেছে তার খাদ্য সংগ্রহের পদ্ধতিও।

আদিম মানুষ প্রায় আক্ষরিক অর্থেই 'সংগ্রহ' করত তার খাদ্য। বনের গাছপালা থেকে পাওয়া যেত ফলমূল, শিকার থেকে পশুর মাংস। আজ থেকে মোটামুটি দশ হাজার বছর আগে মানুষ উদ্ভিদ আর পশুকে তার নিজের প্রয়োজনে পোষ মানাতে শেখে, অর্থাৎ উদ্ভব ঘটল কৃষি আর পশু-পালনের। তার ফলে খাদ্য উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পেল, সেই সঙ্গে বাড়ল মানুষের সংখ্যাও। আর ক্রমেই এই প্রক্রিয়ার ব্যাপক আর গভীর প্রভাব পড়তে লাগল চারপাশের পরিবেশে।

মানুষের আবির্ভাবের সময় থেকে উনিশ শতকের প্রথম দিকে পৃথিবীর জনসংখ্যা একশ কোটিতে পৌঁছতে সময় লেগেছিল প্রায় বিশ লক্ষ বছর। কিন্তু উনিশ আর বিশ শতকে এই বৃদ্ধির হার ক্রমেই দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়েছে। জনসংখ্যা দুশ কোটি হতে লেগেছে মোটামুটি একশ বছর, তিনশ কোটি হতে ত্রিশ বছর, তারপর চারশ কোটি হয়েছে ১৯৬০-৭৫ এই মাত্র পনের বছরে, পাঁচশ কোটি হয়েছে আরও এগার বছরে। এই সময়ে খাদ্য উৎপাদন অবশ্যই বেড়েছে, তবে এই বৃদ্ধি পৃথিবীর সব অঞ্চলে সমান তালে ঘটেনি। তাই আজ নানা দেশে অন্তত পঞ্চাশ কোটি লোক গুরুতর অনাহার আর অপুষ্টির শিকার। দু হাজার সাল আসতে আসতে এই সংখ্যা বেড়ে পঁচাত্তর কোটিতে পৌঁছতে পারে।

আদিম সমাজে খাদ্য উৎপাদন আর খাদ্য গ্রহণ ঘটত মোটামুটি একই জায়গায়। তার ফলে খাদ্য গ্রহণের পর বর্জ্য জৈব পদার্থ সবই ফেরত যেত একই পরিবেশে। তাতে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকত। আজ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বেড়েছে নগরায়ণের হার। বাণিজ্য বিকাশের ফলে প্রায়শ খাদ্য গ্রহণ করা হচ্ছে উৎপাদনস্থল থেকে বহু দূরে। অনেক ক্ষেত্রেই বর্জ্য জৈববস্তু আর জমিতে ফেরত যাচ্ছে না। সেই সাথে বেড়েছে বনাঞ্চলের বিনাশ, ভূমিক্ষয় আর মরুকরণ। এসবের ফলে পরিবেশের যথেষ্ট অবনতি ঘটছে, আর খাদ্য উৎপাদনের ওপরও তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে আরম্ভ করেছে।

পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু মানুষের মুখে খাদ্য যোগাতে হলে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপক উদ্যোগ নিতে হবে। কিন্তু এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্যা আজ হয়ে উঠেছে রীতিমতো জটিল। উদ্ভিদ নিধন, অদক্ষ সেচ ব্যবস্থা আর কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার কৃষি আর পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে খাদ্য উৎপাদনের হার কম হবার একটি কারণ হল মাথাপিছু জমির স্বল্পতা। অনেক ক্ষেত্রেই মাথাপিছু জমি এক হেক্টরের এক-চতুর্থাংশেরও কম। কৃষির উদ্ভব থেকে মোটামুটি ১৯৫০ সাল পর্যন্ত খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির একটি প্রধান উপায় ছিল চাষের জমির পরিমাণ বাড়ানো। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে চাষের জমির পরিমাণ বাড়ানো ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। পৃথিবীর অন্তত এক-তৃতীয়াংশ লোক আজ এমন সব দেশে বাস করছে যেখানে মাথাপিছু চাষের জমি ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। এ অবস্থায় কৃষিপ্রযুক্তির বিকাশ ঘটানো ছাড়া কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর আর কোনো পথ খোলা নেই।

পৃথিবীতে আজ চাষের উপযোগী জমির পরিমাণ মোটামুটি ৩২০ কোটি হেক্টর। এর মধ্যে ১৫০ কোটি হেক্টর অর্থাৎ ৪৭ শতাংশ জমি ইতোমধ্যেই চাষের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। চাষযোগ্য যেসব জমি এখনও ব্যবহার করা হচ্ছে না, আশা করা যাচ্ছে অচিরেই এই সকল জমির দশ থেকে পনের শতাংশ চাষের আওতায় আসবে। কিন্তু যেসব দরিদ্র লোকের জমির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, এসব জমি তাদের কাছে লভ্য হবার সম্ভাবনা কম। অন্যদিকে শিল্পায়ন, নগরায়ণ, গ্রামে বসতবাড়ির প্রসার- এসব কারণে কৃষি জমির পরিমাণ ক্রমাগতই সঙ্কুচিত হচ্ছে। এ ছাড়া প্রবল ভূমিক্ষয়, মরুকরণ, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা প্রভৃতি কারণেও অনেক জমির উৎপাদনশক্তি কমে যাচ্ছে। যদিও বা কিছু নতুন জমি চাষের আওতায় আসছে, সচরাচর এ ধরনের জমির উর্বরতা হচ্ছে নিম্নমানের।

এই শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে কৃষিক্ষেত্রে এক প্রযুক্তিগত বিপ্লব ঘটেছে। কৃষি প্রযুক্তিতে নতুন নতুন উদ্ভাবন উৎপাদনের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। প্রচুর পানি, রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক সংযোগে দ্রুতবর্ধনশীল, খরা ও রোগ-প্রতিরোধী নতুন নতুন জাতের ফসলের চাষ কৃষির ফলন বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আগে যেখানে প্রধানত বাড়ানো হত জমি, এখন তার স্থান নিয়েছে রাসায়নিক শক্তি ও উন্নত প্রযুক্তি। গত দু দশকে বহু উন্নয়নশীল দেশে এসব নতুন কৃষি প্রযুক্তি বিস্তার লাভ করেছে।

বারবার চাষের ফলে জমি থেকে পুষ্টি-পদার্থ অপসারিত হয়। আধুনিক কৃষিতে উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যাবহারের সাথে সাথে রাসায়নিক সারের মাধ্যমে জমিতে উদ্ভিদের পুষ্টি-পদার্থ (নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম) যোগানোর প্রয়োজনীয়তা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। ১৯৫০ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে পৃথিবীতে রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমাণ প্রায় নয় গুণ বৃদ্ধি পেয়ে বারো কোটি টনে দাঁড়িয়েছে। এই সময়ের মধ্যে সারা পৃথিবীতে মাথাপিছু রাসায়নিক সারের ব্যবহার ৫ কেজি থেকে বেড়ে হয়েছে ২৫ কেজি। পৃথিবীর অন্তত এক-তৃতীয়াংশ লোকের খাদ্য আজ সম্পূর্ণতই রাসায়নিক সারের বদৌলতে পাওয়া। অবশ্য বিভিন্ন দেশে সার ব্যবহারের হারের যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়, আর সার ব্যবহার বাড়লে অতিরিক্ত সার প্রয়োগজনিত কারণে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমাগত কমতে থাকে।

আবার রাসায়নিক সারের ব্যাপক ব্যবহার পরিবেশে নানা ধরনের সমস্যারও জন্ম দিচ্ছে। হিসেবে দেখা যায়, সচরাচর জমিতে যে পরিমাণ সার প্রয়োগ করা হয় তার মাত্র পঞ্চাশ শতাংশ উদ্ভিদের কাজে লাগে, বাকিটা ধুয়ে নদীনালায় বা ভূতলের পানিতে মেশে। পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে, পানিতে বা জমিতে এভাবে অতিরিক্ত নাইট্রোজেন বা ফসফরাস জমা হলে পানিতে যেসব জীবন বাস করে তাদের জীবনচক্রে পরিবর্তন ঘটায় এবং তাতে পানি ও বায়ুমণ্ডলের দূষণ ঘটে। পানি এবং জমিতে নাইট্রেটের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তা খাদ্যের মাধ্যমে মানুষের দেহে প্রবেশ করেও স্বাস্থ্যের হানি ঘটায়।

রাসায়নিক সার ব্যবহারের ক্ষতির চেয়েও রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের সম্ভাব্য বিপদ নিয়ে সাম্প্রতিককালে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। নানা ধরনের কীটপতঙ্গ, উদ্ভিদের রোগ বা আগাছা থেকে পৃথিবীতে মোট শস্যহানির পরিমাণ ৩০-৪০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এসব নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের দেশের তুলনায় নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত উন্নয়নশীল দেশগুলোতেই বেশি হয়ে থাকে।

রাসায়নিক সারের মতোই কীটনাশকেরও একটা অংশ পরিবেশের মধ্যে থেকে যায় এবং পরে মানুষ ও পরিবেশের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে। কীটনাশক মাত্রই কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য প্রাণীর দেহে বিষক্রিয়া ঘটায়। সাম্প্রতিক এক হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় পনের লক্ষ লোক কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়- তার মধ্যে অর্ধেকেই উন্নয়নশীল দেশে। এর ফলে বছরে মৃত্যু ঘটে প্রায় ত্রিশ হাজার লোকের, যার তিন-চতুর্থাংশই উন্নয়নশীল দেশে।

জমিতে যে কীটনাশক প্রয়োগ করা হয় তার কিছু অংশ খাদ্যচক্রের মধ্য দিয়ে মানুষের দেহে প্রবেশ করে। ফসফরাস শ্রেণীর কীটনাশকগুলো অপেক্ষাকৃত স্বল্পস্থায়ী, কিন্তু ক্লোরিনঘটিত কীটনাশক ডি, ডি, টি'র স্থায়িত্বকাল পরিবেশে দশ থেকে পনের বছর।

পানিতে কীটনাশকের পরিমাণ এক শ কোটির মধ্যে এক থেকে দশ ভাগ হলেই অধিকাংশ মাছ মারা পড়ে। পুকুরে মাত্র কয়েক ফোঁটা এনড্রিন দিলে সে পুকুরের সব মাছ মারা যায়। মাটিতে খুব সামান্য পরিমাণ এনড্রিন থাকলেও তাতে মাটির অণুজীবের মৃত্যু ঘটে, তার জৈবগুণ নষ্ট হয়। আকাশ থেকে কীটনাশক ছিটানো হলে মৌমাছি প্রভৃতি অনেক উপকারী কীটপতঙ্গের মৃত্যু ঘটে। মাটিতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা তার তুলনায় অনেক নিরাপদ। তবে কীটনাশক মাটি থেকে চুঁইয়ে ভূতলের পানিতে মিশে সেখানেও পানির দূষণ ঘটায়।

তা ছাড়া কীটনাশকের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ফলে অনেক প্রজাতির কীটপতঙ্গ ক্রমেই কীটনাশক-প্রতিরোধী হয়ে উঠছে। গত দু দশকে এমনি প্রতিরোধী কীটপতঙ্গের প্রজাতির সংখ্যা মোটামুটি দুশ থেকে বেড়ে চার শ'র ওপরে দাঁড়িয়েছে।

আধুনিক কৃষিতে জলসেচের গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে। উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা অবশ্য প্রয়োজন। পৃথিবীর অনেক দেশে পানির অভাব খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বড় রকম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীতে আজ চাষের জমির মোটামুটি ১৫ শতাংশ জলসেচের আওতায় এসেছে, এই পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়ছে। তবে খেতে অতিরিক্ত জলসেচ করা হলে মাটির পুষ্টিবস্তু ধুয়ে চলে যায় এবং তাতে কৃষির ক্ষতি হয়। এ ছাড়া লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে লবণাক্ততা বা ক্ষারত্ব বৃদ্ধির ফলে।

পৃথিবীর অনেক অঞ্চলে জলসেচ ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত না হওয়ায় ম্যালেরিয়া, শিসটোসোমিয়াসিস, কৃমি রোগ প্রভৃতির ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটে পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশে যত রোগ দেখা যায় তার প্রায় ষাট শতাংশই পানিবাহিত। এসব রোগের শিকার হয় যেমন মানুষ, তেমনি গবাদি পশু। জলসেচের জন্য বাঁধ দেওয়া হলে তাও অনেক সময় পরিবেশের জন্য হুমকি সৃষ্টি করে।

পৃথিবীর অনেক অঞ্চলে ভূগর্ভের পানি জমিতে জলসেচের জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ক্ষয়পূরণের ব্যবস্থার দিকে নজর না দিয়ে এই পানির নির্বিচার ব্যবহারের ফলে অনেক ক্ষেত্রে ভূতলের পানির সংকট দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশে মিঠা পানির মৎস্যসম্পদ একদিকে যেমন সঙ্কুচিত হচ্ছে কৃষির সম্প্রসারণের ফলে, তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিল্পজাত দূষণে। বাংলাদেশসহ সব উন্নয়নশীল দেশেই পানি সম্পদের সমন্বিত ব্যবহারের ব্যবস্থা আজ একান্ত জরুরি হয়ে উঠেছে।

কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি, ব্যয় হ্রাস এবং পরিবেশগত ক্ষতি লাঘব করার লক্ষ্যে আজ বেশ কিছু নতুন প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটেছে। তার মধ্যে উদ্ভিদ প্রজনন, জৈব প্রকৌশল, জীবতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে উদ্ভিদের নাইট্রোজেন সংযোজন, সালোক-সংশ্লেষের দক্ষতা বৃদ্ধি, জমিতে স্বল্পতম চাষ, জৈব সারের প্রয়োগ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। জৈব প্রকৌশলের সাহায্যে আজ এমনসব নতুন জাতের উদ্ভিদ উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছে যাতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের প্রয়োজন কম হবে, যা খরা ও লবণাক্ততা সহ্য করতে পারবে এবং আরও এমনসব গুণসম্পন্ন হবে যা পরিবেশের জন্য কল্যাণকর।

পরীক্ষাগারে টিসু কালচার বা উদ্ভিদের কোষকলা চাষের সাহায্যে লক্ষ লক্ষ অবিকল একই গুণাগুণসম্পন্ন উদ্ভিদ সৃষ্টি আজ সম্ভব হচ্ছে। এর মাধ্যমে বাঞ্ছিত গুণযুক্ত উদ্ভিদের দ্রুত বংশ বিস্তার ঘটানো যাবে। জৈব পদ্ধতিতে নাইট্রোজেন সংযোজনের মতো সঞ্চার সম্ভব হলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার অনেকখানি কমে আসবে। স্বল্পচাষ প্রযুক্তি কৃষিক্ষেত্রে ভূমিক্ষয় রোধের সহায়ক হবে। সালোক-সংশ্লেষের মাধ্যমে উদ্ভিদ বর্তমানে সূর্যালোক থেকে যে শক্তিকে পাতায় বন্দি করে, তার পরিমাণ এক শতাংশের মতো। সালোক-সংশ্লেষের দক্ষতা বাড়ানো গেলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে তার ব্যাপক প্রভাব পড়বে।

কৃষি ও পশুপালনের মাধ্যমে মানুষ দীর্ঘকাল ধরে কতকগুলো বিশেষ বাঞ্ছিত গুণাগুণসম্পন্ন উদ্ভিদ এবং প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলেছে। এতে অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংখ্যাল্পতা ঘটতে ঘটতে অনেক ক্ষেত্রে সেগুলো পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের বিলুপ্তি আগেও স্বাভাবিক নিয়মে কিছুটা ঘটত, কিন্তু আজ যে ব্যাপক হারে প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটছে এবং জৈব উত্তরাধিকার ধ্বংস হচ্ছে, তাতে পরিবেশের ভারসাম্য বিপন্ন হয়ে উঠছে। সারা পৃথিবীতে আজ যে শক্তি-সংকট এবং পরিবেশের ক্রমবর্ধমান অবনতির সমস্যা দেখা দিয়েছে তা শিল্পোন্নত এবং উন্নয়নশীল সব দেশের জন্যই বিপদ সৃষ্টি করছে। এখন থেকে সচেতন হয়ে যদি উপযুক্ত প্রযুক্তি ও পদ্ধতি নির্বাচন করা হয় তাহলে সারা পৃথিবীর জন্য ভবিষ্যতে আরও জটিল সমস্যা হয়তো এড়ানো সম্ভব হবে।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎস

আবদুল্লাহ আল মুতীর 'খাদ্য ও পরিবেশ' প্রবন্ধটি তাঁর 'প্রাণলোক : নতুন দিগন্ত' গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

মূলবক্তব্য

মানুষ পৃথিবীতে আসার পর থেকেই চারপাশের পরিবেশ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করছে। কিন্তু বর্তমানে মানুষের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সংগ্রহের পদ্ধতিও বদলে গেছে। বর্তমানে বিশ্বে দ্রুত মানুষ বাড়ছে। এই বাড়তি মানুষের জন্য খাদ্যের প্রয়োজনে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হচ্ছে। মানুষ বাড়ছে কিন্তু জমির পরিমাণ কমছে। তাই সীমিত জমি থেকে বেশি ফলনের আশায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে কৃষি উৎপাদন বাড়লেও এসব মানুষ ও পরিবেশের জন্য তা হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় উন্নয়নশীল বিশ্বের অগণিত মানুষ অকালে প্রাণ হারাচ্ছে। এ অবস্থা মানুষের জন্য মারাত্মক বিপদ ডেকে আনবে। এ বিপদ থেকে মানবসমাজকে রক্ষা করতে হলে আমাদের উপযুক্ত প্রযুক্তি ও পদ্ধতি নির্বাচন করতে হবে।

শব্দার্থ ও টীকা

বর্জ্য- মানুষের বা কলকারখানায় ব্যবহারের পর পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি। **বিনাশ-** ধ্বংস। **বুভুক্ষু-** ক্ষুধার্ত। **নিধন-** হত্যা, ধ্বংস। **ভূতল-** ভূমির ওপরের অংশ। **কীটনাশক -** পোকামাকড় ধ্বংসের ঔষধ। **নাতিশীতোষ্ণ -** বেশি শীতও নয়, বেশি গরমও নয় এমন অঞ্চল। **নিরক্ষীয় অঞ্চল-** দুই মেরু থেকে সমান দূরে পৃথিবীকে পূর্ব পশ্চিমে বেষ্টনকারী কল্পিত বৃত্তাকার রেখাকে নিরক্ষরেখা বলে। নিরক্ষরেখায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে নিরক্ষীয় অঞ্চল বলে। **এনড্রিন-** এক ধরনের বিষাক্ত কীটনাশক। **প্রতিরোধী-** প্রতিরোধ করার ক্ষমতাসম্পন্ন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পৃথিবীর জনসংখ্যা একশ কোটিতে পৌঁছাতে কত বছর সময় লেগেছিল?

ক. দশ লক্ষ বছর খ. বিশ লক্ষ বছর
গ. ত্রিশ লক্ষ বছর ঘ. চল্লিশ লক্ষ বছর

২. খাদ্য গ্রহণের পর বর্জ্য ও জৈব পদার্থ পুনরায় একই পরিবেশে ফেরত যাওয়ার ফলাফল কোনটি?

ক. পরিবেশ দূষণ খ. উৎপাদন হ্রাস
গ. ভূমিক্ষয় ও বিনাশ ঘ. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা

৩. জমিতে উদ্ভিদ উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের প্রয়োজন কম হবে কিসের মাধ্যমে?

ক. সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে খ. জৈব প্রকৌশলের সাহায্যে
গ. জলসেচ ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত হালে ঘ. টিস্যু কালচারের মাধ্যমে

সৃজনশীল প্রশ্ন

বারেক মোল্লা সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ। তার পুকুর ভরা মাছ থেকে বাৎসরিক আয় প্রায় ১ লক্ষ টাকা। একদিন সকালে পুকুরে গোসল করতে নেমে বারেক মোল্লার মুর্চ্ছা যাবার দশা, চাষের মাছগুলো সব মরে ভেসে উঠেছে। চিৎকার করতে করতে বারেক মোল্লা বলল, "হে আল্লাহ, এ আমি কী করলাম।"

ক. উদ্ধৃতাংশটি কোন প্রবন্ধের আলোকে রচিত?
খ. বারেক মোল্লার কোন ধরনের কাজের জন্য মাছে মড়ক লেগেছে?
গ. পুকুরের মাছের মড়ক কোন ধরনের দূষণের ফল? তোমার পঠিত প্রবন্ধটির আলোকে মতামত ব্যক্ত কর।
ঘ. পুকুরের মাছ অথবা এ জাতীয় মড়ক লাগার মনুষ্যসৃষ্ট কারণগুলো বিশ্লেষণ কর।

দুর্নীতি ও তার প্রতিকার

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে রয়েছে বিপুল সম্ভাবনাময় মানব সম্পদ। ১৯৭১ সালে ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে একটি শোষণ ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু স্বাধীনতার এত বছর পরেও সেসব স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয় নি, সেই পথ পাড়ি দেওয়ার এখনও অনেক বাকি। আমরা এখনও দারিদ্র্যকে দূর করতে পারিনি; পারিনি স্বচ্ছতা ও সততাপূর্ণ গণতান্ত্রিক, মানবিক ও সুশাসিত রাষ্ট্র হিসেবে দেশকে গড়ে তুলতে। কিন্তু কেন পারিনি? এর অন্যতম প্রধান কারণ সীমাহীন দুর্নীতি।

দুর্নীতি বলতে কী বোঝায়

'দুর্নীতি' শুধু একটি বহুল আলোচিত শব্দই নয়, এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্ষতিকর সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। আমরা সাধারণভাবে ঘুষ দেওয়া-নেওয়াকেই বুঝি দুর্নীতি। কিন্তু দুর্নীতির প্রকৃত অর্থ আরও ব্যাপক। আভিধানিক সংজ্ঞা অনুযায়ী দুর্নীতি বলতে সরকারি ক্ষমতাকে ব্যক্তিগত লাভের জন্য ব্যবহার করাকে বোঝায়। সাধারণত ঘুষ, বল প্রয়োগ বা ভয় প্রদর্শন, প্রভাব খাটানো এবং জনপ্রশাসনের ক্ষমতা অপব্যবহারের দ্বারা কাউকে অন্যায়ভাবে বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জন করাকে দুর্নীতি বলা হয়।

ব্যাপক অর্থে দুর্নীতি হল সরকারি-বেসরকারি অফিস, প্রশাসন ও ব্যবসা ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার করা, অনৈতিক আনুকূল্য গ্রহণ ও প্রদান করা, রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো, ঘুষ দেওয়া-নেওয়া এবং ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাষ্ট্রীয় সম্পদ কুক্ষিগত করা।

দুর্নীতি কেন হয়

বিভিন্ন কারণে দুর্নীতি হয়ে থাকে। এর পেছনে যেমন ব্যক্তিগত কারণ কাজ করে, তেমনি পদ্ধতিগত কিছু কারণও এর প্রসারে ভূমিকা রাখে। সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে দুর্নীতির প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়–

১। জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অকার্যকারিতার কারণে দুর্নীতির মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

২। প্রশাসনে রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়।

৩। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব থাকার কারণে প্রশাসনে ব্যাপক দুর্নীতি জেঁকে বসে।

৪। দুর্নীতিবাজদের জন্য শাস্তির অপ্রতুলতার কারণে দুর্নীতি পরোক্ষভাবে উৎসাহিত হয়।

৫। শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অভাবে দুর্নীতি প্রসারিত হয়।

৬। নির্দিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা দুর্নীতির অন্যতম কারণ।

৭। ক্রমবর্ধমান ভোগবাদী প্রবণতা ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়া হয়।

৮। ধনী-দরিদ্রের আয় ব্যয়ের অসামঞ্জস্যতা মানুষকে দুর্নীতির দিকে ঠেলে দেয়।

দুর্নীতির প্রভাব

দুর্নীতি বাংলাদেশে উন্নয়ন, সুশাসন, দারিদ্র্য বিমোচন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রধানতম অন্তরায়। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষিতে দুর্নীতির ক্ষতিকর প্রভাব অনেক বেশি। দুর্নীতি দারিদ্র্য ও সকল প্রকার অন্যায়–অবিচার বাড়ায়। দুর্নীতির ফলে উন্নয়ন ব্যাহত হয়, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। আর এসব কারণে সমাজে অপরাধ প্রবণতা, সামাজিক অস্থিতিশীলতা ও অসন্তোষ বাড়ে।

অর্থনৈতিক প্রভাব

লক্ষ করা যায়, দুর্নীতির কারণে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের স্বার্থের কথা উপেক্ষিত হয়। ফলে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগ হ্রাস পায়, সম্পদের প্রাপ্যতা কমে, দারিদ্র্যের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায় এবং রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়। গবেষণালব্ধ বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশে দুর্নীতির মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনতে পারলে মাথাপিছু জাতীয় আয় বছরে কমপক্ষে শতকরা তিন ভাগ বাড়ানো সম্ভব। এভাবে দুর্নীতির কারণে জনগণ সরাসরি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রাজনৈতিক প্রভাব

দুর্নীতির ব্যাপক প্রভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়; ফলে রাষ্ট্র, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সরকার ও মৌলিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট হয়। দুর্নীতির কারণে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ঘটে, ফলে দেশের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড গতিহীন হয়ে পড়ে। সন্ত্রাসনির্ভর রাজনৈতিক দলের সদস্যরা দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ, মূল্যবোধ, দেশপ্রেম বিবর্জিত একটি দেশে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নীতি নির্ধারণ পদ্ধতি ব্যর্থ হয়। আর এ কারণেই সরকারের ওপর জনগণের আস্থা নষ্ট হয়।

সামাজিক প্রভাব

দুর্নীতির কারণে মানব উন্নয়ন চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। অল্প সংখ্যক মানুষের হাতে বিপুল পরিমাণ সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়ায় সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। এর ফলে মৌলিক অধিকার খর্ব হয়, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় সাধারণ জনগণের প্রবেশ দুরূহ হয় এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পায়। দুর্নীতির ফলে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে, শিক্ষার মান হ্রাস পায়, সামাজিক ন্যায়বিচার–প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়এবং সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে বলে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

দুর্নীতি কীভাবে রোধ করা যায়

দুর্নীতি হঠাৎ করে ঘটে না। এটি বিস্তার লাভ করতে যথেষ্ট সময় নেয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে যারা ক্ষমতাবান তাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুর্নীতি বিস্তার লাভ করে। কাজেই শুরুতেই যদি দুর্নীতি প্রতিরোধ করা না যায়, তাহলে এটি ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং ধীরে ধীরে পুরো শাসনব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। দুর্নীতি প্রতিরোধ করাই হল দুর্নীতি হ্রাস করার প্রথম পদক্ষেপ।

দুর্নীতি প্রতিরোধক ব্যবস্থা :

১। রাজনৈতিক সদিচ্ছাই দুর্নীতি প্রতিরোধের মূল চাবিকাঠি।

২। একটি সচেতন ও কার্যকরী জাতীয় সংসদ হতে পারে দুর্নীতি প্রতিরোধের অন্যতম ভিত্তি।

৩। প্রশাসন ও সংসদের প্রভাবমুক্ত বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব।

৪। দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫। দুর্নীতি দমন বিভাগ পুনর্গঠন ও ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা এবং তা কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬। জনগণের তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে (অর্থাৎ তথ্যের গোপনীয়তা দূর করে) সকল প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠাকরণ।

৭। দুর্নীতি বিরোধী সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের সমন্বিত প্রতিবাদের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৮। গণমাধ্যম ও নানা ধরনের প্রচারণার মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ।

দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীরা যাতে ঘুষ ও দুর্নীতিতে জড়িত হতে না পারে তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৪৭ সালে 'দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন' প্রণয়ন করা হয়। ১৯৫৭ সালে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির আয় ও ব্যয়ের অসমতাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। ২০০৪ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২০০৭ সালে এ কমিশন পুনর্গঠন ও এর বিধিমালা সংস্কারের ফলে কমিশনের লক্ষ্য অর্জনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

দুর্নীতি একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন দেশে। দুর্নীতির আন্তর্জাতিক প্রভাব উপলব্ধি করে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৯৬ সালে ঘুষ ও দুর্নীতিবিরোধী জাতিসংঘ ঘোষণা গ্রহণ করে। ২০০৩ সালের ৩১শে অক্টোবর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ দুর্নীতিবিরোধী সনদ প্রণয়ন করে, যা ২০০৩ সালের ৯ই ডিসেম্বর মেক্সিকোতে স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এ কারণে ৯ই ডিসেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এ সনদে প্রায় ১৫০টি দেশ স্বাক্ষর করেছে। সরকার কর্তৃক এ সনদে অনুস্বাক্ষরের ফলে ২০০৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি থেকে বাংলাদেশ এই গুরুত্বপূর্ণ জাতিসংঘ সনদের অংশীদার দেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

দুর্নীতি একটি সামাজিক ব্যাধি। দুর্নীতির কারণে আর্থ-সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয় এবং ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। এর প্রতিকারের জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি সাধারণ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ। দুর্নীতি রোধে নাগরিক সমাজ, বিশেষ করে তরুণদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সকল অনিয়মের বিরুদ্ধে তরুণরা সবসময় সোচ্চার। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২–র ভাষা আন্দোলন, ৬৯এর গণঅভ্যুত্থান–সকল পর্যায়েই বঞ্চিত, নিপীড়িত জাতিকে মুক্তির আলো দেখিয়েছে এ দেশের তরুণ সমাজ। ১৯৭১ সালে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিশ্ব ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সকলের প্রত্যাশা, এ দেশের তরুণরা অতীতের মতোই বারবার প্রমাণ করবে দেশের প্রতি তাদের একনিষ্ঠ ভালোবাসা। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আজ তাই তীব্র সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে নিঃস্বার্থ ও দুঃসাহসী তারুণ্যের সেই বলিষ্ঠ ভূমিকার কোনো বিকল্প নেই।

** ১লা নভেম্বর ২০০৭ তারিখ থেকে বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ (প্রশাসন) থেকে পৃথক হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করেছে।*

অনুশীলনমূলক কাজ

মূলবক্তব্য

সাধারণভাবে দুর্নীতি বলতে ঘুষ লেনদেনকে বোঝায়। ব্যাপক অর্থে দুর্নীতি বলতে বোঝায় সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় স্বজনপ্রীতি, ঘুষ, চাঁদা বা কমিশনের বিনিময়ে কাউকে অবৈধ সুযোগ প্রদান। কোনো উপহার বা সুযোগ সুবিধার বিনিময়ে সরকারি কাজে অবৈধভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ, সরকারি সম্পদ আত্মসাৎসহ সব ধরনের অন্যায় কাজ দুর্নীতির আওতাভুক্ত। দুর্নীতির মাধ্যমে অনৈতিকভাবে উভয় পক্ষই লাভবান হতে পারে। দুর্নীতির কারণে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এবং দারিদ্র্য বাড়ে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকারের সকল প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণসহ প্রচলিত বিভিন্ন আইনের সংশোধন ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। তবে সমাজ থেকে দুর্নীতি পুরোপুরি নির্মূল করতে হলে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে তরুণদের। বর্তমান প্রজন্মের দুঃসাহসী তরুণরাই পারে এ দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে।

শব্দার্থ ও টীকা

উন্নয়ন – উন্নতি, উৎকর্ষ সাধন। **অন্তরায়** – প্রতিবন্ধক। **উত্তরণ** – উত্তীর্ণ, গন্তব্যস্থানে আগমন। **লঙ্ঘন** – অতিক্রম, ডিঙানো। **ঘুষ** – উৎকোচ; অনুচিত বা অন্যায় কার্যসিদ্ধির জন্য গোপনে প্রদত্ত অর্থাদি। **কুক্ষিগত** – উদরসাৎ, আত্মসাৎকৃত। **আমলাতন্ত্র** – উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত প্রশাসন ব্যবস্থা। **ন্যায়পাল** – ন্যায় বা সুবিচারের সংরক্ষক, বিচারক। **উন্নয়নশীল দেশ** – যেসব দেশ উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, যেমন: বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান। **ভোগবাদী** – ভোগই যাদের কাম্য, অর্থাৎ যারা নিজের ভোগবিলাস নিয়ে ব্যস্ত। **অবক্ষয়** – ক্রমে ক্রমে ক্ষয়ে যাওয়া, ক্ষয়প্রাপ্তি, বিনাশ। **গবেষণালব্ধ** – গবেষণা করে পাওয়া। **অবকাঠামো** – মধ্যস্থিত ব্যাপ্ত অদৃশ্য কাঠামো। **খর্ব** – নষ্ট হওয়া, ভেঙে যাওয়া, পুঞ্জীভূত – একত্রিত করা।

বিশ্বায়ন – ইংরেজি শব্দ Global অর্থ বৈশ্বিক। Global কথাটি থেকে এসেছে Globalisation বা বিশ্বায়ন। বিশ্বায়ন বলতে বোঝায় সমগ্র বিশ্বকে একটিমাত্র বিশাল বাজারে একত্রীকরণ। সাধারণভাবে বিশ্বায়ন হচ্ছে দ্রব্য উৎপাদন, বিনিয়োগ ও প্রযুক্তির আন্তঃদেশীয় অবাধ প্রবাহ। বিশ্বায়নের প্রভাবে বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রমেই জোরদার হয়েছে।

মেক্সিকো – একটি দেশের নাম। এটি উত্তর আমেরিকায় অবস্থিত। ২৮টি রাজ্যের সমন্বয়ে গঠিত মেক্সিকোর রাজধানীর নাম মেক্সিকো সিটি। এর আয়তন ১৯৫৮ হাজার বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা প্রায় ৯,৩৩,৪২,০০০।

১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন – ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানবাসী বাঙালিদের আন্দোলন। ৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বাংলা ভাষার দাবিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকার রাজপথে মিছিল বের করে। সরকারের আদেশে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে ঐক্যবোধ সেই মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি চালায়। এতে নিহত হয় রফিক, সালাম, জব্বার, বরকত প্রমুখ তরুণ। সেই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে দেশব্যাপী গণবিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কিত পাকিস্তান সরকার তখন বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান – ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির চেতনা এ দেশের বাঙালিকে শোষকের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করতে শেখায়। ফলে ১৯৬৯ সালে বাঙালিরা স্বাধিকার আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয় ও গণঅভ্যুত্থান ঘটায়। নানাপ্রকার

জেলজুলুম, অত্যাচার ও মৃত্যুকে বরণ করে বাঙালিরা প্রতিবাদমুখী হয়ে ওঠে। এ দেশের ইতিহাসে এ আন্দোলন ৬৯–এর গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত।

জাতিসংঘ – ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সমাপ্তির পর বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা United Nations Organization বা জাতিসংঘ (UNO)। ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর সানফ্রান্সিসকোতে জাতিসংঘের দলিলটি ৫০টি দেশের প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের প্রস্তাবে 'জাতিসংঘ' নামকরণ করা হয়। এর প্রধান কার্যালয় নিউইয়র্কে অবস্থিত। জাতিসংঘের উদ্দেশ্য হল : আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করা। দারিদ্র্য, রোগ, অশিক্ষা ইত্যাদি দূরীকরণের প্রচেষ্টা চালানো জাতিসংঘের অন্যতম কাজ। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৯১। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের ১৩৬ তম সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর সামাজিক সমস্যা কোনটি?

ক. দারিদ্র্য　　খ. অশিক্ষা

গ. দুর্নীতি　　ঘ. সাম্প্রদায়িকতা

২. আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি বৃদ্ধির কারণ-

ক. ভোগবাদী প্রবণতা　　খ. মূল্যবোধের অভাব

গ. রাজনৈতিক প্রভাব　　ঘ. ধনী দরিদ্রের পার্থক্য

৩. দুর্নীতি হ্রাস করার প্রথম পদক্ষেপ কোনটি ?

ক. দুর্নীতি প্রতিরোধ　　খ. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

গ. শাস্তিমূলক ব্যবস্থা　　ঘ. দুর্নীতির মাত্রা হ্রাস করা

৪. দুর্নীতি রোধে কার ভূমিকা সর্বাধিক বলে মনে করা হয়-

i. তরুণ সমাজ

ii. নাগরিক সমাজ

iii. গ্রামীণ সমাজ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

অনুচ্ছেদটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জামাল সাহেব সরকারের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা। অর্থনৈতিকভাবে তিনি অত্যন্ত সচ্ছল । মার্বেল পাথরের সিঁড়ি আর সেগুন কাঠের আসবাবপত্রই প্রমাণ করে তিনি উপার্জন করেন অনেক। তার দুই সন্তান বিদেশে লেখাপড়া করে। লোকে বলে ক্ষমতার অপব্যবহার করেই তিনি এই সম্পদের অধিকারী হয়েছেন।

ক. জামাল সাহেবের আয়ের উৎস কী কী?

খ. জামাল সাহেব ক্ষমতার অপব্যবহার করেন– এর যৌক্তিক ব্যাখ্যা দাও।

গ. উদ্ধৃতাংশের বর্ণনা থেকে প্রমাণ কর যে জামাল সাহেব একজন দুর্নীতিপরায়ন লোক।

ঘ. জামাল সাহেবের দুর্নীতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব আলোচনা কর।

তথ্য প্রযুক্তি

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

[লেখক পরিচিতি : মুহম্মদ জাফর ইকবালের জন্ম ১৯৫২ সালে সিলেট শহরে। তাঁর গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনা জেলায়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানে পড়াশোনা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘ আঠারো বছর থেকে তিনি দেশে ফিরে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে যোগ দেন। তিনি শিশু কিশোরদের জন্যে লেখালেখি করেন। বিজ্ঞান বিষয়ক লেখার জন্যে তাঁকে ২০০৪ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'আমি তপু', 'বৃষ্টির ঠিকানা', 'প্রোজেক্ট নেবুলা', 'নিঃসঙ্গ গ্রহচারী', 'নিতু ও তার বন্ধুরা', 'ক্রমিয়াম অরণ্য' ও 'দীপু নম্বর টু' উল্লেখযোগ্য।]

বর্তমান পৃথিবীটা হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির পৃথিবী। কথাটা যে সত্যি সেটা খুব সহজেই প্রমাণ পাওয়া যায়। আজ থেকে এক যুগ আগে কারো কোনো তথ্যের প্রয়োজন হলে মানুষেরা বই খুলে দেখতো—এখন আর কেউ সেটা করে না। যখন কারো তথ্যের প্রয়োজন হয় সে কম্পিউটারের সামনে বসে, কী-বোর্ডে দুই একটি টোকা দেয়, মাউসে কয়েকবার ক্লীক করে। সাথে সাথে সেই তথ্য চোখের পলকে তার কাছে চলে আসে—তথ্যটি পাশের রাস্তা থেকে এসেছে নাকি পৃথিবীর অন্য পাশ থেকে এসেছে সেটা আজকাল কেউ জানতেও চায় না। জানার প্রয়োজনও নেই। কারণ পুরো পৃথিবীটা এখন সবার হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। এই অসাধারণ ব্যাপারটি ঘটা সম্ভব হয়েছে তথ্য প্রযুক্তির একটা বিপ্লবের কারণে।

তথ্য প্রযুক্তি নামে সারা পৃথিবীতে যে বিপ্লবটি ঘটেছে তার পিছনে যে যন্ত্রটি কাজ করছে তার নাম ডিজিটাল কম্পিউটার। কম্পিউটারের ভেতরকার ইলেকট্রনিক প্রকিয়া করার জন্যে সম্ভাব্য সব সিগনাল ব্যবহার না করে সুনির্দিষ্ট কিছু সিগনাল বা ডিজিটাল সিগনাল ব্যবহার করা হয় বলে এর নাম ডিজিটাল কম্পিউটার। আমাদের বর্তমান পৃথিবী এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এখন খুব কম লোকই খুঁজে পাওয়া যাবে যার জীবনকে কোনো না কোনো ভাবে কম্পিউটার স্পর্শ করেনি। হিসেব নিকেশ করতে কম্পিউটারের দরকার হয়, ব্যবসাপাতিতে কম্পিউটার দরকার হয়, এমন কি শিল্পসাহিত্য বা বিনোদন করতেও আজকাল কম্পিউটারের দরকার হয়। ১৯৭৭ সালে ভয়েজার ১ আর ২ নামে দুটো মহাকাশযান সৌর জগতে তাদের যাত্রা শুরু করেছিল। সৌরজগৎ পাড়ি দেবার সময় মহাকাশযান দুটো গ্রহগুলোর পাশে দিয়ে গিয়েছে এবং যাবার সময় সেই গ্রহগুলো সম্পর্কে নানা তথ্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। ছোট একটি যন্ত্র হয়েও পৃথিবীর গবেষকদের কাছে সবচেয়ে বেশি তথ্য পাঠানোর কৃতিত্বটুকু ভয়েজার মহাকাশযানগুলোকে দেওয়া হয়। এই চমকপ্রদ কৃতিত্বটুকুর পিছনে ছিলো একটা কম্পিউটার, যেটি ভয়েজার মহাকাশযানকে সৌরজগতের ভেতর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে, তথ্য সংগ্রহ করেছে এবং নিখুঁতভাবে সেই তথ্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। কেউ যেন মনে না করে যে, ভয়েজার মহাকাশযানের কম্পিউটার বুঝি ছিল অসাধারণ কোনো কম্পিউটার। বস্তুত সেগুলো ছিলো খুবই সাধারণ কম্পিউটার। সত্যি কথা বলতে কি আমরা এখন যে কম্পিউটার ব্যবহার করি তার তুলনায় ১৯৭৭ সালের সেই কম্পিউটার ছিল প্রায় একটা খেলনার মতো। তারপরেও সেটি অসাধ্য সাধন করেছিল, কারণ বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে বসে যখন যেভাবে প্রয়োজন তখন সেভাবে প্রোগ্রাম করে কম্পিউটারটিতে পাঠাতেন। কম্পিউটারটিও তাই যখন যেরকম প্রয়োজন সেভাবে তার দায়িত্ব পালন করত। অন্য যে-কোনো যন্ত্র থেকে সে কারণে কম্পিউটার আলাদা এবং এটাই কম্পিউটারের সবচেয়ে বড় শক্তি। একটা কম্পিউটারকে কোন কাজে ব্যবহার করা হবে সেটা নির্ভর করে মানুষের ওপরে। একজন মানুষ যত সৃজনশীল হবে কম্পিউটারের কাজকর্ম হবে তত চমকপ্রদ।

কম্পিউটার ব্যবহার করে যে অসংখ্য কাজ করা যায় তার একটি হচ্ছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, যেখানে কম্পিউটাকে একসাথে জুড়ে দেওয়া হয়। কেউ যেন মনে না করে, এতে শুধু একটা ঘরের কয়েটা কম্পিউটার কিংবা একটা প্রতিষ্ঠানের কয়েকটা কম্পিউটারকে জুড়ে দেয়া হয়। আসলে সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কম্পিউটারকে একসাথে জুড়ে দিয়ে বিশাল একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে। সেটা ঠিকভাবে করার জন্যে তথ্য বিনিময় বা তথ্য যোগাযোগের নতুন নতুন প্রযুক্তি গড়ে উঠেছে। তার একটি হচ্ছে ফাইবার অপটিক্স, যেখানে চুলের মতো সূক্ষ্ম একটা কাচের তন্তুর ভেতর দিয়ে তথ্য পাঠানো যায়। সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হচ্ছে তথ্যটা বৈদ্যুতিক সংকেত হিসেবে যায় না, সেটা যায় আলো হিসেবে। সেই আলো কিন্তু দৃশ্যমান আলো নয়, সেটি অবলাল আলো, আমরা তাই চোখে সেটা দেখতেও পাই না। ফাইবার অপটিক প্রযুক্তির সাথে ব্যবহার করার জন্যে রকমারি প্রযুক্তি গড়ে উঠেছে এবং সব কিছু মিলিয়ে এখন রয়েছে পৃথিবী জোড়া বিশাল কম্পিউটার নেটওয়ার্ক।

সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কম্পিউটার একসাথে জুড়ে দেওয়ার পর সেটা দিয়ে অনেক কিছুই করা সম্ভব। কিছু করা হয়েছে, কিছু করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে কী করা যাবে সেটা নিয়ে পৃথিবীর সৃজনশীল মানুষেরা সবসময় চিন্তা করছে। পৃথিবীজোড়া বিশাল নেটওয়ার্কের একটা ব্যবহারের কথা আমরা মোটামুটি সবাই শুনেছি—সেটি হচ্ছে ইন্টারনেট। সাধারণ তথ্যের জন্যে এখন ইন্টারনেটের কোনো বিকল্প নেই। মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের সব খবরাখবর ইন্টারনেট থেকে নেয়। শুধু সে বাস ট্রেন বা প্লেনের সময়সূচি ইন্টারনেটে পাওয়া যায় তা নয়, সেগুলোর টিকেটও ইন্টারনেটে কেনা যায়। পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ এখন সত্যিকারের খবরের কাগজ না পড়ে ইন্টারনেটে খবর পড়ে। গবেষণার জার্নাল এখন ইন্টানেটে প্রকাশ করা হয়। কেনাকাটার সবচেয়ে বড়পদ্ধতি এখন ইন্টারনেট। জিনিষপত্র নিলামে বিক্রি করতে হলে এখন ইন্টারনেটের চাইতে ভালো কোনো উপায় নেই। রেডিও টেলিভিশন ইন্টারনেটে চলে এসেছে, বন্ধুত্ব বা নানারকম সামাজিক কর্মকাণ্ড এখন ইন্টারনেট ঘিরে গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞাপন বা নির্বাচনি প্রচারণার জন্যে এখন ইন্টানেটের চাইতে ভালো কোনো উপায় নেই। অর্থাৎ, এক কথায় বলা যায়—সরল কিংবা জটিল, সহজ কিংবা কঠিন, গুরুত্বপূর্ণ কিংবা তুচ্ছ সব কাজই এখন ইন্টারনেট ব্যবহার করে করা হচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে এর ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলা যায়, যারা ইন্টারনেট থেকে বিচ্ছিন্ন, তারা জোর কদমে ছুটে চলা পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না, দেখতে দেখতে তারা পিছিয়ে পড়বে।

পৃথিবী জোড়া লক্ষ লক্ষ কম্পিউটারর নেটওয়ার্কের ওপর নির্ভর করে শুধু যে ইন্টারনেটে তথ্য বিনিময় গড়ে উঠেছে তা নয়, বিজ্ঞানীরা এবং গণিতবিদরা সেটাকে গবেষণার কাজেও ব্যবহার করেন। একটা ছোট কম্পিউটার ছোট একটা কাজ করতে পারে কিন্তু লক্ষ লক্ষ কম্পিউটারকে যদি একসাথে করা হয় তাহলে তারা বিশাল কাজ করে ফেলতে পারে। পৃথিবরি সবচেয়ে বড় প্রাইম সংখ্যা এভাবে খুঁজে বের করা হয়েছে। কম্পিউটার যখন ব্যবহার করা হয় না তখন অলস হয়ে বসে না থেকে বিজ্ঞানী কিংবা গণিতবিদদের বড় বড় সমস্যা সমাধানের কাজে লেগে যেতে পারে। এটি হচ্ছে মাত্র একটি উদাহরণ—আরো অনেক উদাহরণ আছে এবং সবচেয়ে বড় কথা—ভবিষ্যতে আরো সুন্দর আরো চমকপ্রদ উদাহরণ আসবে সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

'কম্পিউটার কথাটি বলা হলেই আমাদের চোখের সামনে কম্পিউটারের যে ছবিটি ভেসে ওঠে তা হলে—টেলিভিশনের মতো মনিটর, কী বোর্ড, মাউস এবং চৌকোনো বাক্সের মতো সি.পি.ইউ। কিন্তু সেটাই কম্পিউটারের একমাত্র রূপ নয়। আজ কাল ব্যাটারি চালিত ল্যাপটপ চলে এসেছে, সেটা ব্যাগে নিয়ে চলাফেরা করা যায়। আবার বিশাল আকারের সুপার কম্পিউটার রয়েছে যেটাকে শীতল রাখার জন্যেই রীতিমতো দক্ষযজ্ঞের আয়োজন করতে হয়। যেরকম বড় কম্পিউটার রয়েছে ঠিক সেরকম ছোট কম্পিউটারও রয়েছে যেগুলো মোবাইল টেলিফোন, ক্যামেরা, ফ্রীজ, ওভেন কিংবা লিফটের মতো দৈনিন্দিন ব্যবহারি জিনিষের মাঝে বসানো আছে। আমরা আলাদাভাবে কম্পিউটারকে দেখি না, কিন্তু সেটা আমাদের চোখের আড়ালে অসংখ্যা যন্ত্রপাতিকে সচল করে রাখছে। একসময় টেলিফোন ছিল একটা বুদ্ধিহীন কথা বলা এবং শোনার যন্ত্র। এখন আর তা নয়—মোবাইল টেলিফোন রীতিমতো বুদ্ধিমান যন্ত্র। এমন অনেক মোবাইল টেলিফোন

আছে সেটা একই সাথে টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন, ক্যামেরা, টেপ রেকর্ডার, ক্যালকুলেটর, জিপিএস এবং ছোটখাটো একটা কম্পিউটার। আমরা এটা হাতে নিয়ে যেখানে খুশি যেতে পারি, যে-কোনো রকম তথ্য সংগ্রহ করতে পারি, তথ্য সংরক্ষণ করতে পারি এবং তথ্য বিনিময় করতে পারি। কিছুদিন আগেও সেটা কল্পবিজ্ঞানের মতো ছিল, এখন পুরোপুরি বাস্তব।

যারা ইতিহাস পড়েছে তারা জানে, আজ থেকে প্রায় দুইশ বৎসর আগে পৃথিবীতে শিল্পবিপ্লব হয়েছিল। যারা সেই শিল্পবিপ্লবে অংশ নিয়েছিল তারা পৃথিবীটাকে শাসন করেছ—অনেক সময় শোষণ করেছে। এ মুহূর্তে শিল্পবিপ্লবের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটা বিপ্লব হচ্ছে যেটাকে আমরা বলছি তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব। বলার অপেক্ষা রাখে না, যারা এই তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবে অংশ নেবে তারা পরবর্তী পৃথিবীকে শাসন করবে।

আমরা শিল্পবিপ্লবে অংশ নিতে পারিনি বলে বাইরের দেশ আমাদের শাসন-শোষণ করছে। আমরা আবার সেটা হতে দিতে পারি না। এই নতুন তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবে আমাদের অংশ নিতেই হবে। সেই দায়িত্বটা পালন করতে হবে নতুন প্রজন্মকে, যারা নতুন বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে এবং প্রযুক্তিতে। তারা ঠিকভাবে লেখা পড়া করবে, অন্য সব বিষয়ের সাথে সাথে গণিত এবং ইংরেজিতেও সমান দক্ষ হয়ে উঠবে, কম্পিউটারের সাথে পরিচিত হবে। যখন কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ পাবে তখন সেটাকে বিনোদনের একটা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার না করে শেখার একটা মাধ্যমে হিসেবে ব্যবহার করবে, নিজেদের সৃজনশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে। তারা বাংলাদেশের ভবিষ্যত বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদ হিসেবে গড়ে উঠে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে তুলতে সাহায্য করবে।

অনুশীলনী

মূল বক্তব্য :

বর্তমান পৃথিবী হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তিরর যুগ—অর্থাৎ তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সংরক্ষণ আর তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে সারা পৃথিবীতে একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। তথ্য প্রযুক্তির এই বিপ্লবের পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখছে 'কম্পিউটার' নামের যন্ত্রটি। এটি মানুষের নির্দেশে কাজ করে, তাই একজন মানুষ যতটুকু সৃজনশীল তার কম্পিউটারের কাজ করার ক্ষমতাও ঠিক ততটুকু চমকপ্রদ। দুই শ বছর আগে পৃথিবীতে একটা শিল্পবিপ্লব হয়েছিল, সেই বিপ্লবে যারা অংশ নিয়েছিল পরবর্তী সময়ে তারাই পৃথবীকে শাসন করেছিল। ঠিক এই মুহূর্তে শিল্পবিপ্লবের মতোই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পুযুক্তির বিপ্লব ঘটছে—যারা এই বিপ্লবে অংশ নেবে তারাই নতুন পৃথিবীর নেতৃত্ব দেবে। বাংলাদেশকে পৃথিবীর সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড় করানোর জন্যে নতুন প্রজন্ম তথ্য প্রযুক্তিতে নিজেদের দক্ষ করে তুলবে সেটি সবারই প্রত্যাশা।

শব্দার্থ ও টীকা

ডিজিটাল (Digital) : কম্পিউটারে ইলেকট্রিনিক কাজকর্ম করার জন্যে যে বৈদ্যুতিক সংকেত ব্যবহার করা হয় তার নির্দিষ্ট মান রয়েছে। সুনির্দিষ্ট এই মানের একটিকে 0 অন্যদিকে 1 বিবেচনা করে বাইনারি সংখ্যা হিসেবে কম্পিউটারের ভেতরে সকল হিসেব-নিকেশ করা হয়। সম্ভাব্য সব মান ব্যবহার না করে সুনির্দিষ্ট দুটি মান দুটি অংক (Digit) এর জন্যে ব্যবহার করার প্রক্রিয়াটিকে সাধারণভাবে ডিজিটাল বলা হয়।

প্রোগ্রাম : কম্পিউটারকে একটি নির্দেশ দেওয়া হলে সেটি সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে। এরকম অসংখ্যা নির্দেশকে পাশাপাশি সাজিয়ে কম্পিউটার প্রোগ্রাম লেখা হয় এবং কম্পিউটার প্রোগ্রাম লিখে কম্পিউটার দিয়ে অনেক জটিল কাজ করানো সম্ভব হয়।

অবলাল : আলো একটি তরঙ্গ। এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য একটি নির্দিষ্ট মান থেকে কম হলে আমরা দেখতে পাই না। আবার তরঙ্গদৈর্ঘ্য যদি আরেকটি নির্দিষ্ট মান থেকে বড় হয় তবে সেটাও আমরা দেখতে পাই না। দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে বড় হওয়ার কারণে যে আলোকে আমরা দেখতে পাই না সেটাকে অবলাল বলে।

জিপিএস : (GPS) Global Positioning System দিয়ে পৃথিবীর যে কোনো জায়গার অবস্থান সুনির্দিষ্টভাবে বের করা যায়। মহাকাশে অনেকগুলো কৃত্রিম উপগ্রহ রয়েছে। এই উপগ্রহ থেকে পাঠানো সংকেত ব্যবহার করে জিপিএসের মাধ্যমে কোনো কিছুর অবস্থান সুনির্দিষ্টভাবে বের করা হয়।

অনুশিলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. তথ্য প্রযুক্তির পিছনে কোন যন্ত্রটির ভূমিকা সবচেয়ে বেশি ?

ক. টেলিফোনের খ. টেলিভিশনের
গ. কম্পিউটারের ঘ. ফাইবার অপটিক ক্যাবলের

২. কোন যন্ত্রকে সবচেয়ে বেশি তথ্য সংগ্রহের কৃতিত্ব দেওয়া হয় ?

ক. ভয়েজারকে খ. এ্যাপোলো মিশনকে
গ. জেমিনি মিশনকে ঘ. ইন্টারনেটকে

৩. পৃথিবীর মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য কোন যন্ত্রের উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে ?

ক. টেলিফোনের খ. রেডিওর
গ. কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ঘ. ইন্টারনেটের

৪. ফাইবার অপটিকে কীসের ভেতর দিয়ে তথ্য পাঠান হয় ?

ক. তামার তারের খ. বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের
গ. কাচের তন্তুর ঘ. কার্বনের তন্তুর

৫. পৃথিবীতে জ্ঞানক-বিজ্ঞানের নেতৃত্ব দিতে হলে কোন বিপ্লবে অংশ নিতে হবে ?

ক. সামাজিক বিপ্লবে খ. শিল্পবিপ্লবে
গ. তথ্য প্রযুক্তি বিপ্লবে ঘ. অর্থনৈতিক বিপ্লবে

১। হাসান গণিত-অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সে গণিতের বিভিন্ন সমস্যা সামাধানে শিক্ষক ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে যোগাযোগ রাখছে। যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে সে চিঠি ও টেলিফোনের আশ্রয় নিচ্ছে, এমনকি সরাসরি শিক্ষকগণের বাসায় যোগাযোগ করছে। এতে করে হাসান অনেক সমস্যায় পড়ছে। একদিকে যেমন তার অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে অন্যদিকে ব্যয়ও হচ্ছে প্রচুর। এছাড়া বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিষয়ে অধ্যাপনারত তার বড় চাচার সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সে সবচেয়ে বেশি সমস্যা অনুভব করছে। তার চাচা এই সময়ের তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা নেয়ার জন্য তাকে পরামর্শ দেন। কেননা, তথ্য প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধি সাধনই উন্নত বাংলাদেশ গড়ার পূর্বশর্ত।

ক. বর্তমান পৃথিবীকে কীসের পৃথিবী বলা হয় ?
খ. কম্পিউটার প্রোগ্রাম বলতে কী বোঝায় ?
গ. হাসানের সমস্যার সহজ সমাধানে করণীয় কী ? ব্যাখা কর।
ঘ. তথ্য প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধি সাধনই উন্নত বাংলাদেম গড়ার পূর্বশর্ত। অনুচ্ছেদের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিদ্যা সজ্জনকে করে বিনয়ী
দুর্জনকে করে অহংকারী

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য